BOIGHAR.COM
মাসুদ রানা
বিষনাগিনী
কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী
কাজী মায়মুর হোসেন
সেবা
প্রকাশনী
ANIK
BOIGHAR

BOIGHAR.COM

মাসুদ রানা

বিষনাগিনী

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন

নিষ্ঠুর একদল অমানুষের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে গভীর জঙ্গলে হারিয়ে গেছে নম্র, ভদ্র ছেলেটি। ওর সঙ্গে চার বছর আগে পরিচয় হয়েছিল রানার। জর্জের বৃদ্ধ, অসহায় বাবা অনেক খুঁজে বের করলেন রানাকে, চেয়ে বসলেন সাহায্য। তাঁদের কাছে জর্জের ডগট্যাগ ও রানার নাম লেখা কাগজ দিয়ে গেছে কেউ।
অবাক ব্যাপার! যে এসেছিল,
সেই লোকটা খুন হয়েছে কয়েক বছর আগে রানার হাতেই!
খরচের টাকা দেবেন সে সাধ্য নেই, কিন্তু ছেলেকে ফিরে পেলে চিরকৃতজ্ঞ হবেন বুড়ো-বুড়ি। বুঝল রানা, টোপ ফেলেছে কেউ। রানাকে চায়। কিন্তু সে কে— কেনই বা এই ফাঁদ?
জড়িয়ে গেল রানা অদ্ভুত এক রহস্যে।
ওর সঙ্গে চলল দুর্ধর্ষ ক'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু ওরা জানে না, ফণা তুলে অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর এক বিষনাগিনী!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

BOIGHAR

মাসুদ রানা ৪৪৫

বিষনাগিনী

কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী
কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-7445-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ২০১৬

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

Masud Rana-445
BISHNAGINE
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Qazi Maimur Husain

সেবা প্রকাশনী

একশ' বিশ টাকা

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

Rana- 445

বিষনাগিনী

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scan & Edited By:

BOIGHAR

Website:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

IF YOU LIKE THIS BOOK
Please buy the original book and help
writer & publisher

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় ◆ ভারতনাট্যম ◆ স্বর্ণমৃগ ◆ দুঃসাহসিক ◆ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ◆ দুর্গম দুর্গ ◆ শত্রু ভয়ঙ্কর ◆ সাগরসঙ্গম-১, ২ ◆ রানা! সাবধান!! ◆ বিস্মরণ ◆ রত্নদ্বীপ ◆ নীল আতঙ্ক-১, ২ ◆ কায়রো ◆ মৃত্যুপ্রহর ◆ গুপ্তচক্র ◆ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ◆ রাত্রি অন্ধকার ◆ জাল ◆ অটল সিংহাসন ◆ মৃত্যুর ঠিকানা ◆ ক্ষ্যাপা নর্তক ◆ শয়তানের দূত ◆ এখনও ষড়যন্ত্র ◆ প্রমাণ কই? ◆ বিপদজনক-১, ২ ◆ রক্তের রঙ-১, ২ ◆ অদৃশ্য শত্রু ◆ পিশাচ দ্বীপ ◆ বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ ◆ ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ ◆ গুপ্তহত্যা ◆ তিন শত্রু ◆ অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ ◆ সতর্ক শয়তান ◆ নীল ছবি-১, ২ ◆ প্রবেশ নিষেধ-১, ২ ◆ পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ এসপিওনাজ-১, ২ ◆ লাল পাহাড় ◆ হৃৎকম্পন ◆ প্রতিহিংসা-১, ২ ◆ হংকং সম্রাট-১, ২ ◆ কুউউ! ◆ বিদায়, রানা-১, ২, ৩ ◆ প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ ◆ আক্রমণ-১, ২ ◆ গ্রাস-১, ২ ◆ স্বর্ণতরী-১, ২ ◆ পপি ◆ জিপসী-১, ২ ◆ আমিই রানা-১, ২ ◆ সেই উ সেন-১, ২ ◆ হ্যালো, সোহানা-১, ২ ◆ হাইজ্যাক-১, ২ ◆ আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ ◆ সাগরকন্যা-১, ২ ◆ পালাবে কোথায়-১, ২ ◆ টার্গেট নাইন-১, ২ ◆ বিষ নিঃশ্বাস-১, ২ ◆ প্রেতাত্মা-১, ২ ◆ বন্দি গগল ◆ জিম্মি ◆ তুষার যাত্রা-১, ২ ◆ স্বর্ণসঙ্কট-১, ২ ◆ সন্ন্যাসিনী ◆ পাশের কামরা ◆ নিরাপদ কারাগার-১, ২ ◆ স্বর্গরাজ্য-১, ২ ◆ উদ্ধার-১, ২ ◆ হামলা-১, ২ ◆ প্রতিশোধ-১, ২ ◆ মেজর রাহাত-১, ২ ◆ লেনিনগ্রাদ-১, ২ ◆ অ্যামবুশ-১, ২ ◆ আরেক বারমুডা-১, ২ ◆ বেনামী বন্দর-১, ২ ◆ নকল রানা-১, ২ ◆ রিপোর্টার-১, ২ ◆ মরুযাত্রা-১, ২ ◆ বন্ধু ◆ সঙ্কেত-১, ২, ৩ ◆ স্পর্ধা-১, ২ ◆ চ্যালেঞ্জ ◆ শত্রুপক্ষ ◆ চারিদিকে শত্রু-১, ২ ◆ অগ্নিপুরুষ-১, ২ ◆ অন্ধকারে চিতা-১, ২ ◆ মরণকামড়-১, ২ ◆ মরণখেলা-১, ২ ◆ অপহরণ-১, ২ ◆ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ ◆ বিপর্যয়-১, ২ ◆ শান্তিদূত-১, ২ ◆ শ্বেত সন্ত্রাস-১, ২ ◆ ছদ্মবেশী ◆ কালপ্রিট-১, ২ ◆ মৃত্যু আলিঙ্গন-১, ২ ◆ সময়সীমা মধ্যরাত ◆ আবার উ সেন-১, ২ ◆ বুমেরাং ◆ কে কেন কীভাবে ◆ মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২ ◆ কুচক্র ◆ চাই সাম্রাজ্য-১, ২ ◆ অনুপ্রবেশ-১, ২ ◆ যাত্রা অশুভ-১, ২ ◆ জুয়াড়ী-১, ২ ◆ কালো টাকা-১, ২ ◆ কোকেন সম্রাট-১, ২ ◆ বিষকন্যা-১, ২ ◆ সত্যবাবা-১, ২ ◆ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ◆ অপারেশন চিতা ◆ আক্রমণ '৮৯-১, ২ ◆ অশান্ত সাগর-১, ২ ◆ শ্বাপদসঙ্কুল-১, ২, ৩ ◆ দংশন-১, ২ ◆ প্রলয়সঙ্কেত-১, ২ ◆ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ ◆ তিক্ত অবকাশ-১, ২ ◆ ডাবল এজেন্ট-১, ২ ◆ আমি সোহানা-১, ২ ◆ অগ্নিশপথ-১, ২ ◆ জাপানি ফ্যানাটিক-১, ২, ৩ ◆ সাক্ষাৎ শয়তান-১, ২ ◆ গুপ্তঘাতক-১, ২ ◆ নরপিশাচ-১, ২, ৩ ◆ শত্রু বিভীষণ-১, ২ ◆ অন্ধ শিকারী-১, ২ ◆ দুই নম্বর-১, ২ ◆ কৃষ্ণপক্ষ-১, ২ ◆ কালো ছায়া-১, ২ ◆ নকল বিজ্ঞানী-১, ২ ◆ বড় ক্ষুধা-১, ২ ◆ স্বর্ণদ্বীপ-১, ২ ◆ রক্তপিপাসা-১, ২, ৩ ◆ অপচ্ছায়া-১, ২ ◆ ব্যর্থ মিশন-১, ২ ◆ নীল দংশন-১, ২ ◆ সাউদিয়া ১০৩-১, ২ ◆ কালপুরুষ-১, ২, ৩ ◆ নীল বজ্র-১, ২ ◆ মৃত্যুর প্রতিনিধি-১, ২ ◆ কালকূট-১, ২, ৩ ◆ অমানিশা-১, ২ ◆ সবাই চলে গেছে-১, ২ ◆ অনন্ত

যাত্রা-১, ২ ◆ রক্তচোষা ◆ কালো ফাইল-১, ২, ৩ ◆ মাফিয়া ◆ হীরকসম্রাট-১, ২ ◆ সা জার ধন ◆ শেষ চাল-১, ২, ৩ ◆ বিগ ব্যাঙ ◆ অপারেশন বসনিয়া ◆ টার্গে লাদেশ ◆ মহাপ্রলয় ◆ যুদ্ধবাজ ◆ প্রিন্সেস হিয়া-১, ২ ◆ মৃত্যুফাঁদ ◆ শয়ত র ঘাঁটি ◆ ধ্বংসের নকশা ◆ মায়ান ট্রেজার ◆ ঝড়ের পূর্বাভাস ◆ আক্রান্ত দূতাবাস ◆ জন্মভূমি ◆ দুর্গম গিরি ◆ মরণযাত্রা ◆ মাদকচক্র ◆ শকুনের ছায়া-১, ২ ◆ তুরুপের তাস ◆ কালসাপ ◆ গুডবাই, রানা ◆ সীমা লঙ্ঘন ◆ রুদ্রঝড় ◆ কান্তার মরু ◆ কর্কটের বিষ ◆ বোস্টন জ্বলছে ◆ শয়তানের দোসর ◆ নরকের ঠিকানা ◆ অগ্নিবাণ ◆ কুহেলি রাত ◆ বিষাক্ত থাবা ◆ জন্মশত্রু ◆ মৃত্যুর হাতছানি ◆ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ সার্বিয়া চক্রান্ত ◆ দুরভিসন্ধি ◆ কিলার কোবরা ◆ মৃত্যুপথের যাত্রী ◆ পালাও, রানা! ◆ দেশপ্রেম ◆ রক্তলালসা ◆ বাঘের খাঁচা ◆ সিক্রেট এজেন্ট ◆ ভাইরাস X-৯৯ ◆ মুক্তিপণ ◆ চীনে সঙ্কট ◆ গোপন শত্রু ◆ মোসাদ চক্রান্ত ◆ চরসদ্বীপ ◆ বিপদসীমা ◆ মৃত্যুবীজ ◆ জাতগোক্ষুর ◆ আবার ষড়যন্ত্র ◆ অন্ধ আক্রোশ ◆ অশুভ প্রহর ◆ কনকতরী ◆ স্বর্ণখনি-১, ২ ◆ অপারেশন ইজরাইল ◆ শয়তানের উপাসক ◆ হারানো মিগ ◆ ব্লাইণ্ড মিশন ◆ টপ সিক্রেট-১, ২ ◆ মহাবিপদ সঙ্কেত ◆ সবুজ সঙ্কেত ◆ অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ◆ গহীন অরণ্য ◆ প্রজেক্ট X-15 ◆ অন্ধকারের বন্ধু ◆ আবার সোহানা ◆ আরেক গডফাদার ◆ অন্ধপ্রেম ◆ মিশন তেল আবিব ◆ ক্রাইম বস ◆ সুমেরুর ডাক-১, ২ ◆ ইশকাপনের টেক্কা ◆ কালো নকশা ◆ কালনাগিনী ◆ বেঈমান ◆ দুর্গে অন্তরীণ ◆ মরুকন্যা ◆ রেড ড্রাগন ◆ বিষচক্র ◆ শয়তানের দ্বীপ ◆ মাফিয়া ডন ◆ হারানো আটলান্টিস-১, ২ ◆ মৃত্যুবাণ ◆ কমাণ্ডো মিশন ◆ শেষ হাসি-১, ২ ◆ স্মাগলার ◆ বন্দি রানা ◆ নাটের গুরু ◆ আসছে সাইক্লোন ◆ সহযোদ্ধা ◆ গুপ্ত সঙ্কেত-১, ২ ◆ ক্রিমিনাল ◆ বেদুঈন কন্যা ◆ অরক্ষিত জলসীমা ◆ দুরন্ত ঈগল-১, ২ ◆ সর্পলতা ◆ অমানুষ ◆ অখণ্ড অবসর ◆ স্নাইপার-১, ২ ◆ ক্যাসিনো আন্দামান ◆ জলরাক্ষস ◆ মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১, ২ ◆ স্বপ্নের ভালবাসা ◆ হ্যাকার-১, ২ ◆ খুনে মাফিয়া ◆ নিখোঁজ ◆ বুশ পাইলট ◆ অচেনা বন্দর-১, ২ ◆ ব্ল্যাকমেইলার ◆ অন্তর্ধান-১, ২ ◆ ড্রাগ লর্ড ◆ দ্বীপান্তর ◆ গুপ্ত আততায়ী-১, ২ ◆ বিপদে সোহানা ◆ চাই ঐশ্বর্য-১, ২ ◆ স্বর্ণ বিপর্যয়-১, ২ ◆ কিল-মাস্টার ◆ মৃত্যুর টিকেট ◆ কুরুক্ষেত্র-১, ২ ◆ ক্লাইম্বার ◆ আগুন নিয়ে খেলা-১, ২ ◆ মরুস্বর্গ ◆ সেই কুয়াশা-১, ২ ◆ টেরোরিস্ট ◆ সর্বনাশের দূত-১, ২ ◆ শুভ্র পিঞ্জর-১, ২ ◆ সূর্য-সৈনিক-১, ২ ◆ ট্রেজার হান্টার-১, ২ ◆ লাইমলাইট-১, ২ ◆ ডেথ ট্র্যাপ-১, ২ ◆ কিলার ভাইরাস-১, ২ ◆ টাইম বম ◆ আদিম আতঙ্ক ◆ পার্শিয়ান ট্রেজার-১, ২ ◆ বাউণ্টি হান্টার্স-১, ২ ◆ মৃত্যুদ্বীপ ◆ জাপানি টাইকুন-১, ২ ◆ পাতকিনী ◆ নরকের কীট-১, ২ ◆ শার্প শুটার ◆ পাশবিক-১, ২ ◆ গুপ্তসংঘ ◆ বিষনাগিনী

www.boighar.com

সেবা প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

— লেখক

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া; কোনও ভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না

এক

মানুষটার বয়স কমপক্ষে সত্তর। ডান হাতের হাড্ডিসার সরু আঙুলসমেত পাতলা তালুটা পাখির থাবার মত। ধাতব জিনিসটা চকচক করছে তালুর ওপর।

'একটা ডগট্যাগ।'

'জানি ওটা কী।'

'ইউএস আর্মির ডগট্যাগ।'

'ইচ্ছে করলে দেখাতে পারেন।'

হাত মুঠো হতেই থাবার ভেতর হারিয়ে গেল ধাতব জিনিসটা, যেন ডাকাতি হবে মানুষটার দুর্মূল্য কোহিনূর হীরা।

'এটা আমার ছেলের ডগট্যাগ।'

'দুঃখিত, কিন্তু মারা গেছে আপনার ছেলে। ওকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখেছি।'

'নিজের চোখে দেখেছেন, ও মরে গেছে?'

'না। তুমুল লড়াই চলছিল জঙ্গলে, অ্যাম্বুশ করেছিল ড্রাগ স্মাগলাররা। সাবমেশিন-গানের গুলি লেগেছিল জর্জের বুকে। দেড় শ' গজ দূরে নিজেও আহত ছিলাম, পৌঁছুতে পারিনি ওর কাছে। দলের কয়েকজনের সঙ্গে বেরিয়ে আসি ওই অ্যাম্বুশ থেকে। আমেরিকান আর্মির কর্নেল ও সিআইএ-র যে এজেন্ট ওই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিল, দু'দিন পর তাদের আপত্তি সত্ত্বেও

আবারও ফিরি, কিন্তু...'

'জানি, কিন্তু সত্যিই কি মরতে দেখেছেন আমার ছেলেকে?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল মাসুদ রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র আজও বেঁচে আছে তা জানতে ব্যাকুল হয়ে আছেন অসহায় বাবা।

'না, মিস্টার হার্টিগান। কেউ দেখে থাকলে, তো সে ওই লোক, যে গুলি করেছে ওকে।'

ব্রাসেলসের এই ছোট্ট রেস্তোরাঁ ও বার-এ কোনার টেবিল বেছে নিয়েছে রানা। লম্বা ছুটি চলছে, হাতে বিসিআই বা রানা এজেন্সির গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ নেই। এসেছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু সিম কর্নেলিসের সঙ্গে গল্প করতে। পুরনো বন্ধু ওরা, সম্পর্কটা এমনই, জান দিতে পারবে অপরজনের জন্য। আগেও একই মার্সেনারি দলে কাজ করেছে। শেষবার কঙ্গোয়। অবশ্য, তখন রানার মূল কাজ ছিল দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া এক বিশ্বাসঘাতককে। কিন্তু ওকে খুন করতে গিয়ে ওর হাতেই খতম হয়ে গিয়েছিল সেই নরপিশাচ এক চাঁদনী রাতে। www.boighar.com

মাস তিনেক আগে সব ছেড়ে ভয়ঙ্কর এক গুপ্তসংঘের বিরুদ্ধে লড়তে রানার দলে আবারও যোগ দিয়েছিল সিম কর্নেলিস। একটু আগে বন্ধুর দেয়া দামি ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দেবে রানা, এমন সময় বারকাউন্টারে রানার ঘাড়ের কাছে হাজির হলেন বৃদ্ধ।

মার্সেনারি, প্রাক্তন মার্সেনারি, বা যারা মনে করে তারা দুর্দান্ত যোদ্ধা, বা মার্সেনারি হতে উৎসাহী যুবক— এরাই আসে সিম কর্নেলিসের এই বিখ্যাত পানশালায়।

বৃদ্ধের চোখ ব্যগ্র, নরম সুরে জিজ্ঞেস করেছেন, 'মিস্টার রানা, আমি কি ব্যক্তিগত কিছু কথা বলতে পারি?'

নিষ্পলক চোখে মিস্টার হার্টিগানের দিকে তাকিয়ে ভেবেছে রানা, আগে কখনও দেখে থাকলে ঠিকই মনে পড়ত এঁকে। না,

এঁর বিষয়ে কোনও স্মৃতি নেই ওর। একসাগর দুঃখ মানুষটার নীল চোখে।

আসলে এ কারণেই বারকাউন্টার থেকে সরে এই টেবিল দখল করেছে রানা। তার আগে বৃদ্ধের বসার জন্য টেনে দিয়েছে সামনের চেয়ার।

'আমি জর্জ হার্টিগানের বাবা,' মুখোমুখি বসেই বলেছেন তিনি। শার্টের পকেট থেকে বের করেছেন ডগট্যাগ। 'আমার নাম জ্যাক হার্টিগান।'

'আমাকে খুঁজে পেলেন কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন মিস্টার হার্টিগান। 'কাজটা কঠিন ছিল। কিন্তু আমার এক প্রতিবেশীর ভাতিজা কাজ করে ল্যাংলির সিআইএতে। অ্যানালিস্ট। সে-ই রিসার্চ করে বের করেছে, আপনি আছেন এ শহরে। কখনও কখনও আসেন এখানে। মিস্টার রানা, গত একসপ্তাহ প্রতিদিন আসছি, কিন্তু কোনও তথ্য দেয়নি রেস্তোরাঁ আর বার-এর মালিক। ঠিক করেছিলাম, আগামী সোমবার ফিরে যাব স্যান ডিয়েগোতে।'

সহজ সুরে বলল রানা, 'এ শহরে এসেছি পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে। আগামীকাল আমিও ফিরে যাব গোজো দ্বীপে। ...আমাকে চিনে বের করলেন কীভাবে?'

'জর্জ এঁকেছিল আপনার মুখের নিখুঁত ছবি।'

'আপত্তি না থাকলে আরেকবার দেখান তো ডগট্যাগটা,' বলল রানা।

খুব ধীরে খুলে গেল বৃদ্ধের মুঠো, টেবিলের কাঠে টুপ্ করে পড়ল ছোট্ট ধাতব ডিস্ক।

হাত বাড়িয়ে ওটা নিল রানা, দেখল রুপালি পাতে খোদাই করা নাম ও সংখ্যা। কিছুক্ষণ 'পর জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোথায় পেয়েছেন?'

‘দু’সপ্তাহ আগে পৌঁছে দিয়েছিল আমার বাসায়।’

‘স্যান ডিয়েগোতে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কে নিয়ে গিয়েছিল?’

‘চিনি না, মিস্টার রানা। নাম জানা নেই। এ-ও জানা নেই এসেছিল কোথা থেকে। কলিংবেল বাজতেই দরজা খুলতে গিয়েছিলেন আমার স্ত্রী। দেখলাম ওঁর সামনে খাটো এক লোক। ছোট একটা প্যাকেজ দিয়েই চলে গেল।’

‘আর এই জিনিস ছিল ওই প্যাকেজের ভেতরে?’

‘হ্যাঁ।’

‘আর কিছু ছিল?’

জ্যাকেটের পকেটে ঢুকল শীর্ণ হাত, বেরোল কোঁচকানো বাদামি র‍্যাপিং পেপার। টেবিলের ওপর দিয়ে ওটা রানার দিকে ঠেলে দিলেন মিস্টার হার্টিগান।

সাবধানে কাগজের ভাঁজ দূর করল রানা, দেখল লেখাটা।

ওপর থেকে নিচে, মোটমাট মাত্র তিনটি শব্দ:

রানা

ন্যাম

বডিয়া

ছোট্ট কাগজের টুকরোয় দ্রুত হাতে লেখা তিনটি শব্দ।

বৃদ্ধের ক্ষয়িষ্ণু চেহারা দেখল রানা। নরম সুরে বলল, ‘মিস্টার হার্টিগান, কেউ হয়তো নোংরা কৌতুক করছে। চার বছর আগে ভিয়েতনাম-ক্যামবোডিয়া সীমান্তে মারা গেছে জর্জ।’

ডগট্যাগ ও বাদামি কাগজের ওপর স্থির বৃদ্ধের চোখ। দৃষ্টি না তুলেই বললেন, ‘ওয়াশিংটনে এমআইএ অফিসে গিয়েছি। ওরা বলল, এ ডগট্যাগ আসল। জর্জের দেহ বা ডগট্যাগটা পাওয়া যায়নি। জানার উপায় নেই, এ লেখা জর্জের কি না। তবে এক

হ্যাণ্ডরাইটিং স্পেশালিস্টের কাছে গেছি, জর্জের পাঠানো চিঠিও দিই তাঁকে। উনি বলেছেন, ওই কাগজের লেখা জর্জেরও হতে পারে।' চোখ তুলে চাইলেন, কিন্তু দৃষ্টি রাখতে পারলেন না রানার চোখে।

সামনে ঝুঁকে ধাতব ডগট্যাগ ও কাগজে মনোযোগ দিয়েছে রানা।

বৃদ্ধ বললেন, 'মাত্র একমাস ছিল জর্জ ওখানে, কিন্তু তখন আপনার কথা লিখেছে কমপক্ষে পাঁচটা চিঠিতে। জানতাম, ওর কোনও হিরো নেই, নিজেই তা হওয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু শিক্ষক হিসেবে সবার ভেতর থেকে বেছে নিয়েছিল আপনাকে। যেদিন গুলি খেল, মিস্টার রানা, সেদিনই ছিল ওর একুশতম জন্মদিন। আপনারা ক'জন খুঁজলেও ইউএস আর্মির তরফ থেকে বাস্তবে সেভাবে খোঁজা হয়নি। এর কারণ বোধহয়, মিসিং-ইন-অ্যাকশন বিভাগের প্রধান বা কর্নেল ছিলেন অত্যন্ত অদক্ষ এক লোক।'

ডগট্যাগের ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই নিচু স্বরে বলল রানা, 'আপনি ভাবছেন, কারও উচিত ভালভাবে খোঁজ নেয়া?'

দুই

'তুমি নিজেকে দোষী ভাবছ।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'না, তা নয়।'

'তো সমস্যাটা কী?'

সিম কর্নেলিসের চোখে তাকাল রানা। টেবিলে মুখোমুখি

বসেছে ওরা। কয়েক বছর হলো মার্সেনারির কাজ থেকে অবসর নিয়েছে সিম, ছোট এক বিস্ট্রো কিনে নিয়ে আয়-রোজগারের ব্যবস্থা হতেই বিয়ে করেছে পছন্দের মেয়েটিকে। চমৎকার চলছে সাংসারিক জীবন। তবুও মাঝে মাঝে বুকে ওঠে হুতাশ, মনটা বলে: যদি আবারও ফিরতে পারত আগের সেই স্বাধীন জীবনে!

এ মুহূর্তে সিম কর্নেলিসের রেস্টুরেন্ট ও বার-এ রানার সঙ্গে রয়েছে আরও দুই বন্ধু— ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স ও পিটার লারসেন।

ব্রিয়াঁ ফরাসি। গোলগাল মুখ, নাকের ডগায় চশমা। ওটার কারণে বন্ধুরা নাম দিয়েছে: হুতুম-পেঁচা।

এদিকে কোপেনহেগেনের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে মিসিং পার্সন্স বিভাগের প্রধান ছিল ক্যাপ্টেন পিটার লারসেন।

পেঁচা আগে ছিল মার্সেইল্স্-এর গ্যাংস্টার ও রাজনৈতিক এক নেতার বডিগার্ড। গগল ওকে ওই নোংরা পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনে রোজগারের ব্যবস্থা করে দেয়। পরে রানার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর ওকে নিজের ওস্তাদ বলে মেনে নিয়েছে ফুলজেন্স। এদিকে মাত্র কয়েক মাস আগে পরিচয় হলেও পিটার লারসেনের সঙ্গে তার হয়েছে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা।

এই দুই বন্ধুর বিষয়ে রানা চট করে বুঝে গিয়েছিল, ওদেরকে রানা এজেন্সিতে চাকরি দিতে চাইলে নষ্ট হবে বন্ধুত্ব, কাজেই তা করেনি। পেঁচা ও লারসেনকে বলে কয়ে ছোট একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলিয়ে দিয়েছে। সেজন্য খরচ করেছে প্রায় এক লাখ ডলার। তা নিয়ে ভাবছে না। কারণ, ওরা টাকা মেরে দেয়ার লোকই নয়। সঠিক সময়ে ফেরত দেবে রানা এজেন্সি থেকে পাওয়া ধারের টাকা।

ওদের কাজ: কারও কিছু হারিয়ে গেলে অনুরোধ পেলে তা খুঁজে বের করা— তা স্বামী হোক বা স্ত্রী, হীরা বা কুকুর!

পিটার লারসেনের বয়স ত্রিশমত, একটু মোটা। পাতলা হচ্ছে

মাথার সোনালি চুল। স্কুল টিচার স্ত্রী মারগিট ও ছোট্ট মেয়ে মিশেলকে নিয়ে ওদের সুখী সংসার। পরিবারের এই দু'জন ছাড়া ওর অন্তরে বাস করে মাত্র কয়েকজন— পেঁচা ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স, সিম কর্নেলিস, তার বউ, রেমারিক, ফুরেলা আর বিশেষ করে মাসুদ রানা। অন্য কারও সঙ্গে খাতির নেই ওর। বেশিরভাগ সময় পার করে ছোট এক ল্যাপটপে চোখ রেখে, ইন্টারনেট ও ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের দুরন্ত যাত্রী সে।

এদিকে পিটারের সমানই হবে পেঁচা ব্রিয়াঁ ফুলজেন্সের বয়স, সর্বক্ষণ কানে গুঁজে রেখেছে ইয়ারপিস, শুনছে ক্লাসিকাল কমপোযারদের অসাধারণ সব সুর। ওই বিষয়ে তাকে বলা যেতে পারে আস্ত অভিধান। জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলবে: মোযার্টই আসলে ঈশ্বর! ডিভিডি প্লেয়ার ও ইয়ারপিস ছাড়াও তৃতীয় একটা জিনিস ওর জানের জান। ওটা এমএবি পিএ ১৫ পিস্তল, ব্যারেল ঘোরে ওটার। বাম বগলের নরম হোলস্টারে আরামে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনে উঠে এসেই ঝড়ের বেগে লক্ষ্যভেদ করে। ব্রিয়াঁর দ্রুতগতি দেখলে হিংসায় জ্বলে পুড়ে ছাই হতো ওয়ায়েট আর্প। বিদ্যুৎ-গতি পিস্তল ড্র-তে পেঁচার সমান কেবল মাসুদ রানা, ওদের বন্ধুরা আর কাউকে অমন দেখেনি

পিটার লারসেন ও ব্রিয়াঁ ফুলজেন্সের পার্টনারশিপ দেখার মতই। প্রায়ই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে নিরীহ পিটার লারসেন, তখন তাকে গোলমাল থেকে টেনে বের করছে ব্রিয়াঁ। লারসেনই আসলে দলের মগজ, ব্রিঁয়া ফুলজেন্স হচ্ছে ওদের গানম্যান।

গতকাল পর্যন্ত এক ডেনিশ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের পলাতকা স্ত্রীকে ব্রাসেলসে খুঁজছিল ওরা। তারপর বিশেষ একটি হোটেলে কুচকুচে কালো এক উলঙ্গ স্যাক্সোফোনিস্টের বিছানা থেকে উদাম সুন্দরীকে পাকড়াও করল পেঁচা। মেয়েটা যখন স্বামীর কাছে ফিরবার নামও নিল না, বাধ্য হয়ে ওর আঙুল থেকে নয়

ক্যারেটের হীরার আংটি ও সোনার ভারী ওয়েডিং রিং কেড়ে নিল পেঁচা। মহাবিরক্ত হয়ে ফোনে ডেনিশ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে জানিয়ে দিল: 'ধরে নিন উড়াল দিয়েছে আপনার ময়না পাখি, এবার ভাবুন ডিভোর্সের কথা।'

রানার সঙ্গে কাজের ধারা মেলে পেঁচা ও পিটারের।

মৃত জিআই জর্জ হার্টিগানের ডগট্যাগ বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করবে ভেবেছে রানা। অবশ্য তার আগে ছোট্ট ভূমিকা দিয়ে বুঝিয়ে দিল, কী কারণে ওই ছেলে এবং ওর মত কয়েকজন গিয়েছিল ভিয়েতনাম ও ক্যামবোডিয়ার সীমান্তে।

ক' বছর আগের কথা, হঠাৎ করেই হুড়মুড় করে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও এশিয়ার কয়েকটি দেশের সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকতে লাগল কোটি কোটি ইয়াবা ট্যাবলেট। একেবারে স্বল্পমূল্য, ফলে নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠল তরুণ সমাজের বড় একটি অংশ। ওই একই পরিণতি হলো আমেরিকা, চিন ও ইউরোপের দেশগুলোর তরুণ সমাজের।

সেসময় সিআইএ থেকে এশিয়ার ক'টি সিক্রেট সার্ভিসের চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। সিআইএ জানায়, সংশ্লিষ্ট ইন্টেলিজেন্স থেকে তাদের সেরা এজেন্টকে পাঠালে তারা খুবই উপকৃত হবে। উল্লেখ করা হয়: থাইল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নেয়ায় হ্রাস পেয়েছে বার্মার উত্তর-পুবের শান প্রভিন্সের ইয়াবা উৎপাদন, কিন্তু তাতে আনন্দিত হওয়ার কারণ নেই। কিছু দিন হলো আবারও খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে পরিস্থিতি। ক্যামবোডিয়া ও ভিয়েতনামের মাঝের মস্ত জঙ্গলে উৎপাদন হচ্ছে মেথামফেটামিন বা ইয়াবা। এসব বড়ি খুবই কম পয়সায় ছড়িয়ে পড়ছে গোটা পৃথিবী জুড়ে। পরে সরবরাহের রাশ টেনে ধরলেই দাম বাড়বে মেলা।

ঠিক হয়েছিল, ইউএস আর্মির দুটি মাঝারি দল, সিআইএর

ক’জন ও অন্য কয়েকটি দেশের এজেন্টদেরকে নিয়ে অভিযান চালানো হবে ক্যামবোডিয়া-ভিয়েতনামের সীমান্তবর্তী জঙ্গলে। ধ্বংস করা হবে উৎপাদনকারী ও স্মাগলারদের সমস্ত কারখানা ও আখড়া।

সিআইএ থেকে কথা দেয়া হয়েছিল: ওই দুই দেশে পাঠানো দুই দলের একটির নেতৃত্বে থাকবে বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানা।

কিন্তু কথামত ভিয়েতনামে পৌঁছে রানা দেখল, গুরুত্বপূর্ণ কোনও আলোচনায় ওকে রাখাই হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে যোগাযোগ করল মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের সঙ্গে।

সব শুনে বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, ‘এটা ধরে নেয়া যায় সবসময় চোখ উল্টে নেবে সিআইএ। নিজেই তো দেখছ তাদের জানী দোস্ত্ পাকিস্তানের পরিণতি। ওদের দিয়েই পা চাটিয়ে নিচ্ছে আমেরিকান সরকার বা সিআইএ। এদিকে ওদের ওপরেই নির্বিকারভাবে ফেলছে বোমা। তবুও থাকো ওদের সঙ্গে, রানা। জোগাড় করো আরও তথ্য। মনে রাখবে, ইয়াবা ট্রেডের মূল হোতাকে শিকড়সহ উপড়ে ফেলতে হবে। ওটাই তোমার মূল মিশন।’

এরপর আপত্তি তোলেনি রানা। পরের একমাস হামলা করেছিল জঙ্গলে একের পর এক হাইড আউটে। তছনছ করে দিয়েছিল ড্রাগ উৎপাদনকারী ও স্মাগলারদের গোটা সংগঠন। তাড়া করে হংকঙের এক বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে ইয়াবা স্মাগলারদের সর্বোচ্চ নেতাকে শেষ করে দেয়।

আবারও বলল কর্নেলিস: ‘তুমি নিজেকে দোষী ভাবছ।’

‘বহুবার বিপদে পড়েছ, পড়োনি?’ বলল রানা, ‘অন্তর জানিয়ে দেয়নি পাশেরজন মারাত্মকভাবে আহত? দশবারের ভেতর নয়বারই সঠিক ধারণা করা যায়। কাভার নেয়ার জন্যে ছুটছিলাম, তখন ওকে দেখি। ভুলভাবে ছুঁড়ে দেয়া লাট্টুর মত ঘুরেই ধুপ করে

পড়ল মাটিতে। আমিও আহত ছিলাম, কিন্তু গুরুতরভাবে নয়। বেরিয়ে যাই অ্যাম্বুশ থেকে।'

'তা হলে নিজেকে দায়ী ভাবছ কেন?'

'নিজেকে দায়ী ভাবছি না,' বলল রানা। 'শুধু বলছি, দু'দিন পর যখন গিয়ে খুঁজলাম ওকে, তখন আর কিছুই করার ছিল না। ওই এলাকা থেকে আমেরিকান সৈনিক সরিয়ে না নিলে গোটা এলাকা খুঁজতে পারতাম।'

ওয়াইনে চুমুক দিল সিম। 'তুমি কি ওই ইউনিটের কমাণ্ডে ছিলে?'

না-সূচক মাথা নাড়ল রানা। 'দায়িত্বে ছিল ইউএস আর্মির এক কর্নেল। কাউকে মানুষ বলেই মনে করত না।'

'তার মানে দায়িত্ব তোমার ছিল না।'

'না, ওই কর্নেল ছিল গর্দভ। দক্ষ সৈনিকের অভাব ছিল না, ইচ্ছে হলেই সার্চ করতে পারত ওদিকের কয়েক মাইল জঙ্গল, কিন্তু তা করেনি। পরে জর্জকে খুঁজতে যাই ক'জন মিলে, কিন্তু পাইনি ওকে।'

কৌতূহল নিয়ে বন্ধুর দিকে তাকাল পেঁচা। 'ঈশ্বরের দোহাই, রানা, যা করেছ তা কিন্তু অনেক। মারা পড়ার কথা ওই ছেলের। তারপরও খুঁজতে গেছ মস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে।' চোখের ইশারায় টেবিলে পড়ে থাকা ডগট্যাগ দেখাল 'এরপর পেরিয়ে গেছে পুরো চার বছর। এখন এসেছে তোমার নাম লেখা কাগজ। হয়তো কৌতুক করছে কেউ। নইলে ছেলেটার বাবাকে ঠকিয়ে টাকা আদায় করতে জালিয়াতি করছে। আগেও এসব হয়েছে।'

'হতে পারে।'

টেবিল থেকে ধাতব ডিস্ক নিল কর্নেলিস। 'ছেলেটা কেমন ছিল?'

চুপচাপ কথা গুছিয়ে নিল রানা, তারপর বলল, 'ভাল।

চুপচাপ। লাজুক। অন্যদের মত নয়। ওর বুকে সবসময় কাজ করত ভয়।'

অবাক হয়ে হাসল পেঁচা। 'ভয়? ইউএস স্পেশাল ফোর্স থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেও ভয়?'

'হ্যাঁ। ভয়টাকে সবসময় আড়াল করত। কিন্তু ঠিকই টের পেতাম। একুশ বছর ধরে প্রমাণ করতে চেয়েছে, আসলে ও সত্যিকারের হিরো। ...মাত্র একমাস ছিলাম ওই দুই দেশের সীমান্তে, কিন্তু যেদিন জঙ্গুলে এলাকায় ঢুকলাম, তখন থেকেই আড়াল নিল আমার। পিচ্চি কুকুর ওভাবে মালিকের পায়ে পায়ে হাঁটে। কঠিন কাজে কাঁপত ওর বুক। তবুও কেন যেন ওকে পছন্দ করে ফেলি। কোথাও রেইড দেয়ার সময় ওকে পিছনে রেখে সামনে বাড়তাম। কিন্তু এরপর একদিন ওকে আগে যেতে বলল কর্নেল। সেদিনের অ্যাম্বুশেই হারিয়ে গেল ও।'

রানার গম্ভীর চেহারা দেখছে লারসেন। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'রানা, ওই ছেলের যা হয়েছে, সেজন্যে কোনওভাবেই তোমার দায় নেই! তুমি তো ইউএস আর্মির লোকই নও! তোমাকে কোনও দায়িত্বও দেয়া হয়নি! ছেলেটাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে ওই কর্নেল। ওর দায়িত্বে ছিলে না তুমি। ছেলেটাকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কপাল ছিল মন্দ। যাই হোক, মারা গেছে সে। এবার শোনো আমার কথা— বলছিলে গোজো দ্বীপে যাবে, তাই যদি করো, চমৎকার কাটবে সময়। কাঁচা সোনা রোদে শুয়ে বিয়ার টানবে, কোনও কাজই নেই।'

টেবিলের ওপর থেকে বাদামি কোঁচকানো কাগজটা নিল রানা। 'পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমি বোধহয় ফিরে যাচ্ছি ওই সীমান্তে।'

অবাক হয়ে পেঁচা ও পিটারের দিকে তাকাল সিম কর্নেলিস। ভাব এমন, এইমাত্র জানল অপরূপা এক সুন্দরীকে বিয়ে করতে

খেপে উঠেছেন বুড়ো পোপ।

লারসেন বলল, 'তুমি তো দেখি লাখ লাখ হেক্টর জমি ভরা খড়কুটোর ভেতর নির্দিষ্ট সুই খুঁজতে চাইছ! শুরু করবে কোথা থেকে?'

গ্লাসের ওয়াইন বারকয়েক ঘোরাল রানা, তারপর চোখ তুলে দেখল ব্রিয়াঁ ও পিটারের দিকে। ভুরু নাচাল, 'খুব ব্যস্ত তোমরা?'

'মোটেও না,' বলল লারসেন, 'গতকালই আমাদের কাজ শেষ, আপাতত বিশ্রাম নিচ্ছি।'

গ্লাসটা নামিয়ে রাখল রানা। 'আমার হয়ে একটা কাজ নেবে?'

পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল পেঁচা ও লারসেন।

ব্রিয়াঁ জানতে চাইল, 'ওই ছেলের বাবার অনেক টাকা?'

'না, অবসরপ্রাপ্ত কেরানি। পেনশন ছাড়া তেমন কিছুই নেই। তোমরা যদি কাজটা নাও, আমিই হব ক্লায়েন্ট।'

অবাক চোখে একে অন্যের দিকে তাকাল তিন বন্ধু।

ব্রিয়াঁ জানতে চাইল, 'কী কারণে কাজটা করবে, রানা?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তোমরা বলছ নিজেকে দোষী বা দায়ী ভাবছি, তা নয়। বলতে পারো আমি কৌতূহলী। জানতে চাই কোথা থেকে এসেছে ওই ডগট্যাগ, আর কেন ওটা পাঠানো হলো, কাগজে আমার নাম কেন?' পেঁচার দিকে তাকাল। 'ক' সপ্তাহের জন্যে ভাড়া করতে চাই তোমাদেরকে। প্রতিদিনের জন্যে কত করে নিচ্ছ তোমরা?'

হঠাৎ একটা আওয়াজ শুরু হলো। ওটা এসেছে পেঁচার মোটা নাক থেকে। বিদঘুটে শব্দে চমকে গেছে সিম, লারসেন ও রানা। এক সেকেণ্ড পর টের পেল, হাসছে পেঁচা। একটু পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল সে, 'রানা, তোমার কাছ থেকে ওই কথা শুনব, ভাবিনি। তিন বছর আগে ভেবেছিলাম, শেষ করে দেব

জীবনটা। তবে আত্মহত্যার আগে তোমাদের সঙ্গে আড্ডা মারতে এসেছিলাম। আর রানা, সেরাতে প্রায় কান ধরে এক হাজার একটা ধমক দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দিয়েছিলে। তারপর বড়লোকদের বডিগার্ডের কাজ জোগাড় করে দিলে। তা থেকে আয় করেছি কমপক্ষে এক লাখ ডলার। বলতে পারো এখন জীবনটা আমার অর্থবহুল।' সিম ও পিটারের দিকে ইঙ্গিত করল। 'সিম, ওর বউ, পিটার, ওর বউ-মেয়ে, গগল, রেমারিক, ফুরেলা আর তুমি ছাড়া পরিবার বলতে আমার কেউ নেই। ...আর এখন মাথামোটা মাসুদ রানা জানতে চাইছে, কত টাকা ফি দিলে আমাদের ভাড়া করা যাবে— ছিহ্, রানা!'

চিন্তিত চেহারায় মাথা দোলাল লারসেন। 'রানা, তুমি না থাকলে আজও কাগজপত্র ঘাঁটতাম কোপেনহেগেনের পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ছোট্ট ওই ঘরে বসে। কাজেই টাকার ফালতু কথা বাদ দিয়ে বলে ফ্যালো, কী করতে হবে।'

বন্ধুদের দিকে তাকাল রানা।

মাথা দোলাল গম্ভীর সিম কর্নেলিস, 'হ্যাঁ, রানা, তোমার তো জানার কথা, পুরনো বন্ধুদেরকে অপমান করতে নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা, তারপর চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে ব্রিয়াঁর উদ্দেশে বলল, 'তা হলে তো কথাই শেষ, তোমাদের সমস্ত খরচ আমি দেব। আর যদি কোনও মুনাফা হয় এসব থেকে, তিন ভাগে ভাগ করা হবে।'

'ব্যস, চুক্তি শেষ,' বলল পেঁচা, 'সঙ্গে কী নেব তা বলো।'

'তেমন কিছুই না।' আধমিনিট চুপ করে কী যেন ভেবে নিয়ে বলল রানা, 'আর্মড্ ফোর্সের লোক অন্য দেশে গিয়ে যুদ্ধে হারিয়ে গেলে খুব হৈ-চৈ তোলে আমেরিকানরা, তাই ইউএস মিলিটারি মিসিং-ইন-অ্যাকশন সেকশন খুলেছে ওয়াশিংটনে। মস্ত অফিস। তারা ঠিকভাবে কাজ না করলে বিকট হুঙ্কার ছাড়ে রাজনৈতিক

নেতারা। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের কোরিয়া যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া আমেরিকান সৈনিক ও অফিসারদেরকে আজও খোঁজা হয়। ভিয়েতনামেও তাই।' পিটার লারসেনের দিকে তাকাল রানা। 'ব্রিয়াঁ আর তুমি যে কাজ করছ, ওই একই কাজ করে আমেরিকার ওই অফিস। পিটার, তুমি যাবে ওয়াশিংটনে, কথা বলবে মিসিং-ইন-অ্যাকশন অফিসের চিফের সঙ্গে। মিস্টার হার্টিগান যোগাযোগ করেছিলেন ওখানে। ওরা বলেছে, ওই ডগট্যাগ অথেণ্টিক। ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে যতটা পারো, জেনে নেবে। যদিও তাদের বেশিরভাগ তথ্য অনুমাননির্ভর। পাবলিককে জানাতে পারবে না। সামান্য তথ্য দিলেই বুক ভরা আশা নিয়ে বসে থাকবে সেসব পরিবার। জর্জের বিষয়ে যে-কোনও তথ্য আমাদের কাজে আসবে। আমি নিজে যাব স্যান ডিয়েগোতে। এক পা এক পা করে এগোতে হবে। কিছু ব্যাপারে খোঁজও নিয়েছি। ইউএস আর্মির মিসিং-ইন-অ্যাকশন সেকশনের বর্তমান হেড, কর্নেল জেফ গর্ডন। তিন বছর আগে ওই অফিসের প্রধান হয়েছেন। আশা করি, তাঁর কাছ থেকে জরুরি তথ্য পাবে।'

কথা শুনবার ফাঁকে পায়ের পাশে রাখা ব্রিফকেস তুলে নিয়েছে পিটার লারসেন, বের করেছে ল্যাপটপ। ওটা টেবিলে রেখে ফাইল খুলে নাম দিল: *হারিয়ে যাওয়া সেই জর্জ হার্টিগান*।

তিন

প্রথম কাজ হওয়া উচিত বার্তাবাহককে খুঁজে বের করা, তারপর

তার মাধ্যমে বের করতে হবে, কে পাঠিয়েছে ওই ডগট্যাগ।

কোথা থেকে খোঁজ শুরু করবে রানা?

অবশ্যই যেখানে পাঠানো হয়েছিল ডগট্যাগ।

এ মুহূর্তে আসবাবপত্রে ঠাসা এক লিভিংরুমে বসে আছে মাসুদ রানা।

ছোট্ট বাড়িটা স্যান ডিয়েগোতে।

রানার সামনে কফি-টেবিলের ওপাশে বসেছেন বয়স্ক দম্পতি। আড়ষ্ট হয়ে অপেক্ষা করছেন। মনে হলো বিব্রত।

'আমাদের সমস্ত টাকা দেব, মিস্টার রানা,' বললেন মিসেস হার্টিগান। 'পেনশনের সব টাকার বদলে একমাত্র সন্তানকে ফিরে পেলে, আর কিছুই চাই না।'

একটু কঠোর শোনাল রানার কণ্ঠ: 'মিসেস হার্টিগান, এ কাজের শুরুতেই বেশিরভাগ ডিটেকটিভ এজেন্সি নেবে কমপক্ষে দু'লাখ ডলার। এ ছাড়াও, রয়েছে আনুষঙ্গিক খরচ। কিন্তু এ কাজটা স্বাভাবিক নয়। কৌতূহলের বশে আমি কয়েক সপ্তাহ ব্যয় করব। সেজন্য কোনও পয়সা দিতে হবে না। টাকা চাইছি না, কিন্তু সাহায্য চাইছি আপনাদের স্মৃতির। আমাকে প্রথমেই জানতে হবে, ডগট্যাগ যে এনেছে, সে দেখতে কেমন ছিল।'

হয় অনেক বয়সে বিয়ে করেছেন মিস্টার হার্টিগান ও তাঁর স্ত্রী, অথবা একমাত্র সন্তান হয়েছে পড়ন্ত বেলায়।

চকচকে দু'চোখে বুদ্ধির ছাপ শার্লি হার্টিগানের। কথা শুনেই চোখ থেকে টপ্ করে পড়ল এক ফোঁটা অশ্রু। 'জানি না আমাদের ছেলেকে ফিরে পাব কি না, কিন্তু আপনি সাহায্য করলে চির-কৃতজ্ঞ থাকব আমরা আমৃত্যু।'

আর্থিক দিক থেকে তাঁরা দুর্বল, মাথা নত করে নিজের দু'হাতের দিকে চেয়ে আছেন অসহায় বৃদ্ধ।

'যে এসেছিল, তার চেহারাটা বর্ণনা করুন, মিসেস হার্টিগান,'

নরম সুরে বলল রানা।

'এশিয়ান। স্যান ডিয়েগোতে এমন অনেকেই আছে। জাপানিয, চাইনিয, কোরিয়ান বা ভিয়েতনামিয। একজন থেকে আরেকজনকে আলাদা করা কঠিন। জাতীয়তা বা বয়স বোঝা প্রায় অসম্ভব। ওই লোক তরুণ ছিল না। বয়স চল্লিশ বা পঞ্চাশ। ভাঁজ পড়েনি মুখে। চুল কালো। খাটো করে ছাঁটা। সিঁথি করেছিল মাঝে। চোখ ছোট। নাকটা শিকারি পাখির ঠোঁটের মত বাঁকা। চোখা থুতনি। পরনে কালো ট্রাউযার, গায়ে নীল উইণ্ডব্রেকার। পায়ে স্নিকার। হাঁটার সময় একটু খুঁড়িয়ে চলে।'

'কোন্ পায়ে সমস্যা?'

'বাম পায়ে।'

'আপনি অনেক কিছুই লক্ষ করেছেন, মিসেস হার্টিগান।'

প্রথমবারের মত মৃদু হাসলেন মহিলা। 'একসময় স্কুলের আর্ট টিচার ছিলাম।'

'ছবি আঁকেন?'

ঘরের দেয়ালে ঝুলন্ত ছবিগুলো দেখালেন মহিলা।

চারদেয়ালে অন্তত দশটি ছবি। বেশিরভাগই ল্যাণ্ডস্কেপ। তরুণ জর্জ হার্টিগানের ছবিও আছে। তরুণকে পরিষ্কার চিনল রানা। মন থেকে বলল, 'আপনি ভাল শিল্পী, আপনার ছেলেও এ গুণ পেয়েছে।'

'ওকে চিনেছেন, তাই না?' কষ্ট মহিলার কণ্ঠে।

'হ্যাঁ। তবে ওর কয়েকটা ফোটো লাগবে। ছোট হলেও ক্ষতি নেই, বড় করে নেব।'

সোফা ছেড়ে উঠলেন মিস্টার হার্টিগান। 'আমাদের কাছে ওর ছবি আছে। দিয়েছিলাম এমআইএ-র জন্যে।' একটা রাইটিং ডেস্কের সামনে গেলেন তিনি, ড্রয়ার টেনে বের করলেন বড় একটা খাম। ফিরে এসে রানার হাতে দিলেন ওটা।

খাম থেকে ছবিগুলো বের করল রানা।

সবই আট ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চির ফোটোগ্রাফ।

মিসেস হার্টিগানের দিকে চাইল রানা। 'যে লোক ডগট্যাগ এনেছিল, এঁকে দেবেন তার ছবি?'

একটু সামনে ঝুঁকলেন মহিলা। 'যেদিন এল, সেই রাতেই তার ছবি এঁকে রেখেছি আমি।'

মহিলার স্বামী এখনও বসেননি, আবারও গেলেন রাইটিং ডেস্কের সামনে, ওখান থেকে আনলেন মুড়িয়ে রাখা পুরু একটা কাগজ।

তাঁর কাছ থেকে নিয়ে ইলাস্টিক ব্যাণ্ড খুলল রানা। মোড়ানো কাগজটা মেলতেই দেখা গেল ওটা একটা পোর্ট্রেট। ছবিটা দেখেই একটু যেন চমকে উঠল রানা।

চারকোল দিয়ে আঁকা।

মুখটা জীবন্ত। বিশেষ করে দু'চোখ। উঁচু চোয়াল। কপালে গুলির দাগ।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ছবিটার দিকে চেয়ে থাকল রানা।

গভীর মনোযোগে ওকে খেয়াল করছেন দম্পতি।

কিছুক্ষণ পর ঘুরে মিসেস হার্টিগানের দিকে তাকাল রানা। একটু বেসুরো কণ্ঠ: 'আপনার ধারণা ওই লোক আর এই ছবির মানুষটা একইরকম দেখতে?'

ঘন ঘন মাথা দোলালেন মহিলা। 'হ্যাঁ। মনে গেঁথে আছে ওই মুখ। সে-রাতেই আঁকি। মিস্টার রানা, এ-ই এসেছিল সেদিন।'

আরও কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছবিটা দেখল রানা।

'এই ছবি কাজে আসবে?' জানতে চাইলেন মিস্টার হার্টিগান।

তাঁর চোখে তাকাল রানা, 'মিস্টার হার্টিগান, আমি একে চিনি।'

চমকে গেছেন বৃদ্ধ দম্পতি। 'তাই? এ কে?'

চারকোলে আঁকা ছবি আরেকবার দেখে নিয়ে বলল রানা, ‘চিনবেন না। তবে তাকে আর পাওয়া যাবে না।’

‘মানে? একটু খুলে বলবেন?’

পোর্ট্রেটের ওপর টোকা দিল রানা। ‘এ মারা গেছে চার বছর আগে।’

কয়েক সেকেণ্ড পর কথা খুঁজে পেলেন মিস্টার হার্টিগান, ‘আপনি এটা কী বলছেন, মিস্টার রানা?’

‘ভুল বলিনি। আমিই খুন করেছি ওকে।’

চার

মাসুদ রানা বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর কয়েক মিনিট নীরবে বসে থাকলেন মিস্টার হার্টিগান ও তাঁর স্ত্রী। তারপর রাইটিং ডেস্কের কাছে গেলেন শার্লি, ওখান থেকে নিয়ে এলেন জুতোর একটা বাক্স। ওটা রাখলেন কফি-টেবিলের ওপর। ঢাকনি খুলে বের করলেন গোটা দশেক চিঠি ও খাম। তাঁর জানা আছে, ঠিক কোন্ খাম তাঁর চাই। খস্-খস্ আওয়াজ তুলে নাড়ছেন কাগজ। মনোযোগ দিয়ে তাঁকে দেখছেন তাঁর স্বামী।

একটি চিঠির নির্দিষ্ট অংশ উচ্চারণ করে পড়তে লাগলেন শার্লি: ‘আমরা বারবার রেইড দিচ্ছি জঙ্গলে। কয়েকবার হামলা করেছি ইয়াবা উৎপাদনকারী আর স্মাগলারদের কিছু কারখানা ও আখড়ায়। এ কাজটা ভীষণ বিপজ্জনক। মারা পড়তে পারি যখন তখন। তবে তোমরা ভয় পেয়ো না। আমাদের ট্রেনিং দেয়া

হয়েছে এসবের জন্যে। এরই ভেতর আহত হয়েছে কয়েকজন, সরিয়ে নেয়া হয়েছে তাদেরকে। আমাদের সঙ্গে অচেনা বেশ ক'জন লোক এসেছেন। এঁরা সৈনিক নন। কিন্তু মনে হচ্ছে, এঁরা আমাদের চেয়েও দক্ষ। আমরা অবশ্য দ্রুত শিখছি।

'এঁদের ভেতর একজনকে খুব ভাল লেগেছে আমার। তাঁকে বন্ধু বলতে পারব না। নিজে থেকে কোনও কথা বলেন না। আমাদের ইউনিটের অফিসারদের কাছে শুনেছি, দুর্দান্ত যোদ্ধা ওই বাঙালি মানুষটা।

'আমিই আমাদের ইউনিটের সবচেয়ে কমবয়সী। সবাই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। কিন্তু ওই বাঙালি যোদ্ধা কখনও অপমান করেননি আমাকে। বহু কিছুই শিখেছি তাঁর কাছ থেকে। আগে জানতাম না কতধরনের অস্ত্র, বোমা বা বুবিট্র্যাপ থাকতে পারে। আমাদের ফোর্সের কর্নেলের চেয়ে হাজার গুণ বেশি যোগ্য লোক তিনি। অথচ ডাঁট নেই, কিছু জানতে চাইলে ভালভাবে বুঝিয়ে দেন।

'ক'দিন ধরে দেখছি গোলাগুলি শুরু হলেই কখন যেন তাঁর পিছনে লুকিয়ে পড়ছি। আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করেছি, আমাকে আগলে রাখছেন উনি। এতে অপমানও লাগছে, আবার স্বস্তিও পাচ্ছি। জানি, তাঁর বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু উনি আপত্তি করেননি বলে নাম ধরেই ডাকি। তাঁর নাম মাসুদ রানা।
'

কাগজটা আবারও খামে যত্ন করে রাখলেন মিসেস হার্টিগান। আরেকটা খামের ভেতর থেকে চিঠি নিলেন। নিচু স্বরে পড়তে লাগলেন: 'জানতাম না এত পরিশ্রান্ত হওয়া যায়। একের পর এক রেইড দিচ্ছি। আমি বড় ক্লান্ত। গতকাল ভিয়েতনামের একটা জঙ্গলের ভেতরে এক উপত্যকার গ্রামে রেইড দিয়েছি। গ্রামের মোড়লকে ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছিলেন কর্নেল।

কিন্তু গতকাল আমাদের সঙ্গে ভিয়েতনামিয অনুবাদক ছিল না। মোড়ল শিক্ষিত মানুষ, কিন্তু ইংরেজি জানে না। আমাদের ক্যাপ্টেনের ফ্রেঞ্চ জানার কথা। কিন্তু সে নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়েছে লেখাপড়ায়। বলতে গেলে কিছুই বুঝল না। এতে ভীষণ রেগে গেল সে, সৈনিকদের বলল মোড়লকে বেঁধে আচ্ছামত পেটাতে। তাই করতে হতো, কিন্তু তখনই বাধা দিলেন মিস্টার রানা। ফ্রেঞ্চ ভাষায় মোড়লের সঙ্গে কথা বললেন। হাসছিলেন দু'জন। ইয়াবা উৎপাদনকারীদের কারখানা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গেল মোড়লের কাছ থেকে। লিখে নেয়া হলো সবই, এরপর যা হলো, তা অমানুষিক। আরও দু'চার কথা বললেন মাসুদ রানা, তারপর ভয়ঙ্করভাবে পেটাতে লাগলেন প্রৌঢ় মোড়লকে! আগে কখনও কাউকে এভাবে বেদম মার খেতে দেখিনি। নৃশংস! আমরা কেউ বুঝলাম না কেন এমন করা হচ্ছে! মোড়ল তো সহায়তাই করেছিলেন! আমাদের দলের সবাই ধরে নিল, মাসুদ রানা আসলে ভয়ঙ্কর এক স্যাডিস্ট। যেভাবে লাথি দিয়েছেন বুড়ো মানুষটার বুক-পেটে! নিজ চোখে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। রাতে সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম মাসুদ রানার কাছে, "আপনি মানুষটাকে এভাবে নির্যাতন করলেন কেন? কী করেছিলেন তিনি?"

'উনি শুধু বললেন, আমরা রেইড করে চলে আসার পর আবারও গ্রামে ফিরবে উৎপাদনকারীর লোক ও স্মাগলাররা। তখন যদি টের পায় গ্রামের মোড়ল সুস্থ, সেক্ষেত্রে মেরেই ফেলবে। তাঁকে সন্দেহের আওতা থেকে সরিয়ে দিয়েছেন তিনি। মোড়ল সব জেনে শুনেই রাজি হয়েছেন। ব্যথা পেলেন বটে, কিন্তু প্রাণটা তো বাঁচল!

'মাসুদ রানা কাউকে বলেননি কেন কী করেছেন। একেবারেই অন্যরকম মানুষ। আমাকে দেখেন স্নেহের চোখে, তাই জবাব দিয়েছেন প্রশ্নের।'

এই চিঠিও ভাঁজ করে খামে রেখে দিলেন মিসেস হার্টিগান।

পরের চিঠি খুললেন।

ওটা এসেছে পেন্টাগন থেকে। শুরুতেই লেখা:

যুদ্ধের ময়দানে হারিয়ে গেছে জর্জ হার্টিগান।

এরপর সপ্তাহের পর সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেল বছর। অপেক্ষা করলেন হার্টিগান দম্পতি। বুকে আশা: একদিন শুনবেন খোঁজ পাওয়া গেছে জর্জের। কিন্তু আর কোনও তথ্য দিতে পারল না কেউ। পার হলো চার-চারটে বছর। ততদিনে শুকিয়ে গেছে শার্লির চোখের জল।

আর আজ তাঁদের ছেলেকে খুঁজতে রাজি হলেন সেই মহৎ-হৃদয় বাঙালি যোদ্ধা।

উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার হার্টিগান, স্ত্রীর কাছ থেকে বাক্সটা নিয়ে রাইটিং ডেস্কের ড্রয়ারে রেখে লাগিয়ে দিলেন তালা।

পাঁচ

'মরুক কমপিউটার!' প্রকাণ্ড ঘরের চারপাশে তাকালেন কর্নেল গর্ডন। তিনি মিসিং-ইন-অ্যাকশন বিভাগের কর্নেল ও চিফ। তাঁর সামনে বসে আছে পিটার লারসেন। 'তিরিশ বছর হলো এই ডিপার্টমেন্টে কাজ করছি, আর এই অফিসে যখন কমপিউটার নিয়ে ঢুকল ছোকরাগুলো, ওরা বলেছিল এখন থেকে কাগজের সব কাজ শেষ! পুরো গাঁজা মেরে পার পেয়ে গেছে! এখন কাগজ লাগছে দশগুণ বেশি! শালাদের কমপিউটার কোনও কাজেই এল

না!’ পিটারের দিকে তাকালেন তিনি। ‘এর কারণ জানেন?’

আস্তে করে মাথা নাড়ল পিটার লারসেন। ‘জানি না। তবে কারণটা বোধহয় বুঝি। ডেনিশ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে মিসিং পার্সন্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছি। কমপিউটার ব্যবহারও করেছি। বড় এক মেশিন থেকে সারাদিন বেরোত কাগজ। মনে পড়ল এ বিষয়ে একটা গল্প। বিসমার্ক একসময় বুঝলেন জার্মান ব্যুরোক্রেসির কারণে ফালতু কাগজে ভরে গেছে বিশাল দুটো ওয়্যারহাউস। বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, “পুড়িয়ে ফেলতে হবে সব ডকুমেন্ট।”

‘পেরিয়ে গেল দু’বছর, এরপর আবারও তাঁর মনে পড়ল কী নির্দেশ দিয়েছেন। চিফ অভ স্টাফকে জিজ্ঞেস করলেন। তাতে খোঁজ নিলেন চিফ অভ স্টাফ। তারপর বিসমার্ককে জানালেন, “মাত্র দশভাগ কাগজ পোড়ানো গেছে।”

‘“এর কারণ কী?” জানতে চাইলেন বিসমার্ক।

‘চিফ অভ স্টাফ বললেন, “ব্যুরোক্রেটরা বলছে, বহু বছর লাগবে সব ডকুমেন্ট কপি করে তারপর মূল ডকুমেন্ট পুড়িয়ে দিতে।”’

প্রথমবারের মত হাসলেন কর্নেল। সহজ হয়ে এল চেহারার ভাঁজ। তাঁর কাজ মানসিকভাবে ক্লান্তিকর। বেশিরভাগ অফিসার এ বিভাগে কাজ করতে রাজি হন না। এই দালানে রয়েছে কমপক্ষে তিরিশ হাজার ফাইল। যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া আমেরিকান সৈনিক ও অফিসারের ডকুমেন্ট প্রতিটি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে আজ পর্যন্ত যত আমেরিকান সৈনিক ও অফিসার খোয়া গেছে, তাদের বিষয়ে কাজ করছে এই ডিপার্টমেন্ট। হাজার হাজার পরিবার আজও অন্তর থেকে বিশ্বাস করে, আবারও ফিরবে তাদের আত্মীয়। অন্য কোনও দেশ কখনও আমেরিকার মত শত শত মিলিয়ন ডলার খরচ করেনি তাদের সৈনিক বা অফিসারদের খুঁজতে। আমেরিকান

সরকারের এত টাকা ব্যয়ের বড় কারণ, সাধারণ মানুষের আবেগ নিয়ে তারা হেলাফেলা করার সাহস রাখে না। অন্য কারণটি, রাজনৈতিকভাবে ফায়দা লোটা। আজকাল এ দেশের কোনও প্রেসিডেন্টই চান না, অন্য দেশের যুদ্ধে সৈনিক ও অফিসার পাঠাতে। আর সেকারণেই নির্বিকারভাবে বোমা ফেলছেন অন্য দেশের নিরীহ মানুষের ওপর। আসলে খোসা থেকে চিনা বাদাম বের করতে হাতুড়ি হাঁকাচ্ছেন তাঁরা। ফলে খোসার সঙ্গে বাদামও শেষ।

ভাল করেই এসব জানে পিটার লারসেন। এক সপ্তাহ হলো ওয়াশিংটনে এসেছে। এরই ভেতর ওস্তাদ হয়ে গেছে মিসিং-ইন-অ্যাকশন ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে। নিজ কাজে অত্যন্ত দক্ষ এই বিভাগের বর্তমান কর্নেল, সামান্যতম ফাঁকি দেন না দায়িত্বে। পদমর্যাদা যতই থাকুক, রেগে ওঠেন না কখনও। তাঁর অধীনে কাজ করছে তিন শ' কর্মকর্তা ও কর্মচারী। মানুষের হাড় সনাক্ত করতে পারেন, এমন বিশেষজ্ঞও রয়েছেন তাদের ভেতর।

ডগট্যাগটা কর্নেলের দিকে বাড়িয়ে দিল লারসেন, 'জানি আগেও আপনার কর্মচারীরা এটা দেখেছে। তাদের ধারণা এই ডগট্যাগটা আসল।'

হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগে ডগট্যাগ দেখলেন কর্নেল গর্ডন। আস্তে করে দোলালেন ধূসর চুলভরা মাথা। 'তাই তো মনে হচ্ছে। আপনি আসলে কী জানতে চাইছেন?'

'এই বিশেষ ছেলেটির বিষয়ে আগ্রহী আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আপনার হাতে ওটা স্পেশাল ফোর্সের এক জিআইএ-র ডগট্যাগ। ভিয়েতনাম-ক্যামবোডিয়ার সীমান্তে হারিয়ে গিয়েছিল চার বছর আগে। সেসময় আমার বন্ধু ওখানেই ছিল।'

উল্টেপাল্টে ডগট্যাগ দেখছেন কর্নেল। জানতে চাইলেন, 'এর নাম কি আসলেই জর্জ, না ডাক নাম?'

'আসল নাম।'

কমপিউটার কন্সোলের দিকে তাকালেন কর্নেল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'বোতাম টিপে দিলেই স্ক্রিনে হাজির হবে ফাইলটা, কিন্তু বিসমার্কের ব্যুরোক্রেটদের ভালবাসি। পুরনো আমলের লোক তো!' সামনে ঝুঁকলেন তিনি, টেবিলে রাখা ইন্টারকমের বাটন টিপে বললেন, 'মারিয়া, একটা ফাইল চাই। ওটা এসএফসি জর্জ হার্টিগানের। চার বছর আগে হারিয়ে গেছে ভিয়েতনাম আর ক্যামবোডিয়ার সীমান্তে।'

দশ মিনিট পেরিয়ে গেল নির্দিষ্ট ফাইল আসতে। তারই মাঝে অফিসের কফি মেশিন থেকে নিয়ে এলেন কর্নেল তিন মগ কফি। চোখ টিপলেন পিটারের উদ্দেশে, ডেস্ক ড্রয়ার খুলে বের করলেন এক বোতল মার্টেল ব্র্যাণ্ডি। বললেন, 'স্বাদ বাড়াতে খুবই কাজে আসে। আর্মির দেয়া কফিকে বিষ বললেও ভুল হবে না।'

চার আঙুল পরিমাণ ব্র্যাণ্ডি ঢাললেন প্রতিটি মগে। পিটারের দিকে বাড়িয়ে দিলেন একটা মগ। আরেকটা গেল পিটারের পাশে বসে থাকা ব্রিয়াঁর সামনে। 'স্কাল! জীবনটা একটু সহজ হোক!'

'স্কাল!' হাসল লারসেন। 'কখনও গেছেন আমার দেশে?'

'হ্যাঁ। ন্যাটোর এমআইএ-র অনেকেই লুকিয়ে পড়ত সুইডেনে। আমার কাজ ছিল পালিয়ে যাওয়া সার্ভিসমেনকে খুঁজে বের করা। সুইডেন সরকারের সঙ্গে লিয়েয রাখতাম।' কাঁধ ঝাঁকালেন কর্নেল। 'সুইডেন বা স্টকহোম খুব ম্যাড়মেড়ে লাগত। ছুটির দিনে ফেরিতে করে যেতাম কোপেনহেগেনে। ডেইনদের রসিকতা বা কমপয়সার ভাল মদ দারুণ ছিল। মেয়েগুলোও চমৎকার।'

'কোথায় উঠতেন?' জিজ্ঞেস করল লারসেন।

'কাকাডু... এখনও আছে ওটা?'

'হ্যাঁ, আছে। মেয়েরাও আছে, কিন্তু খদ্দের আজ বেশিরভাগই

জাপানিয।'

টোকার আওয়াজ হলো দরজায়। ঘরে ঢুকল ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম পরনে এক সুন্দরী মেয়ে। হাতে পুরু ফাইল। চট্ করে লারসেন ও পেঁচাকে দেখে নিল, তারপর ফাইলটা কর্নেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।

কালো ইলাস্টিক দিয়ে বাঁধা প্রচ্ছদ লাল রঙের। ফাইলের ওপর অংশে ডানদিকের কোণে স্ট্যাম্প করে লেখা: এমআইএ (ইএক্সএল)। ফাইলটা ডেস্কের ওপর দিয়ে পিটারের দিকে ঠেলে দিলেন কর্নেল। 'নিয়মের বাইরে এ কাজ করছি, কিন্তু আপনার দেশে সুন্দর সময় কাটিয়েছি, কাজেই আপনাকে পড়তে দেব ফাইলটা। ফাইলের কোনও অংশ কপি করতে দেয়ার অধিকার আমার নেই। তা যদি চান, সেক্রেটারি অভ ডিফেন্সের অনুমতি লাগবে।'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে নিঃশব্দে ধন্যবাদ দিল লারসেন। ফাইলের ওপরের অক্ষরগুলোর ওপর টোকা দিল। 'এসব অক্ষর দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে, কর্নেল?'

'কম ও বেশির গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে। ইএক্সএল মানে গুরুত্ব কম। ধারণা করা হচ্ছে, মানুষটাকে জীবিত পাওয়া যাবে না। কঙ্কাল মেলার সম্ভাবনাও কম।' ডেস্কে পড়ে থাকা ডগট্যাগ আবারও দেখলেন কর্নেল। 'কিন্তু আশা ছাড়ি না আমরা। কেউ একজন হাতে হাতে ডগট্যাগ পৌঁছে দিয়েছে ওর পরিবারের কাছে। কাজেই ভাবছি, বিষয়টা ফাইলে থাকা উচিত।'

ফাইল খুলে পড়তে লাগল লারসেন। অ্যাকশন রিপোর্ট লিখেছে এক ক্যাপ্টেন। ফাইল সোজা গেছে ডিভিশনাল কমব্যাট ইন্টেলিজেন্স অফিসে। এই ফাইলের প্রতিটি কথা নেতিবাচক।

দ্রুত পড়েও ফাইল শেষ করতে আধঘণ্টা লাগল পিটারের। তারই ভেতর আরও দু'বার মগ ভরা কফি ও তার ভেতর চার

আঙুল ব্র্যাণ্ডি ঢেলে ওদেরকে আপ্যায়ন করলেন কর্নেল গর্ডন। ওরা হাড়ে হাড়ে টের পেল, এভাবে ব্র্যাণ্ডি গিললে সময় লাগবে না মাতাল হতে।

পড়া শেষ করে ফাইল বন্ধ করল লারসেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বুঝলাম, কেন দিয়েছেন লো গ্রেড। সবই লেখা হয়েছে বিস্তারিতভাবে। ...ফাইল পড়তে দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ, কর্নেল।'

www.boighar.com

গম্ভীর চেহারায় পিটারের কথা শুনলেন কর্নেল গর্ডন, চোখ রাখলেন ডেস্কের একটি ফ্রেম করা ফোটোতে। 'আমার নিজের ছেলেকে হারিয়েছি আফগানিস্তানে। লাশটা এনে কবর দেয়া হয়েছে আর্লিংটনের গোরস্তানে। অনেকে বুঝবেই না মৃত সন্তানের বাবা-মা'র কাছে এটা কতখানি জরুরি— তাদের ছেলে ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্তে। যদিও আছে মাটির নিচে। কাছের কাউকে না কাউকে হারিয়েছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের অনেক অফিসার। আর তাই ওরা জানে, কেমন লাগে কোনও আত্মীয় হারালে। নিজেদের কাজটাকে আমরা গুরুত্ব দিই। অনেক বাবা-মা-ভাই-বোন-স্ত্রীর কষ্ট দেখতে হয়, কিন্তু সাধ্যমত খোঁজখবর নিই।' জানালা দিয়ে পটোম্যাক নদীর দিকে চলে গেল তাঁর চোখ। 'এখন অনেক বদলে গেছে আমেরিকা। আগে অন্যরকম ছিল এ দেশের পরিবারগুলো, সবাই জানত দেশের জন্যে ভিন দেশে গিয়ে জান দিচ্ছে তাদের ছেলেরা। কিন্তু ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর সবাই বুঝে গেছে, মাতৃভূমির জন্যে লড়ছে না আমেরিকার সৈনিকরা। ঢিলাও হয়ে গেছে পরিবারের বাঁধুনি। কিন্তু যেসব বাবা-মা হারিয়ে বসেছেন সন্তানকে, তাঁদের মনোভাব পাল্টে যাওয়ার নয়। তাঁরা আজও আশা করেন, একদিন ফিরবে সন্তান। মনে করেন খামোকা জান দেয়নি ওরা।' ফাইলের দিকে আবারও তাকালেন কর্নেল। 'হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন জর্জ হার্টিগানের বাবা-মা।

তারপর তাঁদের কাছে এল ওই ডগট্যাগ। আশা-নিরাশার মাঝে নরকে বাস করছেন এখন।' হঠাৎ করেই প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল, 'আপনাদের বন্ধু, তিনি কি রেগুলার আর্মিতে আছেন?'

মাথা নাড়ল লারসেন। 'আগে বাংলাদেশ আর্মিতে ছিলেন।'

'বুঝতে পারছি, চার বছর পর এমনি এমনি বুনো হাঁসের পিছনে ছুটছেন না তিনি। অথচ জর্জ হার্টিগানের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। নিশ্চয়ই ওকে খুবই পছন্দ করতেন তিনি।'

www.boighar.com

উঠে দাঁড়াল পিটার লারসেন। 'না, ওরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না। সত্যি বলতে, জানি না কেন আবারও ভিয়েতনামে যাচ্ছে আমার বন্ধু। তবে এ-ও ঠিক, ও অন্যদের মত নয়। কখনও টাকার পিছনে ছুটবে না।' ব্রিফকেস তুলে নিল লারসেন, ওটার ওপরের পকেট থেকে নিজের কার্ড নিয়ে নামিয়ে রাখল ডেস্কে। 'সবকিছুর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, কর্নেল। আবারও কখনও কোপেনহেগেনে এলে আমাকে ফোন দিলেই দেখা হবে।'

পেঁচার পাশে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে লারসেন, কিন্তু থামতে হলো ওকে কর্নেলের কথায়।

'আপনার বন্ধু কিন্তু ভিয়েতনামে ইউএস এমআইএ-র বিষয়ে খোঁজ নিলে মস্ত বিপদে পড়তে পারেন।'

'ঠিকই বলেছেন, কর্নেল,' ঘুরে বলল লারসেন। 'আমি সাধারণ ডিটেকটিভ। কিন্তু আমার বন্ধু কখনও পিছিয়ে যায় না কোনও কাজ থেকে। ভাল করেই জানে, কীভাবে দেখভাল করতে হবে নিজের। যাই হোক, কর্নেল, সতর্ক করার জন্যে ধন্যবাদ।'

কর্নেলের অফিস থেকে বেরিয়ে এল লারসেন ও ফুলজেন্স।

ছয়

'ফাঁদ না হয়েই যায় না,' বলল পিটার লারসেন।

স্যান ডিয়েগোর নামকরা এক হোটেলের ওপর তলার সুইটে প্রকাণ্ড জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়া, ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। বারবার আকাশ চিরে এঁকেবেঁকে ঝলসে উঠছে অত্যুজ্জ্বল নীলচে-সাদা বিজলি।

খাটে বসে আছে লারসেন, পাশেই খোলা ব্রিফকেস। কোলে ল্যাপটপ কমপিউটার।

ঘরের কোণের চেয়ারে পেঁচা।

'ফাঁদে ফেলে কী পাবে?' তুমুল বৃষ্টির দিক থেকে মুখ না ফিরিয়ে বলল রানা।

'তোমাকে বাগে পাওয়াই যথেষ্ট নয়?' বলল লারসেন, 'প্রথম টোপ ডগট্যাগ। এরপর র‍্যাপিং পেপারে তোমার নাম। তারপর তুমি জানলে হার্টিগানদের বাড়িতে যে পৌঁছে দিয়েছে ওসব, তোমার হাতেই মারা গেছে সে।'

'নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই, সে ওই লোকই,' ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল রানা, 'প্রমাণ বলতে শুধু একটা স্কেচ। অবশ্য যে বর্ণনা পেয়েছি, তা মেলে তার চেহারার সঙ্গে। আজকাল বাম পায়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।'

আলোচনায় যোগ দিল ব্রিয়াঁ: 'কাকতালীয় কিছু বিশ্বাস করি না। যাকে মৃত বলে ভেবেছ, সে আসলে কে?'

'ভিয়েতনামিয পুলিশ কমিশনার, নাম কুয়েন আন টু। ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র অফিসার। খুবই অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ ছিল। কাজ করত ড্রাগ উৎপাদনকারী আর স্মাগলারদের হয়ে। প্রমাণ করা কঠিন ছিল সে ঘুষখোর ও খুনি।'

রানা চুপ হয়ে যেতেই জানতে চাইল লারসেন, 'আদালতে তার বিচার হয়নি?'

'না। প্রমাণ জোগাড় করার আগেই একরাতে পালিয়ে যায়। পরের রাতে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়েই বুঝলাম, গলির ভেতর অপেক্ষা করছে কেউ। আকাশে চাঁদ ছিল না। দু'জনের মাঝে ছিল পনেরো ফুট ফারাক। ওদিক থেকে গুলি আসতেই পাল্টা গুলি করলাম। এত কাছ থেকে সাধারণত মিস করি না।'

'লোকটা পড়ে যেতে চেক করোনি?' জিজ্ঞেস করল ব্রিয়াঁ।

'উপায় ছিল না। কয়েক দালান দূরেই এক পতিতালয়ে রেইড করেছিল পুলিশ। তারা ছুটে আসতে লাগল। দেরি না করে সরে পড়লাম।'

সামনে ঝুঁকল লারসেন। 'পরে তার সম্পর্কে আর কিছু শুনতে পাওনি?'

'না, সময় বা সুযোগ হয়নি। পরদিন ট্যান সন নাট এয়ারপোর্ট থেকে বিমানে উঠে নামলাম গিয়ে ব্যাংককে। পরে আর ফেরা হয়নি ভিয়েতনামে।'

ল্যাপটপে কী যেন করছে লারসেন, মুখ তুলল। 'ওই পুলিশ অফিসার... কুয়েন আন টু... তাকে ভাল করে চিনতে?'

'মাত্র কয়েক দিনে যতটা চেনা যায়।'

'তুমি নিশ্চিত সে-ই গুলি করেছিল?' জানতে চাইল পেঁচা।

'হ্যাঁ। গুলি করার আগে বলছিল কেন আমাকে খুন করছে।'

কি-বোর্ডে ঝড় তুলছে লারসেন। তারই ফাঁকে বলল, 'মনে পড়ে কোন্ রাতে গোলাগুলি হয়েছিল?'

‘সেটা জানা কি খুব জরুরি?’

‘হ্যাঁ, সম্ভব হলে ওই শহরের সব হাসপাতালের রেকর্ড ঘাঁটব। জানতে হবে সে সত্যিই মারা পড়েছে, না বেঁচে আছে।’ মৃদু হাসল লারসেন। ‘এটা জানা ডিটেকটিভদের কাজ। যথেষ্ট তথ্য দিতে পারছ না তুমি। আসলে জানোই না কীভাবে তদন্ত করতে হয়।’

ভয়ঙ্করভাবে ভুরু কুঁচকে ব্রিয়াঁর দিকে তাকাল রানা। ‘পেঁচা, এই বুড়োভাম ভুলে যাচ্ছে খরচপাতি আমিই দিচ্ছি!’

‘ঠিকই বলেছে রানা,’ গম্ভীর মুখে বলল ফুলজেন্স। ‘কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বুড়ো গাধাটার মগজ ওর বিচির চেয়ে সামান্য বড়।’

‘মনে হয় আমাকে নানানভাবে অপমানের চেষ্টা হচ্ছে,’ কঠোর সুরে বলল লারসেন। ‘কিন্তু ভুললে চলবে না, দুধের শিশুদের কথায় রাগ করলে চলে না জ্ঞানীগুণীদের। ...রানা, মনে করার চেষ্টা করো তারিখটা। জানতে হবে, বছরের বায়ান্নটা সপ্তাহের কোন্ সপ্তাহ ছিল ওটা।’

ভাবতে গিয়ে আধমিনিট পর বলল রানা, ‘ক্রিসমাসের আগের সপ্তাহ। বৃহস্পতিবার রাত। চার বছর আগে।’

কমপিউটারের কি-বোর্ডে টাইপ করছে লারসেন। ‘ল্যাপটপের ক্যালেণ্ডার দেখে বের করে নেব তারিখ।’

অন্য দু’জনকে বিস্মিত করে উঠে দাঁড়াল পেঁচা। সাধারণত গা নাড়াতে চায় না, এখন পায়চারি করছে। যেন ঘরে রানা নেই, এমন ভঙ্গিতে পিটারের উদ্দেশে মুখ খুলল: ‘ওই কুয়েন আন টু। সে যদি বেঁচেই থাকে, হয়তো প্রতিশোধ নিতে চাইছে। কিন্তু সেজন্যে চার বছর বসে থাকল কেন? ওই ডগট্যাগ যদি টোপ হয়, তো সে জানে জর্জ হার্টিগানের বাবা খুঁজে বের করবে রানাকে। কিন্তু নিজে সে জানত না রানা আছে ব্রাসেলসে, নইলে নিজেই গিয়ে খুন করে ভাগত।’

‘ঠিক,’ সায় দিল লারসেন, ‘রানাকে ভিয়েতনামে নিয়ে যেতে চাইছে কুয়েন আন টু। আমার ধারণা, অনেক আগেই মারা পড়েছে জর্জ হার্টিগান। ডগট্যাগ আর কাগজের লেখা আসলে টোপ। তার মানেই কুয়েন আন টুর পিছনে অন্য কেউ আছে। বড় কাতলা।’

এবার আলাপে যোগ দিল রানা, ‘কীভাবে এসব জানা গেল, আমাদের ব্রিলিয়ান্ট ডিটেকটিভ পিটার লারসেন... স্যর?’

কোল থেকে ল্যাপটপ নামাল লারসেন। ডালা বন্ধ করে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে ওটাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। উঠে দাঁড়িয়ে কুকুরের মত হাউ-উ-উ আওয়াজ তুলে আড়মোড়া ভাঙল। চোখেমুখে এমন ভঙ্গি নিয়ে রানার দিকে তাকাল, যেন সবই জানে সে। ‘এমন কী জিনিয়াসরাও মাঝে মাঝে শুধু অন্তরের কথাই শোনে। যে-কেউ বুঝবে, ভিয়েতনামের বড় কোনও চাঁই বারোটা বাজাতে চাইছে তোমার। ওই দেশে কতজন ক্ষমতাশালী শত্রু আছে তোমার, রানা?’

মাত্র তিন সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রানা। ‘আগে চলো, পেটে কিছু দিই। পরে ভেবে বিরাট এক লিস্ট দেব তোমাকে।’

সাত

প্রথম দর্শনে মনে হবে সে সুন্দরী। দ্বিতীয়বার যুবতীকে দেখলে পাল্টে যাবে মনোভাব। স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু চোয়াল। শিকারি

পাখির চঞ্চুর মত বাঁকা হয়ে নিচে নেমেছে নাকের ডগা। তার চেয়েও বড় কথা, যে কারও গলা শুকিয়ে দেবে শীতল ওই চোখ দুটো। অনেকে পিছনে ডাকে 'বিষনাগিনী' বলে। ওই নাম হয়েছে চাহনির বিষের কারণে। কিন্তু কারও সাহস নেই মুখের ওপর এ কথা বলবে।

আসল নাম দায়না বেলগুতাই। চরম নিষ্ঠুর শুধু নয়, নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ। সাধারণত পরে ডিযাইনার কালো জিন্স। অন্তরটাও কুচকুচে কালো। এ মুহূর্তে তার সামনে টেবিলের ওপাশে বসে আছে দামি পোশাক পরা এক থাই ব্যবসায়ী। দায়না বেলগুতাইয়ের অতীত সম্পর্কে যথেষ্ট শুনেছে সে। এ মেয়ের বাবা ছিল ড্রাগ উৎপাদনকারী, কুখ্যাত স্মাগলার ও নৃশংস খুনি। নাম জন বেলগুতাই, মোঙ্গল ও আমেরিকান বর্ণসংকর। ড্রাগসের ব্যবসার মাধ্যমে নব্বুই দশকের শেষ দিকে হয়ে ওঠে মস্ত বড়লোক। ভিয়েতনাম ও ক্যামবোডিয়া জুড়ে মূল্যবান পাথর ও নানান বেআইনী ব্যবসা চালু করে। টাকা, ড্রাগ্‌স্‌, মেয়েমানুষ ও মদের বিনিময়ে কিনে নেয় ঘুষখোর সরকারী কর্মকর্তাদেরকে।

চার বছর আগে রহস্যজনক এক আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সে হংকঙের নিউ টেরিটোরির এক প্যাগোডায়।

দায়না বেলগুতাইয়ের মা ছিল অত্যন্ত সুন্দরী এক ক্যামবোডিয়ান পতিতা।

লেখাপড়া করাতে একমাত্র সন্তানকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিয়েছিল দায়নার বাবা। ভাল রেজাল্ট করে ক্যামবোডিয়ায় ফিরল দায়না, বিয়েও করল উচ্চপদস্থ এক সরকারী কর্মকর্তাকে। তবে স্বামীর অন্য মেয়েমানুষের অভ্যাস আছে টের পেতেই নিজ হাতে খুন করেছে তাকে। দায়নার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বাবার দুর্দান্ত কালো ব্যবসা-বুদ্ধি এবং মা'র পুরুষদের সন্তুষ্ট করার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা— দুটোই পেয়েছে দায়না। ফলে ওর সামনে

নিতান্তই অসহায় পুরুষমানুষ।

দায়নার দিকে তাকাল থাই ব্যবসায়ী, সুড়সুড় করে উঠল তলপেট। মেয়েটিকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছে হলো তার, কিন্তু সেই সঙ্গে কাজ করছে মনের ভেতর ভয়— এই বুঝি ঠকে গেলাম!

দায়না বেলগুতাইয়ের পেছনে, দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে চওড়া কাঁধের দুই বেঁটে ক্যামবোডিয়ান মেয়েমানুষ। পরনে কালো টিউনিক ও ট্রাউযার। কোমরের হোলস্টারে ঝুলছে পিস্তল। দুই মেয়েমানুষের চেহারায় কোনও অনুভূতির ছাপ নেই। কিন্তু চোখগুলো কখনও সরছে না থাই ব্যবসায়ীর ওপর থেকে।

থাই ব্যবসায়ীর পরনে দামি ইটালিয়ান স্যুট, ভেতরে সিল্কের শার্ট। গলা থেকে ঝুলছে সিল্কের স্ট্রাইপ আঁকা টাই। জুতো গুচ্চির। থাই-ক্যামবোডিয়ার সীমান্তের এ জঙ্গলের হাইড আউটে খুবই বেমানান তার পোশাক। তাতে কী, তাদের দু'জনের ব্যবসায়িক আলাপও স্বাভাবিক কোনও মিটিং নয়।

টেবিলের ওপর দিয়ে চ্যাপ্টা কাঠের বাক্স থাই ব্যবসায়ীর দিকে বাড়িয়ে দিল দায়না বেলগুতাই। নিচু স্বরে বলল, 'আমি ব্যস্ত মানুষ। চুক্তির জন্যে পনেরো মিনিট পাবেন। টাকা দিতে হবে ইউএস ডলারে। অথবা সুইস ফ্রাঙ্ক বা সোনায়।'

বাক্স খুলে ভেতরে চোখ রাখল থাই ব্যবসায়ী। দামি পাথরগুলো আনকাট স্যাফায়ার ও জেড। একটা জেড তুলে নিয়ে ওজন দেখল ব্যবসায়ী। কমপক্ষে পঞ্চাশ গ্রাম। একপাশে সামান্য চিরে দেয়া হয়েছে। সে কারণে দেখা গেল ফ্যাকাসে সবুজ তেলতেলে রং।

মুখ তুলে যুবতীর ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি দেখল সে।

'পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে দক্ষ কোনও এক্সপার্টকে দিয়ে ওগুলো দেখিয়ে নিতে পারতেন, কিন্তু সময় হাতে নেই, মিস্টার

উবোন। এ এলাকায় জীবন সর্বক্ষণ এক জুয়াখেলা।'

ঘরে এয়ার-কণ্ডিশনার নেই। থাই ব্যবসায়ী টের পেল, তার পেট বেয়ে কুলকুল করে নামছে ঘাম। মনটা চাইল একটু ঢিলা করবে টাই। কিন্তু কাজটা ঠিক হবে না বুঝে হাত তুলল না। এই প্রথমবারের মত এই মেয়ের সঙ্গে ব্যবসা করতে এসেছে। ব্যাংককের বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী কয়েক বছর ধরেই এর সঙ্গে ব্যবসা করছে। কেউ কেউ লাখ লাখ ডলার মুনাফা করেছে। আবার অনেকে পড়েছে ক্ষতির মুখে। উবোন জানে, সে আছে জঙ্গলের মাঝে এক অদ্ভুত ক্যাসিনোয়। খেয়াল করল, চট্ করে সোনার রোলেক্স ঘড়ি দেখল মেয়েটা। পাথরগুলোর ওপর আবারও মনোযোগ দিল উবোন। সব মিলে তিন ডজন পাথর। ওগুলোর ভেতর থেকে বেশ কিছু পাথর বাছাই করল উবোন।

নীরবে দেখছে দায়না বেলগুতাই। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'নিলে সব নেবেন, নইলে একটাও না।'

নিয়মটা জানে উবোন। সহজ স্বরে বলল, 'পঞ্চাশ হাজার ইউএস ডলার।'

www.boighar.com

বাঁকা হাসল দায়না বেলগুতাই। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, মিস্টার উবোন। আপনি রত্ন কিনতে এসেছেন, কাঁচ নয়।'

পাঁচ মিনিট লাগল দরাদরি শেষ হতে। দু'জনই রাজি হলো দেড় লাখ ডলারে। নিজের দিকে বাক্স টেনে নিয়ে বলল দায়না, 'আপনার বাম তালু উঁচু করে ধরুন।'

তাই করল মিস্টার উবোন। বুঝতে পারছে কী করা হবে। টেবিল ঘুরে পাশে থামল এক ক্যামবোডিয়ান মহিলা, তার হাতটা নিয়ে গভীর মনোযোগে দেখল। তারপর দায়নার দিকে ঘুরে আস্তে করে মাথা দোলাল। টেবিলের মাঝে রত্নের বাক্স ঠেলে দিল দায়না।

পরীক্ষায় পাশ করেছে মিস্টার উবোন, উঠে দাঁড়িয়ে কোটের

কোমরের কাছ থেকে বের করল চামড়ার মানি বেল্ট। ওটার ভেতর থেকে এক হাজার ডলারের একটা নোট বাড়িয়ে দিল দায়নার দিকে।

ওটা নিয়ে আলোয় ধরল দায়না। কয়েক সেকেণ্ড পর আস্তে করে মাথা দোলাল।

আরও এক লাখ উনপঞ্চাশ হাজার ইউএস ডলার বের করে দায়নার হাতে দিল থাই ব্যবসায়ী। রত্নের বাক্স নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। তিন মিনিট পেরোবার আগেই কাঁচা রাস্তা ধরে থাইল্যাণ্ডের দিকে রওনা হয়ে গেল তার মার্সিডিয।

তাকে পাশ কাটিয়ে বাংলো-বাড়ির সামনে থামল তোবড়ানো এক উইলিস জিপ। ওটা থেকে লাফিয়ে নামল মাঝবয়সী এক লোক। চোখে ভারী চশমা। পরনে ফেডেড ডেনিম। বাংলো ঘরে ঢুকল সে।

সতর্ক চোখে তাকে দেখল দুই ক্যামবোডিয়ান মহিলা, তারপর ঢিল দিল শরীরে।

ইলাস্টিক ব্যাণ্ড দিয়ে দেড় লাখ ইউএস ডলার আটকে নিচ্ছে দায়না বেলগুতাই। নতুন লোকটার উদ্দেশে আন্তরিক হাসল। 'যাক ফিরলে।'

উল্টোদিকের চেয়ারে বসে ডলারের বাণ্ডিল দেখল লোকটা। ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল, 'ভাল ব্যবসা হলো?'

হাসিটা আরও চওড়া হলো দায়না বেলগুতাইয়ের। 'না, কুয়েন। খুব খারাপ। পাথর নিয়ে গেল দেড় লাখ ডলারে। কিন্তু ওগুলোর আসল দাম দ্বিগুণ।'

'তুমি কি দানছত্র খুলে বসেছ, দায়না?'

'না। বলতে পারো ওই লোক আসলে কুমার। প্রথমবারের মত এসেছে। ব্যাংককে ফিরে দারুণ মুনাফা করবে। বুঝবে, আমাকে যতটা বুদ্ধিমতি বলা হয়, আমি মোটেই তা নই।

পরেরবার আসবে আরও টাকা নিয়ে। আবারও করবে ভাল লাভ। এভাবে তিন-চারবার চলবে। তত দিনে হয়ে উঠবে পুরো আত্মবিশ্বাসী ও লোভী। আর তখনই ওর খতনা করব।'

দাঁত বের করে হাসল কুয়েন আন টু। সত্যিই ভাল না বেসে পারে না সে এই মেয়েটাকে। নিষ্ঠুরতার শেষ নেই দায়নার।

'কী খবর আনলে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'কাজ চলছে,' বলল কুয়েন আন টু, 'গতমাসের শেষ সপ্তাহে ডগট্যাগ আর কাগজ দিয়েছি। বুড়ো তার পরপরই গেছে ইউরোপে। গত সপ্তাহে আবারও ফিরেছে স্যান ডিয়েগোতে। আমাদের লোক দেখেছে, এই মাসের চোদ্দ তারিখে বুড়োর বাড়িতে ঢুকেছে মাসুদ রানা। একঘণ্টা ছিল। আগে থেকেই বলা ছিল, আমাদের লোক কেউ তার পিছু নেয়নি।'

কাঠের চেয়ারে বসা কুয়েন আন টুর মাথার পেছনে দূরের দেয়ালে চোখ স্থির হলো দায়না বেলগুতাইয়ের। জানতে চাইল, 'ওই লোকগুলোকে বিশ্বাস করা যায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল টু। 'ওরা আমেরিকান। লোভী। কিছুই বোঝে না টাকা ছাড়া। বেশ নামকরা ওই ডিটেকটিভ এজেন্সি। মাসুদ রানার নাম উচ্চারণ না করে, দিয়েছি তার দৈহিক বর্ণনা। হার্টিগানের বাড়িতে যে গেছে, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয়নি, সে ওই হারামজাদাই।'

ডলারের বাণ্ডিল নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল দায়না বেলগুতাই। ভঙ্গিটা ক্ষিপ্র চিতার নয়, ছুটন্ত সাপের মত। ঘুমন্ত ইঁদুরের দিকে চেয়ে থাকা ক্ষুধার্ত বিড়ালের ভঙ্গিতে হাসল।

আট

জ্ঞানীরা বলেন: দুনিয়ার যে-কোনও জায়গায় নির্দিষ্ট কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে, বড়জোর দরকার তিনবার ফোন করা। এ কথাটা বিশ্বাস করে পিটার লারসেন। আপাতত তার চাই হো চি মিন সিটিতে বিশ্বাসযোগ্য কোনও ডেনিশ লোককে।

পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করার সময় সাংবাদিকদেরকে বহুবার সাহায্য করেছে, এবং সেজন্য কখনও পাল্টা কোনও উপকার চায়নি লারসেন। এখন পুলিশ বিভাগে নেই, রিসিভার তুলে ফোন দিল মর্গেনন্যাভিসেন জায়ল্যাণ্ডস্‌পোস্টেন পত্রিকার ফরেন এডিটারকে। সাধারণ কুশল শেষ হতেই পিটারকে কথা দিতে হলো, আবারও আর্থাসে গেলে কয়েক পেগ মদ ও লাঞ্চ সারবে ফরেন এডিটারের সঙ্গে।

'সাউথ-ইস্ট এশিয়ায় আপনার করেসপণ্ডেণ্ট আছে?' এবার কাজের কথায় এল লারসেন।

'দু'জন। একজন হংকঙে, অন্যজন ব্যাংককে। কাভার করে চারপাশ। ছোটাছুটির ভেতর থাকে। বলুন তো, কী ধরনের...'

'হো চি মিন সিটিতে পরিচিত কাউকে চাইছি।'

নাক টেনে তাচ্ছিল্যের আওয়াজ তুলল ফরেন এডিটার। 'এ তো কোনও ব্যাপারই নয়। আমাদের পত্রিকা ডেনিশ অন্যসব পত্রিকার চেয়ে অনেক বেশি খবর ছাপে। দুনিয়া জুড়ে আমাদের

করেসপণ্ডেন্ট আছে।'

হাসল লারসেন। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, রেগে যাওয়ার কিছু নেই। জানি সত্যিই আপনি জিনিয়াস... আমার কাজটা কি করে দিতে পারবেন?'

'আপনি কি বাসায়?'

'হ্যাঁ।'

'কাজ গুছিয়ে নিয়ে ফোন দেব।'

পিটার লারসেনের স্ত্রী লাঞ্চের জন্য স্কিপারল্যাবস্কোভ তৈরি করেছে। বাংলা ভাষায় তা হতে পারে: 'জাহাজের ক্যাপ্টেনের সবচেয়ে প্রিয় খাবার'। ওই স্টু আসলে আলু, মাংস ও সবজি দিয়ে তৈরি। সঙ্গে টপিং হিসাবে চর্বি। এ খাবার সবচেয়ে প্রিয় লারসেনের। এইমাত্র টেবিলে বসেছে গরমা-গরম খাবার নিয়ে, এমন সময় কল এল মোবাইল ফোনে।

বিড়বিড় করে কাকে যেন গালি দিল পিটার, দেখে নিল কে ফোন করেছে, তারপর রিসিভ করল কল। 'আপনি সবসময় খারাপ কোনও সময় বেছে নিয়ে ফোন দেন।'

'আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ইয়ে করার সময় ফোন দিয়ে ফেললাম?' আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল পত্রিকার ফরেন এডিটার।

'আরে না, অস্কার, তার চেয়ে অনেক ভাল কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এইমাত্র খেতে শুরু করব স্কিপারল্যাবস্কোভ!'

'আহা রে, দুঃখিত! কিন্তু যখন ফোন করেই ফেলেছি, তো কলম আর কাগজ নিন।'

'বলতে থাকুন,' প্যাড-কলম নিয়ে তৈরি হয়ে গেল পিটার লারসেন।

'ব্যাংককের বার্তাবাহকের সঙ্গে কথা বলেছি। একজনের সঙ্গে বসে ড্রিঙ্ক করে সে। আর ওই লোক কাজ করে এ. পি. ভিক্টোর অফিসে। ওটা হো চি মিন সিটিতে।'

'গুড। তারপর?'

কথা শেষ করে ফোন রেখে লাঞ্চের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পিটার লারসেন। খাবার সাবড়ে দিয়ে স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা করে চলে এল ছোট্ট স্টাডিরুমে। হিসাব কষে দেখল, কোপেনহেগেন ও দক্ষিণ-পুব এশিয়ার মাঝের সময়। এখন হো চি মিন সিটিতে শেষ বিকেল। নোট বুক থেকে ইন্টারন্যাশনাল কোড নিয়ে ফোন দিল নির্দিষ্ট মোবাইল ফোনে।

তার কণ্ট্যাক্ট বাড়িতেই ছিল। খুব খুশি হলো ডেনিশ ভাষা শুনে। পরিচয় দেয়ার পর নিজের অনুরোধ জানাল পিটার। প্রাক্তন ভিয়েতনামিয় পুলিশ কমিশনারের নাম ও কবে গুলি খেয়েছিল, তা জানিয়ে বিদায় নিয়ে ফোন রেখে দিল।

আপাতত কাজ শেষ, ওভারকোট পরে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি ছেড়ে। 'ব্র্যাণ্ডবি' আর 'ওহ্' ফুটবল ক্লাবের খেলা আজ।

নয়

'বেঁচে আছে সে।'

'কে?'

'তোমার বন্ধু কুয়েন আন টু। ডিসেম্বরের উনিশ তারিখে ভর্তি হয় হাসপাতালে। কয়েকবার গুলি করা হয়েছিল তাকে। দেরি না করে অপারেশন করা হয়। তারপর জানুয়ারির সাতাশ তারিখে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে জেলখানায়।'

নেপলসে প্রেযো ফিসো রেস্তোরাঁর মালিক ভিটেলো

রেমারিকের কিচেনে বসে আছে রানা। একহাতে ওয়াইনের গ্লাস, অন্য হাতে কানে ধরেছে মোবাইল ফোন। 'জানলে কী করে?'

কোপেনহেগেন থেকে আসা হাসির শব্দ শুনল রানা।

পিটার লারসেন বলল, 'এটা সোজা আমার জন্যে। চার্টার বিমান নিয়ে চলে গেলাম হো চি মিন সিটি, পরিচিত হলাম হাসপাতালের সুন্দরী হেড নার্সের সঙ্গে, তাকে দাওয়াত দিলাম ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে, তার সম্মানে গোটা তিনেক শ্যাম্পেনের বোতল কিনলাম, শারীরিকভাবে সন্তুষ্ট করলাম বিশাল হোটেল রুমে, তারপর হাসপাতালের রেকর্ড ঘাঁটলাম রাত জেগে; ব্যবহার করলাম সেরা ডিজিটাল ক্যামেরা, সব তথ্য জোগাড় করে আবারও... যাই হোক, রানা, সঠিক সময়ে পেয়ে যাবে আমার খরচের বিল।'

'কোনও আপত্তি নেই বিল দশ ডলারের নিচে হলে,' হাসল রানা। কয়েক সেকেণ্ড ভেবে বলল, 'এবার জানতে হবে কুয়েন আন টু ওই শহরেই আছে কি না। যদি থাকে, কী করছে সে।'

'খোঁজ-খবর শুরু করব?'

'হুঁ, কিন্তু তার আগে কয়েকটা দিন সময় দাও। লোকটা গিয়েছিল স্যান ডিয়েগোতে। হয়তো আমেরিকায় থাকে। আগে খোঁজ নেব। পরে জানাব কী করব, পিটার।' ফোন রেখে কিচেন থেকে বেরিয়ে চওড়া টেরেসে এল রানা। এই টেরেস ওর খুব প্রিয় জায়গা। একদিকে উঁচু টিলার রাজ্য, অন্যদিকে সুনীল উপসাগর। নীল সাগরে ভাসছে হরেক রঙের জাহাজ, ট্রলার, ইয়ট ও নৌকা।

সাগরের দিকে চেয়ে থাকলেও রানা এসেছে টের পেয়েছে রেমারিক। টেবিলে সামনা-সামনি চেয়ারে বসল রানা।

কয়েক মুহূর্ত অতীত স্মৃতি রোমন্থন করল রেমারিক। রানার

বহু কিছুই জানে না, ওর কাছে রানা এক রহস্যময় চরিত্র। কিন্তু না-জানা বিষয় ওকে কখনও বিরক্ত বা কৌতূহলী করে না। রানাকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া সাতজন্মের ভাগ্য, সেটা পেয়েই কৃতজ্ঞ। মনে পড়ল, অনেক দিন পর আবারও ওদের দেখা হয়েছিল জেসমিনের মৃত্যুর পর।

সেবার দু'হপ্তা এখানে ছিল রানা, বরাবরের মত শান্ত ও চুপচাপ। কিন্তু রানার নিরুপদ্রব উপস্থিতি প্রয়োজনের সময় বরাবরের মতই শক্তি জুগিয়েছে ওকে, গিঁট দিয়েছে ছিঁড়ে যাওয়া সুতোয়।

আবারও এসেছিল রানা, একেবারে বদলে যাওয়া শরীর ও চেহারা নিয়ে। তখন লুবনা আভান্তি নামের মিষ্টি এক কিশোরী মেয়ের জন্য প্রাণের তোয়াক্কাও করেনি। ওর জন্যে মস্ত একটা জোয়ার উঠেছিল ইটালি জুড়ে: মাসুদ রানা, তুমি লড়াই করো, আমরা তোমার পাশেই থাকব...

ওদের ভেতর কথা হয় না বললেই চলে। কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকল ওরা। প্রশান্ত নিস্তব্ধতা, শুধুমাত্র দীর্ঘদিনের প্রিয় দু'বন্ধুর উপস্থিতিতেই সম্ভব। যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে মুখ না খুললেও ওদের চলে।

রহস্যময় ডগট্যাগ এবং যে লোক ওটা দিয়ে গেছে স্যান ডিয়েগোতে, সেসব সম্পর্কে রেমারিককে আগেই বলেছে রানা। আরও কিছুক্ষণ পর বলল, 'কোপেনহেগেন থেকে জানাল পিটার। বেঁচে আছে কুয়েন আন টু।'

'রেঞ্জ কত ছিল?' জিজ্ঞেস করল রেমারিক।

'পনেরো ফুট।'

বন্ধুর দিকে চেয়ে ডান ভুরু উঁচু করল রেমারিক। 'পাঁচ গজ দূর থেকে মিস?'

'মিস না। মরল কি না দেখার সময় পাইনি অন্ধকারে।'

উপসাগরে তাকাল রেমারিক। জেটিতে ভিড়ছে আমেরিকান এক ফ্রেইটার। ওটার নাবিকরা রাতে মাতাল হয়ে যা খুশি করবে পতিতালয়ে। কারও কারও সমস্ত টাকা ডাকাতি হবে, আবার কেউ বাড়ি ফিরবে সংক্রামক রোগ নিয়ে। রানার দিকে তাকাল রেমারিক।

'পিটার আর ব্রিয়াঁর সঙ্গে আমি একমত। ফাঁদ পেতেছে। টোপ ওই কুয়েন আন টু। তুমি আমার এখানে থাকতে না চাইলে গোজোয় গিয়ে বিশ্রাম নাও।'

চুপ করে আছে রানা। একটু পর বলল, 'বুদ্ধির কাজ তাই। কিন্তু মন থেকে দূর করতে পারছি না ছেলেটার কথা।'

'কাজেই ভিয়েতনাম?'

'হ্যাঁ। আগে ফোন দেব সিনেটর ফ্রান্সিস জেফ্রির কাছে। উনি ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বললে জানা যাবে, ওই দেশে বাস করে কি না কুয়েন আন টু। তাই যদি হয়, তার ঠিকানা জোগাড় করে দেখা করব।'

'পিস্তল হাতে।' মাথা দোলাল রেমারিক। দুটো গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল একটা গ্লাস। বন্ধু ড্রিঙ্ক নেয়ার পর বলল, 'টুরিস্ট সিযন শেষ, বিরক্তি লাগছে। তুমি আপত্তি না তুললে হো চি মিন সিটি থেকে আমিও ঘুরে আসতে পারি।' মৃদু হাসল রেমারিক। 'আগের মতই কাটবে সময়।'

'না বোধহয়,' মাথা নাড়ল রানা, 'কঙ্গোর মত শত শত শত্রু কোথায় পাবে?'

দশ

রাগ দমিয়ে রাখতে পারছে না ডাচম্যান অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স। আফ্রিকার দেশগুলোর কয়েকটি যুদ্ধে লড়াই করেছে। প্রতিবারই পেয়েছে প্রচুর টাকা। কিন্তু এবার ঠিক করেছে, ঈশ্বর প্রাণটা রক্ষা করলে ক্যামবোডিয়া থেকে বেরিয়ে আর কোনও দিনও ঝুঁকিপূর্ণ কোনও কাজ নেবে না। এ দেশের প্রত্যন্ত সজীব অঞ্চল দারুণ সুন্দর, মানুষ গরীব হলেও ভদ্র ও রুচিশীল, কিন্তু পিত্তি জ্বালিয়ে দিচ্ছে বর্তমান চাকরিদাত্রী।

বহু আগেই ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়েছে খেমার রুয। নেতৃত্বে যারা ছিল, তাদের শেষ দুই জানোয়ার নুয়োন চি এবং খেইউ স্যাম্পানকে দু'হাজার চোদ্দ সালে শাস্তি দেয়া হয়েছে ইউএন পরিচালিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আদালতে। এই জীবনে তারা বেরোতে পারবে না কারাগার থেকে। কিন্তু একই সালে ক্যামবোডিয়ার সীমান্তবর্তী মস্ত জঙ্গলে আবারও জড় হচ্ছে খেমার রুযপন্থী সৈনিকরা। তাদের ডাকাত বললেও দোষ হবে না। বরাবরের মতই নীতিহীন। আবারও চলছে সীমান্তের কাছের গ্রামগুলোয় অসহায় বৌদ্ধধর্মী বেসামরিক মানুষের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের ভারী স্টিমরোলার। কমিউনিস্ট-ঘেঁষা গণতান্ত্রিক সরকার সেদিকে নজর দেবে, বা শত্রু ঠেকাবে, সে-ক্ষমতা তাদের নেই। নামকাওয়াস্তে দেশে রাজা থাকলেও ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে তাঁকে।

বাদামি পোশাক পরা বেঁটে খেমার রুয অফিসারের দিকে ঘুরে তাকাল অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স। 'মর্, শালা! সূর্য ডুবলে কোন্ শালা পরিষ্কার করবে মাইনফিল্ড! ওই কাজ করতে গেলে মরতে হবে!'

'প্রতিদিন ঝুঁকি নিচ্ছে আমার লোক,' জবাবে দাঁত বের করে হাসল অফিসার, 'আপনিও ঝুঁকি নেবেন। আমরা এসব ঝুঁকি নেব, কারণ একসময় আবারও হাতে আসবে এ দেশের ক্ষমতা। যুদ্ধ করে কেড়ে নেব যা আমাদের।'

মড়াখেকো এসব কুকুরের বাচ্চারাই ভেঙে দিয়েছে গোটা জাতির কোমর, ভাবল অ্যাডেলবার্ট। ফাঁকা হাসল হা-হা করে। পান্না-সবুজ ঘাসে-ঢাকা উপত্যকার ওপর চোখ। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আসলে সব যুদ্ধই বৃথা। আর তোমরা ভাবছ ফিরে পাবে ক্ষমতা? ওই স্বপ্ন দেখা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়।' বাম হাতে রেখেছে মানচিত্র। ওটার ওপর আঙুল রাখল। 'বছরের পর বছর তোমরাই পুঁতেছ ওসব মাইন। ওই উপত্যকায় আছে দু'হাজার। ঠিক গ্রিড রেফারেন্সও রাখোনি। কোনও চিহ্ন নেই, লেন নেই— আর এখন আবদার করছ, উপত্যকার মাঝ দিয়ে পাঠাবে সৈনিক ভরা কনভয়! অন্য কোনও পথে যাক তারা, নইলে চট্ করে পৌঁছে যাবে ভগবান বুদ্ধের পায়ের কাছে।'

দানবীয় ককেশিয়ানকে দেখল ক্যামবোডিয়ান অফিসার। 'আমাদের শাসনামলে এদিকের প্রতিটি উপত্যকায় রাখা হয়েছে ওই জিনিস। মানচিত্র বা গ্রিড রেফারেন্স নেই। তোমাকে দিচ্ছি আমরা প্রতিমাসে দশ হাজার ডলার। সেজন্যেই আমাদের লোককে শিখিয়ে দিচ্ছ কীভাবে সরাতে হবে মাইন।' হাতঘড়ি দেখল অফিসার। 'সূর্যাস্ত হতে এখনও ছয় ঘণ্টা বাকি। ততক্ষণে পৌঁছবে ট্রাকবহর। তার আগেই সাফ করবে উপত্যকা, ওটাই নির্দেশ।'

বিড়বিড় করে কাকে যেন গালি দিল ডাচম্যান। 'তোমার মালকিনকে জানিয়ে দাও, এত কমসময়ে এ কাজ অসম্ভব। মাত্র কয়েক মাস হলো এসেছি, আর আমিই তোমাদের একমাত্র এক্সপার্ট। তোমাদের বারোজন সৈনিককে ট্রেনিং দিয়েছি, কিন্তু তারা কিছুই শেখেনি। কথাটা তোমার মালকিনকে জানাও।'

জবাবে খেমার রুয অফিসার বলল, 'নিজেই তাঁকে বোলো। সূর্য ডোবার দু'ঘণ্টা আগে আসছেন। চান তাঁর কনভয় যাবে উপত্যকার মাঝ দিয়ে। তাই বলছি, কথা রেখে নেমে পড়ো কাজে।'

অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স মেনে চলছে ক্লাসিক ভি শেপ্‌ড্ মাইন ক্লিয়ারিং প্রোসিডিয়ার। বেশিরভাগ মাইন চাইনিজ কে৩০০০ অ্যান্টিপারসোনেল বোমা, মাঝে মাঝে রাশান ডিওএম কে২ অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইনও আছে।

তৈরি করতে হবে পঞ্চাশ গজ চওড়া লেন। দু'পাশে কাজ করছে তার দুই স্কোয়াড় লোক। একটু পর পর পুঁতে দেয়া হচ্ছে সরু কঞ্চির ডগায় ছোট সব লাল পতাকা।

দু'ঘণ্টা কাজ করার পর হঠাৎ ভুল করল দলের একজন। উড়ে গেল তার ডান পা। পরের ঘণ্টায় আবারও দুর্ঘটনা। এবারের জনের বাঁচার কোনও সুযোগই ছিল না।

সূর্য ডুবে যাওয়ার দু'ঘণ্টা বাকি, এমনসময় পরিষ্কার হলো উপত্যকার মাঝে সরু পথের অর্ধেক এলাকা। নিরাপদে পঞ্চাশ গজ দূর থেকে এহেরেন্সকে অনুসরণ করছে খেমার রুয অফিসার। গলা ফাটিয়ে বলল, 'আরও দ্রুত! রাত নামার আগেই খুলে দিতে হবে সামনের পথ!'

হাঁটু গেড়ে বসে ঘুরে তাকাল অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স, চিৎকার

করে বাপ-মা তুলে গালি দেবে, তার আগেই দেখল অফিসারের পেছনে এক সারিতে আসছে বেশ কয়েকটা ট্রাক।

সামনের ট্রাক থামতেই ক্যাবের প্যাসেঞ্জার সিট থেকে লাফিয়ে নামল দীর্ঘাঙ্গিনী এক মেয়ে, শরীর দুনিয়া-সেরা তরুণী মডেলের মতই দারুণ আকর্ষণীয়। পরনে ক্যামোফ্লেজ্‌ড্ কমব্যাট গিয়ার। হাতে একে-৪৭। কী যেন বলল অফিসারকে, তারপর হেঁটে এল এহেরেন্সের দিকে। ভাব দেখে মনে হলো, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে বিকেলে ঘুরতে।

ওই মেয়ে সম্পর্কে বহু কথা শুনেছে এহেরেন্স; কখনও দেখেনি আগে। এখন রাগে জ্বলছে মগজ, কিন্তু সামলে ফেলল নিজেকে। অন্তরের অন্তস্তলে টের পেল, ওই সুন্দরী ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক।

যেন জগৎ-বিজয়িনী, হাসিমুখে হ্যাণ্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে নিজের পরিচয় দিল মেয়েটা: 'আমি দায়না বেলগুতাই। দেখা হওয়ায় খুশি হলাম। আপনার কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত শুনেছি। প্রতিটি রিপোর্ট সাফল্যের। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন, আর সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।'

হতবাক হয়ে খেমার রুঝ অফিসারের কাজ দেখছে এহেরেন্স। তিন সারিতে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে অন্তত পঞ্চাশজন বন্দিকে। একজন থেকে আরেকজনের মাঝে দূরত্ব দু'ফুট। প্রতিটি সারির মাঝে দু'গজ জায়গা ফাঁকা। দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে প্রতিজনের কোমর। কয়েক সেকেণ্ড পর তাদেরকে সামনে বাড়তে নির্দেশ দিল গার্ডরা।

তাতে নড়ল না কেউ।

এবার পেছনের তিন বন্দির পাছায় বেয়নেটের খোঁচা দিল তিন গার্ড। তাতে আর্তচিৎকার ছাড়লেও এগোল না বন্দিরা। কিন্তু গোড়ালির কাছে মাটিতে গুলি বিঁধতেই লাফিয়ে এগোতে হলো।

বন্দিদের ভেতর তাড়াহুড়ো। সবাই বুঝে গেছে, সামনে বাড়তে হবে, এ ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর আকাশ-বাতাস ভরে উঠল বিস্ফোরণ ও মানুষের আর্তনাদে। ফাটছে একের পর এক মাইন।

এহেরেন্সের ধারণা ছিল: কঙ্গো, বিয়াফ্রা, অ্যাঙ্গোলা বা মোযামবিকের যুদ্ধের নৃশংসতা দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তার চোখ। কিন্তু এ মুহূর্তে টের পেল, আগে দেখেনি এমন ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। খেমার রুযরা যেন পণ করেছে হার মানাবে খোদ শয়তানকে।

এহেরেন্সের বাহু ধরে সামনে বাড়ল দায়না বেলগুতাই। এড়িয়ে চলেছে ক্ষত-বিক্ষত লাশ। একবার থেমে খেমার রুয অফিসারকে বলল, 'খেয়াল রাখবে, আজ রাতে যেন সুন্দরী কোনও মেয়েকে দেয়া হয় এঁকে।' ডাচম্যানের দিকে চেয়ে হাসল দায়না বেলগুতাই। 'ক্যামবোডিয়ায় প্রবচন আছে: সুন্দরী মেয়ে ভাল মলম, খুব কাজ করে শরীর ও মনকে চাঙ্গা করতে।'

এগারো

'আপনি এসেছেন হল্যাণ্ড থেকে?'

'না।'

'তা হলে ওরা আপনাকে ডাচম্যান বলে ডাকে কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স। মনে হলো হাজার কোটি বারের মত একই কথা বলছে: 'আমি এসেছি দক্ষিণ

আফ্রিকা থেকে। আমার পূর্বপুরুষরা ওখানে এসেছে হল্যাণ্ড থেকে। কী কারণে যেন আমাকে ডাচম্যান বলে ডাকে সবাই।'

চিত হয়ে শুয়ে আছে সে। চোখ রাখল সাদা নেটের মশারির ওপর। তার বাহুতে মাথা রেখে শুয়ে আছে মেয়েটা। এহেরেন্সের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে কালো এলো চুল।

ঠিকই বলে দায়না বেলগুতাই। এই মেয়ে ভাল মলমের মতই কাজ করেছে এহেরেন্সের শরীর-মনে। এমন চিকিৎসাই দরকার। নিজেকে কঠোর ও শক্ত লোক বলে মনে করে সে, একের পর এক কঠিন কাজ করেছে সারাজীবন। আক্রমণ করেছে শত্রুর ওপর। সামান্য দয়া না করেই খতম করেছে প্রতিদ্বন্দ্বীকে। ছোটবেলায় রাগবি কোচ বলেছিলেন: 'সবসময় সামনে বেড়ে হামলা করবে, দেরি করবে না।'

অন্তরে গেঁথে নিয়েছে ওই কথা। কেউ ওর ওপর হামলা করবে বলে মনে হলে, সবসময় নিজেই আগে হামলা করে। একের পর এক ঘুষি মেরে শত্রুকে মেঝেতে ফেলে দেয়ার আগে থামে না। তার আছে মানসিক কোনও সুইচ। ওটা অটো করে দিলেই হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর হিংস্র। এ কারণে বেশিরভাগ মানুষ ভয় পায় তাকে।

কিন্তু বিকেল বা সন্ধ্যায় অফ করতে পারেনি মনের সুইচ। নিজেকে মনে হয়েছে জানোয়ার। ছোট হয়ে গেছে মন। কোনও কারণ ছাড়া কাউকে খুন করে না সে, বা নিরীহ মানুষকে নির্যাতন করে না। আগেও সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারী লোকের নির্যাতন দেখেছে নির্বিকার চোখে, কিন্তু এই পরিমাণ নৃশংসতা চোখে পড়েনি। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। বাধা দিতে পারত খেমার রুয গেরিলাদেরকে, কিন্তু তা করবে কেন? নাক গলাবে কেন অন্যের ব্যাপারে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এহেরেন্স। বোধহয় নরম হয়ে যাচ্ছে সে!

আসলে বয়স! ওটাই ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে রক্ত! পাশে শুয়ে থাকা মেয়েটার কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ হয়ে উঠছে আবেগপ্রবণ, মনে অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতি। যে কখনও ভালবাসেনি নিজের মাকে, সবসময় ভেবেছে মেয়েদেরকে ভোগ্য-পণ্য, আজ সেই ওরই মনে হলো— উচিত ছিল প্রতিবাদ করা।

এখানে আসার পর থেকে এই মেয়ের কাছে ঘন ঘন এসেছে সে। আজ এহেরেন্স জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'কনি, তোমার পুরো নাম কী?'

'কনি টুরেন,' বলল মেয়েটা।

'ভিয়েতনামিয?'

'হ্যাঁ।'

নরম সুরে বলল মেয়েটা, 'আমার পরিবার এখানে এসেছে এক শ' বছরেরও বেশি আগে। আমাদের নিজেদের জমি ছিল। তারপর খেমার রুযরা এসে মেরে ফেলল সব পুরুষ, ছেলে বাচ্চা আর বুড়ি মহিলাদেরকে। শুধু বাঁচিয়ে রাখল তরুণী ও কমবয়সী মেয়েদেরকে। ক্রীতদাসের মত প্রচণ্ড পরিশ্রম করাল আমাদেরকে। সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে তুলল পতিতালয়ে।' কাত হয়ে এহেরেন্সের দিকে ফিরল কনি। 'আমরা আসলে সবাই ক্রীতদাসী। যদিও কিনে না নিয়ে দখল করে নেয়া হয়েছে গায়ের জোরে।'

'কখনও পালাতে চাওনি?'

'চেষ্টা করেছিল আমার এক বান্ধবী। ওকে কী করেছিল তা বলব না, কিন্তু সতর্ক হয়ে গেলাম আমরা। এরপর ভাবিওনি পালাব কেউ।'

নীরবে কাটতে লাগল সময়। মশারির জালের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে এহেরেন্স। ঘরে আসবাবপত্র নেই বললেই চলে।

কিছুক্ষণ পর বলল মেয়েটা, 'শুনেছি মাইন সরান আপনি।'

'হ্যাঁ, ওই কাজই করি।'

'কিন্তু ওটা তো খুব বিপজ্জনক কাজ।'

'তবে টাকাও অনেক।'

কথা শুনে অবাক হয়ে এহেরেন্সের দিকে তাকাল কনি। 'ওরা আপনাকে পয়সা দেয়?'

শুকনো হাসল এহেরেন্স। 'অবশ্যই। নইলে জীবনের ঝুঁকি নেব কেন?' মেয়েটার চোখে বিস্ময় দেখছে। 'এতে অবাক হওয়ার কী আছে?' জানতে চাইল।

'না... ওরা তো আর কাউকে পয়সা দেয় না।'

'আর কেউ মানে... কারা?'

'আমেরিকান তারা।'

এবার বিস্মিত হলো এহেরেন্স। 'আমেরিকান?'

'হ্যাঁ। তিনজন ছিল। আমি ভাবতাম তারাও আমাদের মতই বন্দি।'

'ওরা এল কোথা থেকে?' কৌতূহলী হয়ে উঠেছে এহেরেন্স।

'জঙ্গলে খেমার রুয সৈনিক বা তাদের মিত্ররা ধরে এনেছে। আগে যে বড় যুদ্ধ হয়েছিল, তার বন্দি নয় ওরা। হয়তো ড্রাগ লর্ডদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে ধরা পড়েছে।'

কনুইয়ের ওপর ভর করে উঠে বসল এহেরেন্স, চোখ রাখল চাঁদের মত গোল মুখে। 'তাদেরকে কোথায় রেখেছে?'

'মাইনফিল্ড পরিষ্কার করতে গিয়ে মারা গেছে দু'জন। আর শেষজনকে আটকে রেখেছে বেশ কিছু দিন ধরে।'

'তাদের সঙ্গে কখনও দেখা বা কথা হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ। সবসময় হাসিখুশি থাকত। শেষদিকে গরুর মত বেঁধে রাখত তাদেরকে। জানি না, কেন এখনও শেষজনকে মেরে ফেলেনি।'

আবারও চিত হয়ে শুয়ে পড়ল এহেরেন্স। তখনই কানে এল শিশুর কান্নার আওয়াজ।

কনি বলল, 'দয়া করে বিরক্ত হবেন না।' মশারির কিনারা সরিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

এহেরেন্স দেখল কাঠের মেঝেতে নিঃশব্দে হেঁটে পাশের ঘরে গেল মেয়েটা। জ্বলে উঠল হলদে বাতি। সরু বিছানায় শুয়ে আছে বাচ্চাটা, কাঁদছে। ওর ওপর ঝুঁকে ফিসফিস করে কী যেন বলতে লাগল কনি টুরেন। বাচ্চার বুকে হাত দিয়ে আলতো করে চাপড় দিচ্ছে। বন্ধ হয়ে গেল কান্না। দশ মিনিট পর আবার এদিকের ঘরে ফিরল কনি। হাতে গরম পানি দিয়ে ভেজানো তোয়ালে। এহেরেন্সের পাশে বসে খুব সাবধানে তার শরীর মুছিয়ে দিতে লাগল।

'তোমার বাচ্চা?' জানতে চাইল এহেরেন্স।

'হ্যাঁ। আমার ছেলে।'

'বয়স কত ওর?'

'আগামী মাসে তিন বছর হবে। ওরা যখন বুঝল পাঁচ মাসের পোয়াতি আমি, খুব রেগে গেল। তার আগে গোপন করতে পেরেছি সব। যাই হোক, ওরা বাচ্চাটাকে রাখতে দিয়েছে। ও ছাড়া তো আমার কিছুই নেই।' চুপচাপ এহেরেন্সের মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে সে। সাবধানে চোখের কোণ পরিষ্কার করতে করতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কত দিন ধরে যোদ্ধা?'

'বহু বছর ধরে। পঁচিশ বছর তো হবেই। তবে এটাই আমার শেষ কাজ। এরপর ট্র্যান্সভিলে ফিরে গরুর খামার কিনে থিতু হয়ে বসব।'

'অনেক দেশে গিয়ে যুদ্ধ করেছেন, না?'

'হ্যাঁ। অনেক দেশে।'

'তখন মাসুদ রানা নামের কারও সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল?'

মেয়েটা টের পেল, আড়ষ্ট হয়ে গেছে মানুষটার দেহ। ঝটকা দিয়ে ওর হাত থেকে সরিয়ে দিল তোয়ালে। বালিশ থেকে মাথা

তুলে খপ্ করে ধরল ডান কবজি। এতই জোরে, ব্যথা পেয়ে চমকে গেল কনি টুরেন।

'কী বললে? কার নাম বললে?'

'শুধু জিজ্ঞেস করেছি আপনি মাসুদ রানা নামের কাউকে চেনেন কি না। আপনার মতই যোদ্ধা সে।'

সিরিষ কাগজের মত শুকনো কণ্ঠে বলল এহেরেন্স, 'তুমি চেনো ওকে?'

'না, তবে কমবয়সী আমেরিকানের মুখে শুনেছি তার নাম।'

শিথিল হলো এহেরেন্সের দেহ। আবারও বালিশে মাথা রেখে ছেড়ে দিল কনির কবজি।

অবাক চোখে ওকে দেখছে মেয়েটা। গত কয়েক মাস ধরে আসছে মানুষটা, চুপচাপ চাহিদা মিটিয়ে চলে যায়। ওদের ভেতর তেমন কোনও কথাও হয় না। কিন্তু আজ যেন লোকটা আছে বহু দূরে কোথাও।

আস্তে করে জিজ্ঞেস করল কনি, 'আপনি তাকে চেনেন?'

'হ্যাঁ, চিনি।'

'সে কি বেঁচে আছে?'

'জানি না।'

এহেরেন্সের বুকে হালকা চাপড় দিচ্ছে কনি, মনে হলো শান্ত করবে অস্থির বাচ্চাকে। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লোক সে?'

কনির হাত সরিয়ে দিয়ে চাপা স্বরে বলল এহেরেন্স, 'সে স্বয়ং মৃত্যুদূত।'

বারো

ভিয়েতনামকে ঘৃণা করে মারিয়া ওয়াকার। এমনই এক দেশ, এখানে এলেই বুকে বেঁধে দুঃখের কাঁটা। তবুও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া মথের মতই বারবার ফিরে এসেছে সে এই পোড়া দেশে।

ট্যান সন নাট এয়ারপোর্টের রানওয়ের দিকে নাক তাক করেছে ব্যাংকক থেকে আসা থাই এয়ারওয়ের বিমান। আইবিএম প্যাড বন্ধ করে সিটের তলা থেকে ব্রিফকেস নিয়ে তার ভেতর জিনিসটা রেখে দিল মারিয়া। দু'দিন আগে কমপিউটারে লোড করেছে যে রিপোর্ট, একটু আগে আবারও পড়েছে, চিন্তিত।

এফবিআই থেকে জানানো হয়েছে, নানান বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছে ডেইন ডিটেকটিভ পিটার লারসেন। কাজ করছে সে বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানার হয়ে। তাতে সতর্ক হননি ওর বস, কর্নেল জেফ গর্ডন। নিজেও চিন্তিত ছিল না মারিয়া। কিন্তু রিপোর্টের শেষাংশে এসে মনে বাজল বিপদ-ঘণ্টি। মাসুদ রানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে সিনেটর ফ্রান্সিস জেফ্রির। তিনি ক্ষমতাশালী রাজনীতিক। আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হবেন প্রেসিডেন্ট পদে।

যেদিন রিপোর্ট পেল মারিয়া, তার পরদিন সকালে বসের ঘরে হাজির ছিল। একটু পর এল সিনেটরের ফোন।

একবার মারিয়াকে দেখে নিয়ে কনফারেন্স স্পিকার চালু করে ফোন কানে তুললেন কর্নেল।

এতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতা

ও যথেষ্ট সিনিয়র আর্মি অফিসারের ভেতর এভাবেই কথা চলে।

ভদ্রতা বজায় রেখে আলাপ করেছেন সিনেটর। প্রশংসা করলেন, নানা বাধা সত্ত্বেও ভালভাবে অফিস চালাচ্ছেন কর্নেল। মিসিং-ইন-অ্যাকশন বিষয়ে মিনিট তিনেক কথা শেষ করে এলেন মূল বক্তব্যে। সহজ সুরে বললেন, 'গত পরশু দিন আপনার অফিসে অনুরোধ নিয়ে গিয়েছিল পিটার লারসেন নামের এক ডেনিশ ডিটেকটিভ।'

'জী, স্যর।'

'আপনি তার আবেদন ফিরিয়ে দেননি, যতটা জানি।'

'জী। ওটা এখনও আমার ডেস্কেই আছে।'

'গতকাল এফবিআই-এর কাছে জানতে চেয়েছেন তার সম্পর্কে। ...কেন?'

'নিয়ম তাই, স্যর; গত পরশু দিন সঙ্গে করে আরেকজনকে এনেছিল আমার অফিসে। গোয়েন্দা তারা। বিশেষ করে কাজ করে হারিয়ে যাওয়া মানুষের বিষয়ে। দু'জনই অত্যন্ত ভদ্র। আমাদের নিজেদের কাজের সঙ্গে মেলেও তাদের কাজ।'

'আপনার কাছে কী জানতে চেয়েছে ওরা, কর্নেল?' প্রশ্ন করলেন সিনেটর ফ্রান্সিস জেফ্রি।

'তাদের কাছে ছিল এমআইএ ডগট্যাগ। হারিয়ে যাওয়া এক সৈনিকের বাবা-মা'র কাছে পৌঁছে দেয়া হয় ওটা স্যান ডিয়েগো শহরে। ওই সৈনিকের ফাইল বের করেছি আমরা। বুঝতেই পারছেন, সিনেটর, আইন ভেঙে লারসেনকে পড়তে দিয়েছি আমাদের ফাইল।'

স্পিকারে সিনেটরের হাসি শুনল মারিয়া।

ভদ্রলোক বললেন, 'আসলে কিছু আইন করাই হয় শুধু ভাঙার জন্যে, কর্নেল। আপনি সাহায্য করতে পেরেছেন লারসেনকে?'

'না, স্যর। ফাইল পড়তে দেয়া ছাড়া আর কোনও তথ্য দিতে

পারিনি। অবশ্য বলেছি, যেন যোগাযোগ রাখে, সাধ্যমত চেষ্টা করব সাহায্য করতে।'

নীরব হয়ে গেল ফোন। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন সিনেটর, 'এফবিআই রিপোর্টের কোড কত ছিল?'

কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে দরকারী তথ্য পেয়ে জোরে জোরে বললেন কর্নেল, 'সিএন/সি/৩০৩০৮২এ।'

আবারও নীরব হয়ে গেল ফোন। মারিয়ার মনে হলো, ওদিকে ফাইল ঘাঁটছেন সিনেটর। বিশ সেকেণ্ড পর বললেন, 'ওই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে এক লোকের ওপর। নাম মাসুদ রানা।'

'জী, স্যর।'

'ওই রিপোর্টের তথ্য ছাড়া আর কিছু জানেন মাসুদ রানা সম্বন্ধে?'

'না, স্যর। বিস্তারিত আর কিছুই জানা নেই।'

একটু পাল্টে গেল সিনেটরের কণ্ঠ: 'কর্নেল, আমি আপনার সঙ্গে গোপনে আলাপ করতে চাই। তা সম্ভব?'

চট্ করে মারিয়াকে দেখলেন কর্নেল। পরামর্শ চাইছেন। কাঁধ ঝাঁকাল মারিয়া, রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে। হোল্ড বাটন টিপে বললেন কর্নেল, 'মারিয়া, এখানেই থাকো। বুঝতেই পারছ, বড় কোনও সিনেটর গোপনে আলাপ করতে চাইলে আমার মত আর্মি অফিসারের উচিত সামনে সাক্ষী রাখা। আমাকেও তো বাঁচতে হবে।'

ষড়যন্ত্র করছে এমন চেহারা করে আবারও এসে সিটে বসেছে মারিয়া। লাইন চালু করে কর্নেল বললেন, 'অবশ্যই, সিনেটর। সামনা-সামনি আলাপ করতে পারি আমরা।'

'গুড। এমন কিছু জানতে চাইব না, যার কারণে আপনার সমস্যা হবে। এটাকে সাধারণ অনুরোধ বলতে পারেন। আপনার বা আপনার অফিসের সঙ্গে মাসুদ রানা বা পিটার লারসেনের

যোগাযোগ হলে, তা দয়া করে আমাকে জানাবেন। আরেকটা কথা, ওই বিষয়ে কোনও সাহায্য লাগলে জানাতে দেরি করবেন না।'

মারিয়াকে দেখে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন কর্নেল। কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে যাওয়ার পর বললেন, 'খুশি মনে, সিনেটর। আমি নিজেও কৌতূহলী, স্যর। আপনি কি বলবেন কেন আগ্রহী হয়েছেন?'

সিনেটর বললেন, 'আগামী সপ্তাহে আসছি ওয়াশিংটনে। তখন না হয় দু'জন লাঞ্চে বসব দ্য রেড সেজ-এ?'

বিস্ময়ের কারণে কপালে উঠল কর্নেলের দু' ভুরু। মারিয়াও অবাক হয়েছে। এ খুব অস্বাভাবিক যে এত সিনিয়র কোনও সিনেটর আমন্ত্রণ দেবেন এক কর্নেলকে শহরের সেরা রেস্তোরাঁয়।

'খুব খুশি হব দেখা হলে, স্যর,' বললেন কর্নেল গর্ডন।

'গুড। তা হলে আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করে নেবে আমার সেক্রেটারি। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

লাইন কেটে যেতে চুপ করে চেয়ারে বসে থাকলেন কর্নেল। কিছুক্ষণ পর ছাত থেকে চোখ নামিয়ে দেখলেন মারিয়াকে। 'আসলে হচ্ছেটা কী?'

'স্যর, আপনি বোধহয় জীবনের সেরা লাঞ্চ খাবেন।'

হঠাৎ একটা চিন্তা আসতেই বললেন কর্নেল, 'আমি কি ইউনিফর্ম পরব, নাকি স্যুট-টাই?'

'তাঁর সেক্রেটারি ফোন করলে জেনে নেবেন। আমি হলে চকচকে করে নিতাম জুতোজোড়া।'

আবার চিন্তার ভেতর ডুবে গেলেন কর্নেল গর্ডন। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'ভালভাবে চিন্তা করো, মারিয়া। কী ঘটল যে আমার মত সামান্য এক কর্নেলের সঙ্গে আলাপ করতে চান এমন দাপুটে এক সিনেটর?'

'জানি না, স্যর। তবে মনে হচ্ছে, ডেইন গোয়েন্দা নয়, মাসুদ রানার সঙ্গে জড়িত কিছু।' উঠে দাঁড়াল মারিয়া। 'একটা কথা স্পষ্ট: পুরো তৈরি হয়ে যেতে হবে আপনাকে লাঞ্চে। মাসুদ রানা সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করুন। নইলে বোকা বনতে হবে।'

'ঠিক! কিন্তু এফবিআই-এর কাছে জানতে চাইলেই ওরা জানিয়ে দেবে সিনেটরকে। অন্য কোনও পথ খুঁজতে হবে।'

মাথা দোলাল মারিয়া। 'সিনেটরকে না জানিয়ে জোগাড় করতে হবে তথ্য।'

'তা করব কী করে?'

'স্যর, রুটিন ইনকোয়ারি করুন প্যারিসের ইন্টারপোলের মাধ্যমে।'

'ইন্টারপোল? কিন্তু ওই লোক তো বাংলাদেশের সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, ক্রিমিনাল নয়।'

'তা ঠিক। কিন্তু কোথায় যেন পড়েছি, গত কয়েক দশক ধরে মার্সেনারি আর গুপ্তচরদের নাম ও কীর্তি তাদের ফাইলে টুকে রাখছে ইন্টারপোল। তাদের কাছে তথ্য চাইতে পারেন। খোঁজ নেয়া অস্বাভাবিক নয়। মনে করি না প্যারিসের ইন্টারপোলের মাধ্যমে খবর নিলে টের পাবেন সিনেটর।'

রানওয়েতে নেমে আসতেই ক্রিচ-ক্রিচ শব্দ তুলল বিমানের চাকা। চোখ বুজে ফেলেছে মারিয়া ওয়াকার। বিমানে করে আকাশে ওঠা ও মাটিতে নামার সময় সবসময় অস্বস্তির ভেতর পড়ে। ওর পাশের সিট থেকে বলল জড়ানো এক পুরুষকণ্ঠ: 'আপনার মনের কথা বুঝতে পারছি, ম্যাম। আজও বুঝতে পারি না, কী জন্যে মাটি থেকে ওপরে ওঠে এসব নরকী যন্ত্র।'

চোখ মেলে মাথা কাত করে দেখল মারিয়া। আগেও কথা হয়েছে ওই লোকের সঙ্গে। টেক্সাসের তেল কুবের। পায়ে ভারী বুট, কোমরের বেল্টে বিরাট এক বাকল। হাসিখুশি মানুষ। হাত

বাড়িয়ে রেখেছে সহায়তা দেয়ার জন্য।

বিমান থেমে যেতেই মারিয়াকে সিট ছেড়ে উঠতে সাহায্য করল সে। আরেক হাতে ম্যামের ব্যাগ। আমন্ত্রণ জানাল, ইচ্ছে হলে শহর পর্যন্ত তার ট্যাক্সিতে করে যেতে পারে মারিয়া।

বাড়তি আলাপ বা ডিনারের প্রস্তাব আসার আগেই ভদ্রতার সঙ্গে মানা করে দিল মারিয়া। ট্যাক্সি নিয়ে শহরের দিকে যাওয়ার পথে দেখল, সড়কে অনেক যানবাহন। আসলে আগের মত স্থবির নেই কিছু, আধুনিক জগতের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ভিয়েতনামিরাও। ফুটপাথে ফুটপাথে ছোট সব দোকান ও ফেরিওয়ালা। সাঁই-সাঁই করে নানান দিকে ছুটছে হোণ্ডা মোপেড। পুঁজিবাদ এসে বদলে দিচ্ছে এই দেশকে। আবারও ওয়াশিংটন ও কর্নেল জেফ গর্ডনের কথা মনে পড়ল ওর।

অনুরোধ জানানোর একঘণ্টা পর ইন্টারপোল থেকে এল রিপোর্ট। অফিসে ছিল, এমনসময় টিং শব্দ তুলল কমপিউটার। ই-মেইল এসেছে বুঝে মেইল বক্স খুলে পড়ল ইন্টারপোলের দশ পাতার রিপোর্ট। ওই ডোশিয়ে হতবাক করে দিল ওকে। বুঝল, মাসুদ রানা যে শুধু পৃথিবীর সেরা গুপ্তচর, তা নয়, আসলে গুণের শেষ নেই তার! দুর্ধর্ষ অভিযাত্রী, নামকরা আর্কিওলজিস্ট, নিজের রয়েছে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন সংস্থা, মস্ত বড় এক জাহাজ কোম্পানির এম.ডি., নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর... আরও কত কিছুর সঙ্গে যে জড়িত, ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে ওঠে। নিজের কমপিউটার থেকে কর্নেলের কমপিউটারে পাঠিয়ে দিল ইন্টারপোলের রিপোর্ট। নিজেও ছুটল বসের অফিসে।

মাসুদ রানার ওপর লেখাটা পড়া শেষ হলে মারিয়ার দিকে তাকালেন কর্নেল গর্ডন। 'পড়ে দেখেছ?'

'জী, স্যর। সরি, আগেই আপনার কাছে আনা উচিত ছিল। কিন্তু পড়তে গিয়ে আর থামতে পারিনি। ওই লোক কি দেবতা, না

কোনও রোবট? বোধহয় থামতে জানে না কোথাও। ঘুমও দরকার নেই তার।'

আরেকবার রিপোর্ট দেখে নিয়ে টেবিলে টোকা দিতে লাগলেন কর্নেল। 'সিনেটরের সঙ্গে তার কানেকশন কোথায় তা বুঝলে?'

'জী। সিনেটরের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলেকে কিডন্যাপারের হাত থেকে উদ্ধার করে আনেন মাসুদ রানা।'

'আরও বহু কিছুর সঙ্গে জড়িত ওই লোক।' গম্ভীর হয়ে গেল কর্নেল গর্ডনের চেহারা।

মাথা দোলাল মারিয়া। 'এমন কী মার্সেনারি হিসেবেও কাজ করেছেন। সিআইএ আর স্পেশাল ফোর্সের সঙ্গে গিয়েছিলেন ভিয়েতনামে। তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে ওই ডগট্যাগের।'

'ডগট্যাগ?' ভুরু কুঁচকে মারিয়াকে দেখলেন কর্নেল।

'জী, ওটার কারণেই জড়িয়ে গেছেন সিনেটর। সম্ভবত জর্জ হার্টিগানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন মাসুদ রানা। এখন খুঁজে বের করতে চাইছেন ওই সৈনিককে।'

'আমাদেরও পিছু নেয়া উচিত,' বললেন গর্ডন, 'খোঁজ নাও জর্জ হার্টিগান কোন্ সব ইউনিটের সঙ্গে ছিল। মাসুদ রানার সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন ছিল, তা জানব না রেকর্ড ঘাঁটলে। কিন্তু প্রয়োজনে তথ্য জোগাড় করব আন-অফিশিয়াল সোর্স থেকে।' মৃদু হাসলেন তিনি। 'সিনেটর জেফ্রি একমাত্র লোক নন, যাঁর নানান দিকে কানেকশন আছে।'

ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে থামল ট্যাক্সি।

যখনই হো চি মিন সিটিতে আসে মারিয়া, সবসময় স্থির করে উঠবে আধুনিক কোনও হোটেলে, কিন্তু শেষসময়ে বারবার মত পাল্টে ফেলে। আবারও ওঠে এই ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলেই। ওর বাবা সবসময় এখানেই উঠতেন। পছন্দ করতেন বিখ্যাত বারান্দা ও কলোনিয়াল পরিবেশের বার। এই হোটেলের দরজা

দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় তিক্ত আবার মধুর অনুভূতিও জাগে মারিয়ার বুকে। এখানেই বিয়ে হয়েছিল ওর বাবা-মা'র। বিচ্ছেদও এখানেই। নয় বছরের বাচ্চা মারিয়াকে ফেলে ফিরে গিয়েছিল মা আমেরিকায় প্রাক্তন প্রেমিকের টানে। আর এরপর বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বাবা। যেন লুকিয়ে পড়লেন সবার কাছ থেকে। আর তারপর তো একদিন হারিয়েই গেলেন এক সিআইএ এজেন্টসহ গভীর জঙ্গলে। অনেক খুঁজেও আর পাওয়া গেল না তাঁদেরকে।

মিলিটারি অফিসে চাকরি নেয়ার পর প্রথমেই আবারও এই শহরে এসেছিল মারিয়া। তখনও এই হোটেলেই উঠেছে।

মস্তবড় বাথরুমে তামার পুরনো শাওয়ারহেডের নিচে চুল ভেজাতে ভেজাতে নানান চিন্তা এল মারিয়ার মনে। শ্যাম্পু করার পর সারাগায়ে ডলল সুগন্ধী সাবান, ভাবতে লাগল ওর বসের কথা।

কর্নেল জেফ গর্ডন দ্য রেড সেজ রেস্তোরাঁ থেকে ওই লাঞ্চ করে অফিসে ফিরেই এসে ঢুকেছিলেন ওর অফিসে। প্রথম দশ মিনিট ছিল ওই রেস্তোরাঁ, তার পরিবেশ, খাবার ও কারা যান তার বর্ণনা। টেবিলে বসে তাঁর উত্তেজনা কমলে দেখেন বয়স্ক এক অভিনেতার সঙ্গে লাঞ্চ করছেন ভাইস প্রেসিডেন্টের স্ত্রী। একটু দূরের টেবিলে অ্যাটর্নি জেনারেল ও ক'জন সিনেটর। তাঁরা যে গল্প করছিলেন না, তা বোঝা গেছে।

লাঞ্চে সাধারণ গ্রিল করা স্টেক চাইলেন সিনেটর জেফ্রি, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন না কর্নেল গর্ডন। প্রথমেই নিলেন ওয়াইল্ড স্যামন মুস আর ডাক এ ল'অরেঞ্জ। অপূর্ব স্বাদ চাখলেন তারিয়ে তারিয়ে। প্রথমে খুব সতর্ক ছিলেন সিনেটর, মেপে নিয়েছেন কর্নেলকে, তারপর মেইন কোর্স শুরু হওয়ার পর মুখ খুললেন ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে। স্বাভাবিকভাবেই এল মাসুদ

রানার কথা। কর্নেল বুঝে গেলেন, ওই বাঙালি গুপ্তচরকে অত্যন্ত পছন্দ করেন সিনেটর। আগেও পরস্পরের সাহায্যে এসেছে সিনেটর ও মাসুদ রানা।

মারিয়ার ছোট্ট অফিসে পায়চারি করতে করতে ঠোঁটে কফির মগ তুললেন কর্নেল গর্ডন, হঠাৎ থমকে দেখলেন জুনিয়র অফিসারকে। মাথা দুলিয়ে বললেন, 'বুঝতে দেরি হয়নি আমার, মাসুদ রানার যে-কোনও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন সিনেটর। আর এ কারণেই একটা কথা ভাবছি। সিনেটরকে বলেছি, হো চি মিন সিটিতে আমাদের অফিসে তুমি থাকবে। মাসুদ রানার কিছু লাগলে তা জোগাড় করে দেবে। তুমি হবে তার ব্যাকআপ অফিসার। যখন তখন যেন যোগাযোগ করতে পারে আমাদের সাথে।'

চমকে গেছে মারিয়া। আগামী কয়েক মাসের ভেতর আমেরিকা ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা ছিল না ওর।

'আগামীকাল রওনা হচ্ছ তুমি,' বললেন কর্নেল। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, সামনের ওই মিশন খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। মনে করি না দুনিয়ার একমাথা থেকে আরেক মাথায় বুনো হাঁসের পেছনে ছুটছে মাসুদ রানা।'

শাওয়ার বন্ধ করে শুকনো তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে নিল মারিয়া, ওটা গায়ে জড়িয়ে এসে ঢুকল বেডরুমে। কর্নেল গর্ডনের আচরণ রহস্যময় মনে হয়েছে ওর। হুড়োহুড়ি করে কিছু করার লোক নন তিনি, ট্রেইণ্ড যৌক্তিক মগজ আছে তাঁর। নিজের কাজে দক্ষ। কখনও বাজেটের বেশি খরচ করেন না। কোনও কারণ ছাড়াই ওকে পাঠাননি ভিয়েতনামে।

আবারও পায়চারি করতে করতে বলেছিলেন, 'যোগাযোগ করেছি আমার সোর্সের সঙ্গে। চার বছর আগে ক্যামবোডিয়া সীমান্তের জঙ্গলে গোলাগুলির সময় হারিয়ে গেছে জর্জ হার্টিগান।

স্পেশাল ফোর্সের মিশন ছিল ওটা। তাদের সঙ্গে ছিল সিআইএ এবং কয়েকটি দেশের সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা। উল্লেখ করা হয়নি তাদের কারও নাম। কিন্তু ওই মিশনের এক মেজরকে খুঁজে বের করেছি। এখন সে পূর্ণ কর্নেল। ভালভাবেই মনে আছে ওই মিশনের কথা। ফ্রেঞ্চও বলতেই পারত না তার ক্যাপ্টেন। কিন্তু তা পারত বাংলাদেশি সিক্রেট এজেন্ট। যে বর্ণনা দিয়েছে ওই লোকের, তা মিলে যায় মাসুদ রানার সঙ্গে। কর্নেল বলেছে, সেসময় একেবারে তরুণ ছিল জর্জ হার্টিগান। গোলাগুলির সময় বলতে গেলে লুকিয়ে থাকত মাসুদ রানার আড়ালে।'

কফিতে চুমুক দিয়ে এরপর আনমনে বললেন গর্ডন, 'ঘটনা যাই হোক, এভাবে সাজাই: কয়েক দিন আগে রহস্যজনকভাবে জর্জ হার্টিগানের বাবা-মা'র কাছে স্যান ডিয়েগোয় পৌঁছে দেয়া হয়েছে তাঁদের ছেলের ডগট্যাগ। তার আগে পর্যন্ত কোনও তথ্য আমাদের কাছে ছিল না। হতে পারে, তরুণ হার্টিগান তার চিঠিতে মাসুদ রানার নাম উল্লেখ করেছিল। আর সেকারণে ক'দিন আগে তাকে খুঁজে বের করেছেন জর্জের বাবা। অনুরোধ করেছেন, ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে। আর তাতে রাজিও হয়েছে মাসুদ রানা। সে হয়তো পারবে এ কাজ, কিন্তু ইউএস মিলিটারি থেকে অফিশিয়ালি আমরা বের করতে পারব না ছেলেটার খোঁজ। তাতে হাজারটা সমস্যা। মাসুদ রানা হয়তো হারিয়ে যাওয়া বাকি তিন সৈনিককেও খুঁজে বের করবে।'

আবারও কফিতে চুমুক দিয়ে মারিয়াকে দেখলেন তিনি। 'তাই চাই তুমি থাকবে ওখানে। খোলা রাখবে চোখ-কান। মাসুদ রানা যোগাযোগ করলে, সহায়তা দেবে সব ধরনের।'

সবুজ লেবু রঙের লিনেন ড্রেস পরল মারিয়া, মুখে সামান্য মেকআপ নিয়ে ভাবল, ডিনারের আগে বার-এ গিয়ে নেবে ককটেল দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচতলায়।

মস্তবড় ঘরটা ঐতিহাসিক আর দেখার মতই আকর্ষণীয়। দরজায় থেমে চারপাশে চোখ রেখে ভাবল, আবারও ফিরবে ঘরে। বার-এ একদল পুরুষ, কোনও মেয়ে নেই। বেশিরভাগ কাস্টোমার বিদেশি, এ দেশে এসেছে ব্যবসার জন্যে অথবা সংবাদ সংগ্রহের আশায়।

ঘর ভরে আছে সিগারেটের ধূসর ধোঁয়ায়। বিরক্ত হয়ে মারিয়া ঠিক করল, গিয়ে বসবে বারান্দায়। ওখান থেকে অর্ডার দেবে ড্রিঙ্কের। ঘুরে রওনা হয়ে গেল, কিন্তু তখনই পেছন থেকে ডাকল এক লোক: 'মিস ওয়াকার?'

আবারও ঘুরল মারিয়া।

একটু দূরের টেবিল দখল করে বসে আছে দু'জন লোক। তারা গোয়েন্দা পিটার লারসেন ও পেঁচা ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স।

তেরো

রাত দশটা, স্যান ডিয়েগোয় হার্টিগানদের বাড়িতে বেজে উঠল ল্যাণ্ড ফোন। টেলিভিশনে স্টার ট্রেক দেখছিলেন বয়স্ক দম্পতি। ভলিউম কমিয়ে দিলেন মিসেস হার্টিগান। ফোন ধরলেন তাঁর স্বামী। ছায়াছবি দেখছেন তাঁর স্ত্রী, তবে কান খাড়া।

তিন মিনিট চুপচাপ শুনলেন তাঁর স্বামী, তারপর বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, আপনার মঙ্গল হোক।' ফোন রেখে ফিরলেন স্ত্রীর দিকে। 'মাসুদ রানা। কথা বললেন ইতালি থেকে। আগামীকাল পৌঁছে যাবেন ভিয়েতনামে। খবরটা জানাবার জন্যে যোগাযোগ

করেছিলেন। বললেন, জর্জ বেঁচে আছে তার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। যেন বড় বেশি আশা না করি। আগামী দু'সপ্তাহ জর্জকে খুঁজবেন। কিছু জানা গেলে দেরি না করে ফোন করবেন।'

আবারও টিভির দিকে ফিরলেন মিসেস হার্টিগান। বাড়িয়ে দিলেন ভলিউম। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'সবচেয়ে বড় কথা: আমাদের সাধ্যমত সবই করলাম। মিস্টার রানা ওকে খুঁজে না পেলে, বা জানতে না পারলে ওর কী হয়েছে, তো ধরে নেব, চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে আমাদের ছেলে।' ম্লান হাসলেন। 'আগামী দু'সপ্তাহ পর, যা-ই ঘটুক, আগের চেয়ে ভালভাবে ঘুমাতে পারব।'

চোদ্দ

নামকরা এক রেস্তোরাঁয় ডিনার এবং তারপর ড্রিঙ্কের সময় একদম চুপ থাকল ফ্রেঞ্চ মস্তান ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স। মারিয়ার মনে হলো, ওর ওজন মাপতে ব্যস্ত ডেইন লোকটা। তাতে বিরক্ত হলো না। আসলে এত সুন্দর করে নিজের কথা উপস্থাপন করছে সে, জবাব দিতে গিয়ে খারাপ লাগছে না ওর।

কথায় কথায় বলল লারসেন, আজ সকালে ফোন করেছিল মাসুদ রানা। আপাতত আছে নেপলসে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু রেমারিককে নিয়ে এ দেশে পৌঁছুবে আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতর। কথাটা শুনে মারিয়া বলল, আগামী কয়েক দিন এ শহরেই থাকবে ও। যেহেতু তারা খোঁজ করছে হারিয়ে যাওয়া আমেরিকান সৈনিকদেরকে,

কাজেই রানা বা তার বন্ধুদের কিছু লাগলে তা দিতে পারবে সে অফিসের মাধ্যমে। উল্লেখ না করে আবছাভাবে বুঝিয়ে দিল, চাইলে অস্ত্রও নিতে পারে ওরা।

এরপর মারিয়ার জীবন সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করল লারসেন, আসলে বুঝতে চাইল মেয়েটার অতীত কেমন ছিল।

ব্যক্তিগত প্রশ্ন এড়িয়ে ছোটবেলা ও স্কুলের কথা বলল মারিয়া। জানাল, ওয়েলেসলি ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে। ওর মেজর বিষয় ছিল ইতিহাস। এ প্রসঙ্গে বলল, ভিয়েতনামে ওর বাবার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা। তখনই ঠিক করেছিল, বাবার মত যোগ দেবে আমেরিকান মিলিটারিতে।

প্রথমে বুট ক্যাম্পে কেমন লেগেছিল তরুণী মারিয়ার, তা অবাক হয়ে শুনল পিটার লারসেন। এ সময়ে যেন আরেক জগতে থাকল ফুলজেন্স। চুপচাপ খেল সুস্বাদু খাবার, মাঝে মাঝে গ্লাস তুলে চুমুক দিল ক্ল্যারেট-এ।

প্রসঙ্গ পাল্টে গেলে মারিয়ার বর্তমান কাজ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল লারসেন। বুঝতে চাইল, কেমন সংগঠন এমআইএ। নিজের পুলিশ জীবনের কথাও তুলল।

আসলে ওদের দু'জনের কাজের ভেতর অনেক মিল। এ কারণেই মন থেকে কথা বলল মারিয়া। কাজ করতে গিয়ে এক পর্যায়ে হয়তো বুঝল, পাবে না মানুষটাকে। এখানে একটা সূত্র, ওখানে আরেকটা... হয়তো মিলল ভুল তথ্য। সন্দেহ করছে এক, হলো অন্যকিছু। মনে আসতে লাগল শুধু হতাশা। বেশিরভাগ সময় বহু পথ পাড়ি দিয়ে ফুরিয়ে যায় প্রেরণা ও সব আশা— খুঁজে আর পাওয়া যায় না মানুষটাকে। বা শেষপর্যন্ত মেলে কয়েকটা হাড় ও করোটি। জেনেটিক পরীক্ষা আবিষ্কার হওয়ার পর সহজ হয়েছে কাজ, কিন্তু তারপরেও সাফল্যের হার মাত্র শতকরা দুই ভাগ।

'এত শ্রম, এতে কি সত্যিই লাভ হচ্ছে?' মারিয়ার কথা শুনে বলল লারসেন।

'লাভ কমই হচ্ছে, তবুও হাল ছাড়ি না আমরা,' বলল মারিয়া, তুলল ওর বাবার কথা। সেই কবে নিখোঁজ হয়েছেন। কিন্তু তাঁকে ফিরে পেতে আজও বুকে জাগে আশা, আর তাঁর মত হারিয়ে যাওয়া অফিসার বা সৈনিকের জন্য আকুল থাকে হাজারো আমেরিকান বাবা-মা-স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে। সবাই চায়, মৃত আত্মীয়ের কবরটা হোক আর্লিংটনে।

এসব কথা শুনে হঠাৎ করেই যেন নতুন করে উপলব্ধি এল পিটার লারসেনের। একই অনুভূতি ফুলজেন্সের। মস্ত এক স্টেক থেকে মুখ তুলে প্রথমবারের মত আলাপে যোগ দিল সে।

'মার্সেইল্‌স্‌-এ গেলে একবার হলেও যাই গোরস্তানে, মা'র কবরে দিই হাতের ফুলগুলো। মনটা বলে, মা আছেন আমার খুবই কাছে। আজ এত বছর হয়ে গেল, তা-ও তাই মনে হয়।' প্রথমবারের মত হাসল ফুলজেন্স। 'আপনি কি জানেন, মাদাগাস্কারে দু'এক বছর পর পর কবর খুঁড়ে মৃত আত্মীয়ের কঙ্কাল বের করে ওরা, নিজেদের সেরা সব পোশাক পরিয়ে তাদের নিয়ে মিছিল করে ঘুরে বেড়ায় শহর ও গ্রামে। সেসময় দেয়া হয় মস্তবড় পার্টি। ফুর্তি করে সবাই, এই তো, আমাদের পাশেই আছে আমাদের সব স্বজন। ওদের ওই অনুষ্ঠানটা পছন্দ করি আমি।'

আবারও স্টেকে মন দিল ফুলজেন্স। মারিয়ার দিকে চেয়ে চোখ টিপল লারসেন। 'ভাবুন একবার, আমাদের পেঁচা বাপ-দাদার হাড়গোড় কাঁধে তুলে প্যারেড করছে মার্সেইলস-এ। ব্যাটা যদি ওই কাজ করে, ওকে জেলে ভরে চাবি লুকিয়ে ফেলবে কর্তৃপক্ষ। এ জীবনে আর বেরোতে হবে না গাধাটাকে।'

লারসেনকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে মারিয়ার দিকে তাকাল

ফুলজেন্স। 'আপনি মিউযিক ভালবাসেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী ধরনের?'

'বেশি পছন্দ করি ক্লাসিকাল,' হঠাৎ মারিয়ার কালো চোখে দেখা দিয়েছে আগ্রহ।

'কোন্ কমপোযারকে পছন্দ করেন?'

'মোযার্ট, ভার্ডি, বিটোফেন... আর অস্বীকার করব না... স্ট্রাউস দ্য ইয়াংগার।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল ফুলজেন্স।

মারিয়ার মনে হলো, পাশ করেছে বড় এক পরীক্ষায়। তখনই ওর মন বলল, কী কারণে যেন পিটারেরও কোনও পরীক্ষায় উতরে গেছে ও। ওকে অনেক আপন মনে করছে বিদেশি লোক দু'জন।

'স্থানীয় সরকারের সঙ্গে আপনার অফিসের সম্পর্ক কেমন?' জানতে চাইল লারসেন।

'যথেষ্ট ভাল, মিস্টার লারসেন। দুটো কারণও আছে। আমরা সব স্যাংশন তুলে নেয়ার পর ভিয়েতনাম সরকার চাইছে তাদের আরও স্বীকৃতি দিক ইউএসএ। কিন্তু তা পেতে হলে এমআইএ কেসগুলোয় সহায়তা দিতে হবে। দ্বিতীয় কারণ, আমার অন্যসব কলিগের মত লাঠি হাতে কর্তৃপক্ষকে দাবড়াতে আসি না আমি। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্বাভাবিক। কখনও নির্দেশ দিই না তাদেরকে, বড় জোর অনুরোধ করি।'

টেবিলের আরেক প্রান্ত থেকে মারিয়াকে দেখছে লারসেন। মনে হলো কোনও সিদ্ধান্ত নিল। পাশে রাখা ব্রিফকেস টেবিলে তুলে খুলল, ভেতর থেকে বের করল সরু এক বাদামি ফাইল। ওটা মারিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এক ভিয়েতনামিযের সংক্ষিপ্ত ফাইল। নাম কুয়েন আন টু। দক্ষিণ রিজিমের অ্যান্টি-

করাপশন ব্রাঞ্চের সিনিয়র পুলিশ অফিসার। গোলাগুলির সময় চার বছর আগে গুরুতর আহত হয়েছিল। জানুয়ারির সাতাশ তারিখে হাসপাতাল থেকে পাঠিয়ে দেয়া হয় জেলখানায়। ওখান থেকে উধাও হয় পনেরো দিন পর। যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে আদালত থেকে তাকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়েছিল। আমার জানা দরকার, হো চি মিন সিটিতে সে আজও বাস করে কি না।'

ফাইল খুলে মনোযোগ দিয়ে ভেতরের তথ্য পড়ল মারিয়া, তারপর বলল, 'থাকতে পারে এ শহরেই। যেহেতু তার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ ছিল না।' ফাইল বন্ধ করে বলল, 'এই ফাইল নিজের কাছে রাখতে পারি?'

মাথা দোলাল লারসেন।

মারিয়া বলল, 'কেন তাকে খুঁজছেন, বা কে গুলি করেছিল তাকে, এসব জানলে খোঁজ নেয়া সহজ হবে আমার জন্যে।'

চট্ করে পেঁচাকে দেখল লারসেন। ওদের ভেতর যেন বিদ্যুতের গতি তুলে নীরব তথ্য আদান-প্রদান হলো। কয়েক সেকেণ্ড পর লারসেন বলল, 'ওই লোককে গুলি করেছিল মাসুদ রানা। ভেবেছিল মারা গেছে। কিন্তু আজ চার বছর পর মনে হচ্ছে, বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে সে। হার্টিগানদের বাড়িতে দিয়ে গেছে তাঁদের ছেলের ডগট্যাগ।'

চুপ করে কী যেন ভাবছে মারিয়া। লারসেন বলল, 'মনে করি না জর্জ হার্টিগান বেঁচে আছে।' আরেকবার ফুলজেন্সকে দেখল। 'আমাদের ধারণা, ওই ডগট্যাগ ব্যবহার করে রানাকে ভিয়েতনামে ডেকে এনে ফাঁদে ফেলতে চাইছে কেউ।'

'হতে পারে,' বলল মারিয়া। 'জর্জ হার্টিগানকে ভাল করেই চিনতেন মিস্টার রানা।' লারসেনের চোখে বিস্ময় দেখল ও।

'আপনি এটা কীভাবে জানলেন?' জিজ্ঞেস করল গোয়েন্দা।

সামনে ঝুঁকে নিজের সেরা মিষ্টি হাসি দিল মারিয়া। 'আপনি

এ ঘরে একমাত্র গোয়েন্দা নন, মিস্টার লারসেন। আপনার বন্ধু মাসুদ রানা আমেরিকান আর্মির পাশে যুদ্ধ করেছেন এ দেশের সীমান্তের জঙ্গলে। তখনই ড্রাগ লর্ড বা ড্রাগ উৎপাদনকারীদের সঙ্গে লড়াই করেন। সেসময় হারিয়ে যায় জর্জ হার্টিগান। ধরে নেয়া হয়েছিল মারা গেছে তরুণ। আমার একমাত্র প্রশ্ন এখন: চার বছর পর আবারও হাজার বিপদ হবে জেনেও কেন এ দেশে ফিরছেন মাসুদ রানা? যে তরুণের সঙ্গে মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়, তার জন্যে এত বড় ঝুঁকি নেবেন কেন তিনি? আমরা জানি, জর্জ হার্টিগানের বাবা-মা'র এত টাকা নেই যে আপনাদের খরচ জোগাতে পারবেন। ভাল করেই জানেন আপনারা, কোনও পয়সা পাবেন না এই কাজ থেকে। তা হলে?'

থমথমে নীরবতা নেমেছে টেবিল ঘিরে।

'তার মানে ভালভাবেই খোঁজ নিয়েছেন,' কিছুক্ষণ পর বলল লারসেন।

'ওটা আমাদের দায়িত্ব,' বলল মারিয়া। 'আমার বস নির্দেশ দিয়েছেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে মাসুদ রানার দিকে। কাজেই জেনে নিয়েছি তিনি কী ধরনের লোক। এখন পর্যন্ত যত তথ্য পেয়েছি, তাতে মনে হয়েছে, খুবই কঠোর লোক তিনি। আবেগ বলতে কিছুই নেই। যন্ত্রের মত নিখুঁতভাবে কাজ করেন। এবার আমার কথা শুনুন, লারসেন, আমরা পাশাপাশি কাজ করতে চাইলে পরিষ্কারভাবে গোটা পরিস্থিতি জানতে হবে আমাকে। কিছুই গোপন না করে বলুন, এত টাকা খরচ করে এত ঝুঁকি নেবেন কেন মাসুদ রানা? তাঁর স্বার্থ কী?'

কফি নিয়ে এসে টেবিলে দিয়ে গেল ওয়েটার। সে চলে যাওয়ার পর মুখ খুলল লারসেন, 'প্রথম কথা, দয়া করে আমাকে পিটার বলে ডাকবেন। আমিও আপনাকে মারিয়া বলেই ডাকব। এবার আসা যাক রানা বা আমাদের স্বার্থের কথা। আমাদের স্বার্থ

রানার পাশে থেকে সাধ্যমত বিপদ দূর করা। আর রানার স্বার্থ? বাঙালিরাও বুঝি ডেনমার্কের মানুষের মতই হয়। কখনও কখনও যুক্তির বাইরে গিয়ে বিবেক বুঝে চলে। অপেক্ষা করুন দুটো দিন। রানা নিজেই হয়তো আপনাকে বলবে, কেন এ দেশে আসছে জর্জ হার্টিগানকে খুঁজতে।'

'বেশ, অপেক্ষা করব তাঁর যুক্তি জানার জন্যে,' ফাইলে টোকা দিল মারিয়া ওয়াকার, 'তবে তার আগে, আগামীকাল সকালে আমার প্রথম কাজ হবে, ওই কুয়েন আন টুর বিষয়ে খোঁজ বের করা।'

পনেরো

মিস্টার লেং সেং আদপেই অত্যন্ত ভদ্রলোক, যদিও অন্তরে পাঁড় কমিউনিস্ট। বেশিরভাগ কমিউনিস্ট নেতা ক্ষমতায় এলেই তাদের চাই বড় বাড়ি, ভাল গাড়ি, আরও অনেক কিছুই— পেটে খিদে থাকলে মরলে মরুক শালার সাধারণ মানুষ! কিন্তু কেউ বলতে পারবে না, সরকার বা জনগণের কাছ থেকে আজ পর্যন্ত নিজের বা স্বজনের জন্যে বাড়তি কোনও সুযোগ বা সুবিধা আদায় করেছেন লেং সেং। সরকার থেকে তাঁকে বলে দেয়া হয়েছে, আমেরিকানদের সঙ্গে বজায় রাখতে হবে সুসম্পর্ক। পশ্চিমা বিনিয়োগকারীদেরকে টেনে আনতে হবে এ দেশে। সে কাজে পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছেন তিনি।

খুব ধীরে ঘুরছে ছাত থেকে ঝুলন্ত ফ্যান, তাতে কাটছে না

ভাপসা গরম। টেবিলে রাখা থার্মোস ফ্লাস্ক খুলে ওটা থেকে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে অতিথির দিকে গ্লাস বাড়িয়ে ধরলেন লেং সেং। কয়েকটা কারণে ওই মেয়ের প্রতি পিতৃসুলভ স্নেহ জন্মে গেছে তাঁর। বেশিরভাগ পশ্চিমাদের মত বেয়াড়া নয় এ মেয়ে। চোখে বড়দের জন্যে শ্রদ্ধা। বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই ওকে চেনেন লেং সেং। কখনও কখনও তাঁকে ডিনারে নিয়ে গেছে মারিয়া। ওকে পছন্দ করার আরেকটা কারণ, মেয়েটা নিখুঁতভাবে বলতে পারে এ দেশের ভাষা। আসলে নানান কারণে মারিয়ার বাবাকে খুঁজে বের করতে গিয়ে অনেক সময় দিয়েছেন তিনি। তাতে লাভ হয়নি। এমন কী হাড়গোড়ও পাওয়া যায়নি। প্রতিবার মারিয়া তাঁর অফিসে এলে দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি। শ্রদ্ধাও করেন মারিয়াকে। নিজের বাবার খোঁজ বের করতে যে চেষ্টা করেছে, তার চেয়ে কম পরিশ্রম করছে না অন্য সবার হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়কে খুঁজে বের করতে।

'মারিয়া, এখনও চালু রেখেছি মাত্র পাঁচটা ফাইল,' বললেন লেং সেং 'প্রতিটা গোলমেলে। কোনও তথ্য নেই বললেই চলে। ধৈর্য হারাতে বসেছি আমরা। তুমি বললে আবারও এসব ফাইল নিয়ে তদন্ত করব। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না। আর কী করতে পারি আমরা?'

প্রতিবার এ অফিসে এলে বয়স্ক মানুষটাকে দেখে আর এই একই কথা শোনে মারিয়া। তবে আজ এসেছে অন্য কারণে। নরম স্বরে বলল, 'আজ আন-অফিশিয়াল আলাপ করব, আঙ্কেল সেং।'

'বলো, কী করতে পারি?' জানতে চাইলেন বৃদ্ধ।

একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলল মারিয়া, 'এই লোক সম্পর্কে জানতে চাই। সে কোথায় আছে, বা কী হয়েছে তার।'

কাগজটা নিয়ে পড়লেন লেং সেং। মুখ তুলে মারিয়াকে

দেখলেন। একটু কুঁচকে গেল ভুরু। 'এবার কি তোমার এজেন্সি হারিয়ে যাওয়া ভিয়েতনামি পুলিশদেরকে খুঁজছে?'

'তা নয়।' মাথা নাড়ল মারিয়া। 'কিন্তু এই লোককে খুঁজে বের করতে পারলে হয়তো জানব, কোথায় আছে আমাদের একজন এমআইএ।'

কাগজ হাতে উঠে দাঁড়ালেন লেং সেং। 'একটু অপেক্ষা করো। তুমি তো ক্যান্টনিস খাবার পছন্দ করো, তাই আজ পুরনো এক চাইনিজ রেস্তোরাঁয় তোমাকে নিয়ে যাব। আশা করি, ততক্ষণে আমার সেরা অ্যাসিস্ট্যান্ট বের করে ফেলবে ওই কুয়েন আন টুর বিষয়ে জরুরি তথ্য।'

আশা করা যায় বরাবরের মতই হতাশ করবেন না বয়স্ক মানুষটা, ভাবল মারিয়া। লেং সেঙের বয়স কমপক্ষে পঁচাত্তর, নিজ যোগ্যতায় চাকরি বজায় রেখেছেন এত বয়সেও। এখনও কথায় বার্তায় অমায়িক, রাগ বলতে কিছুই নেই। রেস্তোরাঁয় তাঁর সঙ্গে গেলে আজও চপস্টিক বাগিয়ে সেরা ঝিনুক খুঁজে তুলে দেন ওর প্লেটে।

অ্যাসিস্ট্যান্টকে কাজ বুঝিয়ে দেয়ার পর লেং সেঙের সঙ্গে রিক্সায় চেপে মাইলখানেক দূরের এক চাইনিজ রেস্তোরাঁয় এল মারিয়া। ভেতরে ভিড় নেই। রাস্তা থেকে দূরের এক টেবিলে বসল ওরা। তিন মিনিট পর গরম খাবার দিয়ে গেল ওয়েটার।

'এবার বলো তো, মেয়ে, এখনও বিয়ে করছ না কেন তুমি?' হাসলেন লেং সেং।

তাঁর চোখে এ মুহূর্তে দুষ্টুমি নেই, দেখল মারিয়া। বলল, 'কেউ তো আমাকে বিয়ে করতে চায়নি এখনও।'

'চায়নি, কারণ তুমি পুরুষদেরকে পাত্তা দাও না,' বললেন লেং সেং। 'মুখ অত গম্ভীর করে রাখলে ভিড়বে কী করে ছেলেরা!'

'তা ছাড়া, কাউকে উপযুক্ত বলেও মনে হয়নি।'

'আসল কথা, তুমি চারপাশে তোমার জাল ফেলোনি।'

'মেয়েদেরকে কেন জাল ফেলতে হবে, আঙ্কেল সেং?'

খুব গম্ভীর হয়ে গেল লেং সেঙের মুখ। 'অবশ্যই তা করতে হবে। কিন্তু জাল হতে হবে যথেষ্ট বড় ফুটো সহ। নইলে আটকা পড়বে ছোট মাছ। ফালতুগুলো বেরিয়ে যাক, কিন্তু বড়গুলোকে তো ধরতে হবে?'

লেং সেঙের মতই গম্ভীর চেহারা করে বলল মারিয়া, 'মনে হয় আমার জালে এতই বড় ফুটো, বড় মাছও বেরিয়ে যায়।'

আপত্তি নিয়ে মাথা নাড়লেন সেং। 'আমার ধারণা, তুমি আসলে জালই ফেলোনি। ...বয়স কত হলো তোমার?'

এদিকেই যে মোড় নেবেন সেং, আগেই বুঝেছে মারিয়া। ভিয়েতনামিরা সাধারণত অন্যের বিষয়ে নাক গলায় না, কিন্তু ওর সঙ্গে লেং সেঙের সম্পর্ক এমনই। পরস্পরের প্রতি ওদের আছে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। 'এবার ছাব্বিশ হবে,' বলল মারিয়া।

ডিশের সবচেয়ে বড় ঝিনুক তুলে ওর প্লেটে রাখলেন সেং। অন্তত বিশ সেকেণ্ড মারিয়ার চোখ দেখে নিয়ে বললেন, 'এত কমবয়সেই আমেরিকান আর্মিতে ক্যাপ্টেন হয়েছ। চমৎকার করছ ক্যারিয়ারে। বুঝতে পারছি, বড় অফিসাররা প্রশংসা করে। তুমি সুন্দরী, বুদ্ধিমতি... বলো তো কতজন পুরুষ তোমাকে বিয়ে করতে চাইছে?'

হেসে ফেলল মারিয়া। 'আপনিই আন্দাজ করুন? কতজন হলে খুশি হবেন?'

ভুরু কুঁচকে ভাবছেন বৃদ্ধ। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'অন্তত পাঁচজন?'

চুপ করে থাকল মারিয়া।

'আপাতত কোনও প্রেমিক নেই?' হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস

করলেন সেং।

'প্রেম করার সময় কোথায় পেলাম?' হাসল মারিয়া।

মাথা দোলালেন সেং। 'চাকরির ফাঁকে লেখাপড়া শেষ করতে হয়েছে। বুঝলাম। কিন্তু এটা কোনও জীবন হলো?'

শেষ ডিশ চও ফ্যান দিয়ে গেল ওয়েটার। আগের মতই সার্ভ করলেন বৃদ্ধ। নরম সুরে বললেন, 'তুমি খুব ভাল বউ আর মা হবে। নিজেও খুব ভাল মেয়ে তুমি। আমরা ভিয়েতনামিরা দুঃখিত যে, এ দেশে এসে মরতে হলো তোমার বাবাকে। যাক, নিজে যদি দেখে যেতে পারি তুমি বিবাহিত আর সুখী, বড় ভাল লাগবে।'

মানুষটা অন্তর থেকে বলছে বুঝতে পেরে কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল মারিয়ার মন। আসলেই তো, কারও দিকেই চোখ ছিল না ওর। কেউ কেউ আগ্রহ দেখিয়েছে, কিন্তু ক্যারিয়ারের কথা ভেবে এগোনো হয়ে ওঠেনি। প্রায় ফাঁকা রেস্তোরাঁ দেখল মারিয়া। এইমাত্র ভেতরে ঢুকেছে এক তরুণী। ঘর পেরিয়ে এসে লেং সেঙের হাতে দিল নীল এনভেলপ। নিচু স্বরে কী যেন বলে চলে গেল।

ওয়েটার দিয়ে গেল চা। এনভেলপ খুললেন সেং। ভেতরে দু'পাতা কাগজ। পড়তে পড়তে একটু পর তিক্ত হাসলেন। 'তোমার ওই লোক মাত্র কয়েক দিন জেল খেটে বেরিয়ে গেছে। আজও সুষ্ঠু বিচার হয় না ভিয়েতনামের আদালতে। সিক্রেট সার্ভিস থেকে জানানো হয়েছে, ওই লোকের জন্যে সেসময়ের প্রধান বিচারপতিকে ঘুষ দেয়া হয়েছিল দু'লাখ ডলার। ওই বিচারপতিকে আর ধরা যাবে না। মারা গেছে সাড়ে তিন বছর আগেই। তার ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী বাস করে মালয়েশিয়ায়। রাজার হালে আছে।'

'আর কুয়েন আন টু কোথায় গেছে?'

আবারও কাগজে চোখ নামালেন লেং সেং। কয়েক সেকেণ্ড

পর বললেন, 'ক্যামবোডিয়ায়।'

ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিল মারিয়া। 'তার বিষয়ে আরও কিছু জানাতে পারবেন, আঙ্কেল?'

বিব্রত হলেন বৃদ্ধ। 'আসলে টাকা কথা বলে, মারিয়া। কুয়েন আন টুর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল এক অশুভ লোকের। ওই লোক একই সঙ্গে ক্যামবোডিয়া আর ভিয়েতনাম সরকারের ঘুষখোর অফিসারদেরকে রেখেছিল নিজের পকেটে। ওই লোক কেজি কেজি সোনার বদলে বন্ধুকে সরিয়ে নিয়ে যায় ভিয়েতনাম থেকে অন্য দেশে।'

'সেই লোকের নাম কী?'

'তার নাম জন বেলগুতাই। নতুন করে কুয়েন আন টুর বিষয়ে আদালতে মামলা চালু করা হয়নি।'

ওদের দু'জনের আলাপ শেষ। কিছুক্ষণ টুকটাক কথার পর উঠতে চাইল মারিয়া। লেং সেং বিল মিটিয়ে দেয়ার পর রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আলাদা দুটো রিক্সা নিল ওরা।

ভিড়ে ভরা চোলোনের সরু পথ শেষ হলে নদীর সেতু পেরিয়ে আরও ব্যস্ত শহরে ঢুকল মারিয়া, উত্তেজিত। জরুরি কিছু তথ্য জোগাড় করতে বলেছিল লারসেন, ঠিকভাবেই সেই কাজ শেষ করেছে। নিজেকে মনে হচ্ছে সফল। রিক্সা আরোহীর জন্যে তৈরি দু'পাশের হাতলে তবলা বাজাচ্ছে মারিয়া। জ্যামের ভেতর দিয়ে হোটেলের দিকে চলেছে ওর রিক্সা।

হোটেল রিসেপশন ডেস্কে থেমে চট্ করে দেখে নিল সারি সারি চাবি রাখার খুপরি। পিটার লারসেন উঠেছে ছত্রিশ নম্বর ঘরে। খুপরির ভেতর চাবি নেই। লিফটের জন্য অপেক্ষা করল না মারিয়া, সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের বেগে উঠে এল দোতলায়। বারকয়েক টোকা দিল নির্দিষ্ট দরজার ওপর। ঠিক করেছে কথা বলবে সংক্ষেপে। জরুরি তথ্য দেবে, কিন্তু এমন ভঙ্গি নেবে, আসলে

আমেরিকান আর্মি অফিসারদের কাছে ওসব কিছুই নয়।

সামনে খুলে গেল দরজা।

একটু ওপরে উঠল মারিয়ার চোখ।

ওকে দেখছে অদ্ভুত রহস্যময় কালো দুটো চোখ। ওখানে বুদ্ধিমত্তা ও কোমলতা। কিন্তু স্পষ্ট বুঝল মারিয়া, প্রয়োজনে অত্যন্ত কঠোর হবে এ চোখের মালিক। যুবকের নিষ্ঠুর ঠোঁটে মৃদু হাসি। ওদিকে চেয়ে গলা শুকিয়ে গেল মারিয়ার, ঢোক গিলল। মনে মনে বলল, এত সুন্দর হয় পুরুষের ঠোঁট? নিজেকে বোকা লাগতেই একবার খুক করে কেশে নিয়ে বলল, 'আপনিই বুঝি মিস্টার রানা?'

গম্ভীর কিন্তু নরম সুরে বলল যুবক, 'হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয়ই মিস মারিয়া ওয়াকার?'

ষোলো

নিজেকে বড় অবাঞ্ছিত মনে হলো মারিয়ার। ও যেন স্কুলের ছাত্রী, জোর করে নিজের রচনা শোনাচ্ছে একদল শিক্ষককে।

গোল টেবিল ঘিরে বসেছে ওরা বার-এ। মারিয়ার সরাসরি সামনে মাসুদ রানা। ডানদিকে ইতালিয়ান বন্ধু ভিটেলো রেমারিক। ওদের দু'জনের একদিকে পিটার লারসেন, অন্যদিকে ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স। পুরুষরা নিয়েছে বিয়ার, মারিয়ার সামনে কফি।

নিজেকে বহিরাগতা মনে হচ্ছে মারিয়ার, কারণ অন্তরে অন্তরে গভীর কোনও টান আছে এই চার পুরুষের, যেমন থাকে আপন

ভাইদের ভেতর। ওয়েটার ড্রিঙ্ক দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের আলাপ মনোযোগ দিয়ে শুনল মারিয়া। পুরনো দিনের গল্প করছে সবাই। তাতে আসছে মারিয়ার অচেনা মানুষের নাম। নিজেদের ভেতর কৌতুক করছে, কিন্তু অর্থ বুঝতে পারছে না ও নিজে। তাই বলে এমন নয় যে ওকে মোটেও পাত্তা দেয়া হচ্ছে না। আসলে মারিয়ার মনে হচ্ছে, অদৃশ্য কোনও কাঁচের দেয়াল আলাদা করে রেখেছে ওই মানুষগুলোকে ওর থেকে। হঠাৎ বড্ড একাকী মনে হলো ওর। এই অনুভূতি কাটিয়ে উঠতে চাইল। মনোযোগ দিল সবার ওপর।

www.boighar.com

চার বন্ধুর ভেতর মাসুদ রানা ও রেমারিক একটু আলাদা। কোন্ দিক থেকে, স্পষ্ট বুঝল না মারিয়া। ইতালির সহজ মনের লোক বলে মনে হলো রেমারিককে। সুদর্শন, যদিও তার নাক ভাঙা। মাথার চাঁদি ফরসা হয়ে আসছে। রোদে পোড়া। কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত। মন থেকে হাসতে জানে। পরনে কালো সিল্কের পোলো নেক শার্ট, কালো প্যান্ট। দেখলে মনে হবে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে জিওরজিয়ো আর্মানির শো-রুম থেকে। যখন দেখছে ওকে, তাতে কোনও পাপ থাকছে না। মুখ দেখছে, শরীর নয়। কিন্তু মাসুদ রানা অন্য কিছু দেখছে। মারিয়া সচেতন হওয়ার পর থেকেই বুঝতে পারছে, ওর মন বুঝতে চাইছে বাঙালি যুবক।

বরাবরের মতই চুপ ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স। দেখছে-শুনছে সব। ডেইন পিটার লারসেন সামনে রেখেছে ল্যাপটপ কমপিউটার। চোখ সবুজ স্ক্রিনে। কয়েক সেকেণ্ড পর চোখ তুলে মারিয়াকে দেখল। 'ঠিক আছে, এবার বলুন।'

লেং সেঙের সঙ্গে কী কথা হয়েছে, তা বলতে শুরু করল মারিয়া। দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণের আগেই থামতে হলো ওকে। জানতে চেয়েছে রানা, 'আলাপ হচ্ছিল কোন্ ভাষায়?'

'ভিয়েতনামিয,' বলল মারিয়া।

'আপনি ওই ভাষায় দক্ষ?'

'ছোটবেলা থেকেই এখানে মানুষ হয়েছি।'

'এ ছাড়া আর কী কী ভাষা জানেন?'

'অনর্গল বলতে পারি ফ্রেঞ্চ; ক্যামবোডিয়ান চলনসই।'

চেহারায় অনুভূতির ছাপ পড়ল না রানার। তবে মারিয়া দেখল, চট্ করে একবার রেমারিককে দেখল সে। নতুন করে বলতে আরম্ভ করতেই আবারও ওর মনে হলো, বক্তব্য রাখছে একদল শিক্ষকের সামনে। একদিক থেকে আসলেই ছোট আমি, ভাবল মারিয়া। বয়সে সবাই এরা বড়। যদিও ওর চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বেশি হবে না কেউ। অবশ্য দুনিয়া সম্পর্কে ওর চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা আছে এদের। প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউণ্ড ভেজে খেয়েছে ও। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, কিন্তু তারপরেও বুকের ভেতর টের পাচ্ছে দুর্বলতা। আসলে নার্ভাস হয়ে উঠছে ও।

কয়েক মিনিট চুপচাপ মারিয়ার কথা শুনল ওরা, তারপর বাধা দিয়ে লেং সেঙের ব্যাকগ্রাউণ্ড জানতে চাইল রেমারিক।

সংক্ষেপে জানাল মারিয়া। তথ্যগুলো ল্যাপটপে তুলে নিল ডেইন গোয়েন্দা।

'উনি আপনাকে বিশ্বাস করেন কেন?' জানতে চাইল রানা।

'কারণ তরুণী বয়স থেকে ওঁকে চিনি। ফটফট করে মিথ্যা বলা ফালতু মেয়ে বলে আমাকে মনে করেন না তিনি। শ্বেতাঙ্গিনী বলেও কোনও গর্ব নেই, ছোট চোখে দেখিনি কোনও এশিয়ানকে।'

'সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ তা করবে না,' বলল রানা, 'ভুললে চলবে না, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে এই ভিয়েতনামিরা।'

'কারণ পাশে ছিল মস্তবড় চিন,' না বলে পারল না মারিয়া।

মৃদু হাসল রানা। 'কথা ঠিক। কিন্তু গায়ের জোরে কোনও

জাতিকে দাবিয়ে রাখা যায় না। চিন পাশে না থাকলেও ঠিকই স্বাধীনতা পেত ভিয়েতনামিরা। তবে সময় লাগত।'

তর্কে গেল না মারিয়া। জানাল, লাখ লাখ ডলারের সোনা দিয়ে কুয়েন আন টুকে ভিয়েতনাম থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে তার এক বন্ধু।

'আপনি কি জানেন ওই ঘুষখোর দুর্নীতিপরায়ণ প্রধান বিচারপতিকে কে দিয়েছিল সোনা?' জানতে চাইল রানা।

'মোঙ্গল ও আমেরিকান এক বর্ণসংকর, নাম জন বেলগুতাই।'

নির্বিকার মুখে মারিয়াকে দেখছে রানা। কিন্তু মারিয়ার মনে হলো, এক পলকের জন্যে যুবকের চোখে ভাসল স্মৃতির মেঘ।

জিজ্ঞেস করল মারিয়া, 'আপনি তাকে চিনতেন?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'হ্যাঁ। চিনতাম। তখন পর্যন্ত আমার দেখা খারাপ লোকদের ভেতর সেরা ছিল সে।' কৌতূহল নিয়ে ওকে দেখছে রেমারিক। 'আজ থেকে বছর চারেক আগে ওই দানব জন বেলগুতাইকে খুন করি হংকঙের নিউ টেরিটোরির এক প্যাগোডার ভেতর। পুড়ে ছাই হয় প্যাগোডা সহ। ওই কাজটা না করলে, বাকি জীবন আফসোস করতাম।'

'এতই খারাপ?' কি-বোর্ডে আঙুল থেমে গেল লারসেনের।

'ওকে জানোয়ার বললে জানোয়ারের অপমান হবে। কোনও পশুও অত নীচ বা হিংস্র হতে পারে না। চিন, মায়ানমার, থাইল্যাণ্ড, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল— মানে, এশিয়া, ইউরোপের বেশিরভাগ দেশ এমন কী আমেরিকা মহাদেশ— সবদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল কালো থাবা। হাজার কোটি টাকার ড্রাগসের ব্যবসা ছিল। হাসতে হাসতে পঙ্গু করে দিচ্ছিল পৃথিবীর তরুণ সমাজের বড় এক অংশকে।'

'কাদের হয়ে তাকে খুন করেন?' জানতে চাইল মারিয়া।

ওকে দেখছে রানা, কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'কাদের হয়ে খুন করেছি, তা বড় কথা নয়, খুব খুশি হয়েছিল সিআইএ।'

মনে মনে হোঁচট খেয়ে বলল মারিয়া, 'ভাল করেই জানি, কখনও আমেরিকান সরকার কোনও খুনিকে ভাড়া করে না!'

রানা ও রেমারিকের ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখে আরও রেগে গেল মারিয়া। জোর দিয়ে বলল, 'আগে হয়তো তেমন হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু পরে আমাদের সরকারের নীতি বদলে নেয়া হয়েছে।'

আবারও মৃদু হাসল রানা ও রেমারিক।

ইতালিয়ান প্রাক্তন মার্সেনারি বলল, 'জন এফ. কেনেডির সময় থেকে পলিসি বদলে নিয়েছে আমেরিকা। আজকাল সহজে ব্যবহার করে না নিজেদের খুনি। কিন্তু একেবারে যে করে না, তাও নয়, লাদেনের ব্যাপারটার কী ব্যাখ্যা দেবেন? আমেরিকান সরকার অন্য দেশের খুনি ব্যবহার করে বহু মানুষকে খুন করছে। এসব খুনকে বলে তারা: "বেকেট অ্যাপ্রুভাল"।'

'এর মানে কী?' ভুরু কোঁচকাল মারিয়া।

সামনে ঝুঁকল রেমারিক। 'মারিয়া, আপনি কি জানেন কে ছিল টমাস এ. বেকেট? বা কেন মরতে হয়েছিল তাকে?'

গভীর পানিতে থই পাচ্ছে না, টের পেল মারিয়া। ইতালীয় লোকটা কড়া কথা না বলে বুঝিয়ে দিচ্ছে, তুমি আসলে কিছুই জানো না, মেয়ে! এতে রাগ লাগছে ওর, চাপা স্বরে বলল, 'তার কথা জানব না কেন, আমি অশিক্ষিত নই, মিস্টার রেমারিক।'

মাথা দোলাল প্রাক্তন মার্সেনারি। 'তা হলে তো জানেনই, রাজাকে বড় বেশি বিব্রত করছিল টমাস এ. বেকেট। তখন তাঁর নাইটদের বলেছিলেন রাজা: "কে আমাকে রক্ষা করবে ওই বিরক্তিকর যাজকের হাত থেকে?" তাতে ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে ক্যান্টারবারি ক্যাথেড্রালে পৌঁছল চারজন নাইট, বেকেটের বুক-পেট ফেড়ে দিল তলোয়ার দিয়ে। এই ঘটনায় রাজা বললেন,

চরম ভয়ঙ্কর এই হত্যাকাণ্ডে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। বর্তমান সময়ে যে-কোনও দেশের নেতা বা নেত্রীর ওপর বিরক্ত হলে, চিফ অভ স্টাফ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইযার বা সিআইএর ডিরেক্টরের কানের কাছে বলেন ইউএস প্রেসিডেন্ট: "উহ্, ওই আপত্তিকর মানুষটাকে যদি সরিয়ে নিতেন ঈশ্বর!" তার মানেই, নির্দেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট। তবে সুযোগ থাকল, মানুষটা খুন হয়ে যাওয়ার পর আফসোস করে বলার: "আহা, বড় ভাল মানুষ ছিল।" পরে বক্তব্য দেবেন তিনি: "আমরা ভাবতেও পারি না, এভাবে একজন চরিত্রবান মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হবে।" আবার মারিয়াকে দেখে নিয়ে হাসল রেমারিক। 'মুখে কিছুই না বলে খুন করানোর নাম হয়েছে: "বেকেট সিদ্ধান্ত।" ...বুঝতেই পারছেন, নিজেকে আড়াল করে বিবেক পরিষ্কার রেখে যা করার করবেন ইউএস প্রেসিডেন্ট।'

চুপ থাকল মারিয়া। তবে কয়েক সেকেণ্ড পর তাকাল রানার দিকে। 'সিআইএ আপনাকে কত হাজার ডলার দিয়েছিল?'

'টাকার বিনিময়ে খুন করি না,' সরাসরি বলল রানা। 'তবে কাজটা করে দেয়ায় কৃতজ্ঞ হন বড় কয়েকজন আমেরিকান সিনিয়র আর্মি অফিসার ও সিনেটর। তাঁদেরকে ব্ল্যাকমেইল করছিল ওই লোক। প্যাগোডা সহ পুড়ে ছাই হয়েছিল, সঙ্গে তার সংগ্রহ করা সমস্ত ডকুমেণ্ট। তবে ওসব ডকুমেণ্ট পুড়িয়ে ফেলার আগে চোখ বুলিয়েছি। ওসব থেকে শিক্ষা নেয়ার মত অনেক কিছুই ছিল।'

রাগের বদলে কৌতূহল চেপে ধরল মারিয়াকে। 'তা হলে কি বলতে চান, ইউএস সরকারের অনেকেই দুর্নীতিপরায়ণ?'

'কল্পনাও করতে পারবেন না; সংখ্যায় তারা কত,' মন্তব্য করল রানা। সরাসরি মারিয়ার চোখে চোখ রেখেছে। 'আপনি তো ইতিহাসের ছাত্রী। বেশি কিছু বলতে চাই না, নিশ্চয়ই পড়েছেন,

শুধু এই ভিয়েতনামে ইউএস বেসগুলো ঘিরে শুরু হয়েছিল বিশাল কারবার। প্রতি মাসে লেনদেন হতো হাজার হাজার কোটি টাকা। প্রতিটি বেস হয়ে উঠেছিল প্রকাণ্ড সব ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। মেয়েদের আণ্ডারপ্যান্ট হোক বা অত্যাধুনিক হাই-ফাই ডেক সেট, সবই বিক্রি হতো। হংকঙের এক ব্যবসায়ী এসব আমেরিকান বেস থেকে নানান জিনিস কিনে গোপনে অন্তত বিশটা দোকান খুলেছিল চিনে। ভিয়েতনামে চালু ছিল নাইট ক্লাব। এসব বেআইনী ব্যবসায়ে কাজ করত ফিলিপিনো ব্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রিপাররা। মস্ত এক জালের মত ছড়িয়ে পড়েছিল বেআইনী ব্যবসা। যুদ্ধের পর থেমে গিয়েছিল সব। কিন্তু আবারও নব্বুই সালের দিকে এ দেশে ঢুকতে লাগল আমেরিকানরা। ড্রাগস, মেয়েমানুষের ব্যবসা বা মদ সবই চালু হলো। আর এসব জালের মাঝখানে ছিল মস্ত বড় মাকড়সা জন বেলগুতাই। হো চি মিন সিটির বাইরে প্রকাণ্ড এক ভিলায় থাকত। এম্বাসির সিনিয়র আমেরিকান আর্মি অফিসার বা সরকারী লোক ভিড়ে গেল তার সঙ্গে। ড্রাগসের কথা বাদ দিন, ওই লোক যে কনডমের প্যাকেটের বদলে অ্যাব্রাম্‌স্ ট্যাঙ্ক পেয়ে যায়নি, তাই বেশি। এশিয়ার কয়েকটি দেশের সিক্রেট এজেন্ট খুঁজতে লাগল তাকে। লুকিয়ে পড়ল সে হংকঙের এক প্যাগোডায়। আমেরিকান জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা করছিল তাকে আমেরিকায় নিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তখন জন বেলগুতাই চাপ দিল কয়েকজন মার্কিন জেনারেলকে— হয় ঠেকাও বিচার বিভাগকে, নইলে তোমরাও শেষ। ফাঁস করে দেব সব। সেসব জানতে পারি ওই লোকের ডকুমেণ্ট পড়ে। তবে সেসব ব্যবহার করে নিজে কখনও ব্ল্যাকমেইল করতে যাইনি কাউকে।'

রানার প্রতিটা কথা বুকে বিঁধল মারিয়ার। বুঝল, একটা কথাও মিথ্যা বলেনি এই লোক। মিথ্যা বলবেই বা কেন?

কমপিউটার স্ক্রিন থেকে মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল লারসেন। 'কিন্তু কুয়েন আন টুর সঙ্গে জন বেলগুতাইয়ের সম্পর্ক কীভাবে হলো?'

'স্বাভাবিকভাবেই,' বলল রানা, 'জন বেলগুতাইয়ের হয়ে কাজ করত কুয়েন আন টু। তার কাছে কৃতজ্ঞ ছিল সে। আবার তার বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত জন বেলগুতাই। পার্টনার বলতে পারো দু'জনকে।'

'জন বেলগুতাই বেঁচে থাকলে চাইত তোমাকে ফাঁদে ফেলতে,' বলল রেমারিক। 'তার কোনও আত্মীয়কে চেনো?'

'মাত্র একজনকে। ক্যামবোডিয়ান রূপসী এক পতিতার গর্ভে হয়েছিল তার মেয়ে। অন্ধের মত ভালবাসত তাকে।'

'ওই মেয়ে কি জানে তুমিই খুন করেছিলে তার বাবাকে?' জানতে চাইল রেমারিক।

'মনে হয় না। কিন্তু নিশ্চিত নই। বড় কিছু ভুল করি। যেমন জর্জ হার্টিগান মারা গেছে ভেবেছি, তেমনি করেই ধরে নিয়েছি কুয়েন আন টু বেঁচে নেই। কিন্তু সে যদি বেঁচে থাকে, ওই মেয়ে জানে ওর বাবাকে খুন করেছি আমি।'

'আপনি জানেন ওই মেয়ে এখন কোথায়?' জানতে চাইল মারিয়া।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'না, জানা নেই। তবে মনে হচ্ছে খোঁজ নেয়া উচিত।'

সবাই উঠে দাঁড়ানোয় পিটার লারসেন জিজ্ঞেস করল, 'সেই মেয়ের নাম কী?'

'দায়না বেলগুতাই,' বলল রানা, 'জন বেলগুতাইয়ের মায়ের নামে নাম।' মারিয়ার দিকে তাকাল ও। 'অনেক তথ্য দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ, মিস ওয়াকার। আশা করি আমাদের সঙ্গে বসবেন ডিনারে। তারপর পুরনো কয়েকটা আস্তানায় ঢুঁ দেব। কপাল ভাল

হলে ওখানে পেয়েও যেতে পারি কিছু খবর।'

'আমিও আপনার সঙ্গে যেতে চাই,' বলল মারিয়া। 'অবশ্য আপনার বন্ধুদের আপত্তি না থাকলে।'

সবার হয়ে কথা বলল রেমারিক, 'চলুন আমাদের সঙ্গে। আমাদেরকে সরিয়ে রাখতে পারবেন ঝামেলা থেকে।'

সতেরো

'কুকুরটা আমাদের জালে পা দিয়েছে!' খুশির হাসিতে বিকৃত হয়ে গেল কুয়েন আন টুর চেহারা।

'তুমি পুরোপুরি শিয়োর?' জানতে চাইল দায়না বেলগুতাই।

'অবশ্যই। গতকাল ট্যান সন নাট এয়ারপোর্টে ওকে দেখেছে আমার লোক। ইমিগ্রেশনে খোঁজ নিয়েছি। নিজের নাম ব্যবহার করছে। তার সঙ্গে আছে ভিটেলো রেমারিক নামের এক লোক। ইমিগ্রেশন তথ্য অনুযায়ী, সে ইতালিয়ান, এসেছে নেপলস থেকে।'

'হ্যাঁ, শুনেছি ভিটেলো রেমারিক মাসুদ রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আগে মার্সেনারি হিসেবে একই দলে কাজ করেছে।' চুপ করে কী যেন ভাবছে দায়না বেলগুতাই।

'ওই লোকও বিপজ্জনক?' জানতে চাইল কুয়েন আন টু।

'হ্যাঁ। আহত বাঘের মত। অবশ্য আমার পাওয়া খবর অনুযায়ী, বেশ ক' বছর আগে ছেড়ে দিয়েছে মার্সেনারির কাজ। ওই লোক রানার সঙ্গে এসেছে মানেই ধরে নিচ্ছি, রানা সন্দেহ

করছে ওর জন্যে পাতা হয়েছে ফাঁদ। ঘটনা তা-ই হলে, শুধু রেমারিককে সঙ্গে আনেনি, আরও কেউ আছে। খুব সতর্ক হতে হবে। অন্ধের মত বিপদে পা ফেলার লোক নয় রানা।' কঠোর চোখে কুয়েন আন টুকে দেখল দায়না। 'তুমি শিয়োর, পেছনে যাকে লাগিয়ে দিয়েছ, সে নিজ কাজে যথেষ্ট এক্সপার্ট?'

নিশ্চয়তা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল কুয়েন আন টু, 'দায়না, সে দেশের সেরা। অভিজ্ঞতার অভাব নেই। তবে বুঝছি না তোমার প্ল্যানের এদিকটা। চাইছ তাকে চিনে ফেলুক রানা। তুলে নিয়ে খবর বের করুক ওর পেট থেকে। কিন্তু টিকটিকি জানবে না আমরা চাই সে ধরা পড়ুক। ভাবছে, বড় কাজ, তাই এত টাকা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সবদিক কি গুছিয়ে এনেছ, দায়না?'

'হ্যাঁ, প্রায় সব।'

মাথা দোলাল কুয়েন আন টু। 'খোঁজ পেয়ে আমাদের ওপর চোখ রাখবে রানা। দূর থেকে দেখবে ওই শেষ আমেরিকানকে। পায়ে থাকবে শেকল। আড়াল থেকে শুনবে, নির্দেশ দিচ্ছি এক জায়গার মাইন সরিয়ে ফেলতে। রানা বুঝবে, আমাদের হাতেই আছে জর্জ হার্টিগান। অন্যের সঙ্গে কথার সময় বলব, আমাদের কাছে আরও কয়েকজন আমেরিকান বন্দি সৈনিক আছে।'

মৃদু হাসল দায়না। 'হ্যাঁ, এসবে ভুল হলে চলবে না। তবে কথা হচ্ছে, জর্জ হার্টিগানের গোড়ালিতে শেকল নয়, আমি চাই ওই কাজ করবে অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স।'

'বলেছি তাকে,' বলল কুয়েন আন টু, 'খুব নার্ভাস। প্রথমে মানা করে দিল। তারপর বুঝিয়ে বলতে, রাজি হলো মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে অভিনয় করতে। কথা দিতে হয়েছে, ওই কাজ করার পর দশ হাজার ডলার পাবে সে। ব্যাটা বোধহয় মজে গেছে বেশ্যা কনি টুরেনের প্রেমে। তার ছেলেটাকেও খুব আদর করে।'

‘ক্ষতি কী,’ বলল দায়না, ‘ওকে ধরে রানা জানুক, এদিকে আছে আমেরিকান বন্দি সৈনিক। তবে জর্জ হার্টিগানকে খুব কাছে রাখা ঠিক হবে না। নইলে সুযোগ বুঝে তাকে নিয়ে চম্পট দিতে পারে রানা। অন্য প্ল্যানও আসছে আমার মনে। সঠিক সময়ে স্থির করব কী করা উচিত।’

‘ঠিক আছে।’

‘আরেক প্ল্যান অনুযায়ী, দূর থেকে এহেরেন্সকে দেখে রানার লোক বুঝবে; আসলেই আমাদের কাছে আছে শ্বেতাঙ্গ বন্দি।’ হাসল দায়না। ‘আমার কোনও প্ল্যানে কোথাও খুঁত পেলে?’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কুয়েন আন টু। ‘আগেই বলেছি, আমার লোক ভিয়েতনামের সেরা। সত্যি বলতে, দক্ষিণ-পুব এশিয়ার টপ ওয়াচার সে। ইন্টেলিজেন্স অফিসার। তার কাজ শত্রুর পিছু নেয়া। মনে করি না তার ধারে কাছে যেতে পারবে রানা। ওই লোকের পায়ের সমানও নয় সে। তাই বলছিলাম, তার বদলে বোকা কোনও লোককে কাজ দিলে ভাল হতো। সেক্ষেত্রে চট্ করে তাকে চিনে বন্দি করত রানা, পেত দরকারী খবর।’

সামনে ঝুঁকল দায়না বেলগুতাই। ‘এ কারণেই তোমার হয়ে কাজ করি না আমি, বরং তুমি কাজ করো আমার হয়ে। কখনও ভুলবে না, ছোট ভাবতে নেই শত্রুকে। এক পা যাওয়ার আগে তিনবার ভাববে। আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করো। শুনেছি মাসুদ রানার আছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, আর সেটা সতর্ক করে তাকে। যদি একবার বোঝে, ওর পিছু নিয়েছে অযোগ্য লোক, সহজেই ধরে নেবে, সূত্র পাইয়ে দিচ্ছি আমরা। আরও সতর্ক হবে। ওই লোকের কাছ থেকে যেসব তথ্য পাবে, মোটেও বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমরা সেরা লোক লাগিয়ে দিলে, হয়তো কয়েক দিন লাগবে রানার বুঝতে, কিন্তু টের পাওয়ার পর বুঝবে, পেছনে

লেগেছে যোগ্য লোক। তাকে ধরে যে তথ্য পাবে, বিশ্বাস করবে সেগুলো। কিন্তু সমস্যা যেটা হতে পারে, তা হচ্ছে, রানা হয়তো বুঝলই না পিছু নেয়া হয়েছে। অথবা, হয়তো বুঝতে পেরে উধাও হয়ে গেল।'

'দুশ্চিন্তা কোরো না, দায়না,' বলল কুয়েন আন টু। 'কণ্টিনেণ্টাল হোটেল বা শহরের যেসব বার-এ আগে রানা গেছে, ওখানে নিজেদের লোক রেখেছি। তাদের কাছে আছে রানার ছবি। রানা একবার ভিয়েতনাম থেকে ক্যামবোডিয়ার দিকে রওনা হলেই পেয়ে যাব খবর।' খুব নিচু করে নিল সে কণ্ঠস্বর, তাতে জন্মের ঘৃণা: 'আমার চোখের সামনে ভাসছে কুকুরটার চেহারা। মগজে গেঁথে গেছে। হারামজাদা এতই আত্মবিশ্বাসী, পিস্তলের সাইটের দিকে চোখ না রেখেই গুলি করে। ভেবেছিল মেরে ফেলেছে আমাকে। আমি যেন কুকুরের বাচ্চা। নিজেকে ঈশ্বর ভাবে শুয়োরটা। পুলিশ বা আদালতের দরকার নেই, যা খুশি করলেই হলো! আর মাত্র এক মিলিমিটার বামে গুলি লাগলেই খুন হতাম। মরলাম কি না দেখতেও আসেনি, ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে।' চাঁছাছোলা টেবিলের দিকে তাকাল সে। 'দায়না, তোমার বাবার স্মৃতির কথা ভেবে আমাকে কথা দাও—মাসুদ রানাকে মেরে ফেলার আগে শুধু একটা ঘণ্টার জন্যে তুলে দেবে আমার হাতে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পিঠ থেকে কাঠের কুচি ঝেড়ে নিল দায়না। ওর পিছু নিয়ে দরজা পর্যন্ত গেল কুয়েন আন টু। ওখান থেকে দেখল ইসুযু জিপের দরজা খুলল দায়না। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভেবো না, আন টু। ভয়ঙ্কর কষ্ট পেয়ে মরবে সে। নিজ চোখে দেখতে পাবে সেটা।'

'তা-ই দেখতে চাই... এখন কোথায় চললে?'

পশ্চিম দিগন্ত দেখল দায়না। ঘুম থেকে ওঠা বিড়ালের মত

অলসভঙ্গিতে ভাঙল আড়মোড়া। 'আজ রাত কাটাব ব্যাংককে। অনেক উত্তেজনা জমে আছে মনে। শরীরটা ঠাণ্ডা করতে হবে।' একটা চিন্তা আসতেই সরু হয়ে গেল ওর দু'চোখ। 'আমি ওরিয়েণ্টাল হোটেলে নদীর দিকে সুইট নেব। ওয়ার্লপুলে বাথ নেয়ার পর ম্যাসাজ শেষ হলে লেগারফিল্ড ড্রেস পরব। নিচে থাকবে না কোনও পোশাক। কানের পেছনে, নাভি বা আরও নিচে ব্যবহার করব জয় পারফিউম। তারপর বার-এ গিয়ে নেব শ্যাম্পেন ককটেল। ওখানে থাকবে পশ্চিমা ব্যবসায়ীরা। ওরা সবসময় মেয়েদের খুঁজতে যাওয়ার আগে ড্রিঙ্ক করে। তাদের ভেতর থেকে বেছে নেব অন্তত দু'জনকে।' ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলল দায়না। 'ওরা ভাববে পৌঁছে গেছে স্বর্গে। ওদেরকে নিয়ে আমার সুইটে গিয়ে গড়ব স্বপ্নের রাজ্য।' সূর্যের আলোয় দু'হাতের দীর্ঘ আঙুলের শেষে ঝিলিক দিল লাল নেইলপলিশ। 'আমার শরীর তো দেবই, ব্যবহার করব আমার আঙুল।' জিপের ড্রাইভিং সিটে বসে জিজ্ঞেস করল দায়না, 'তুমি কী করবে, কুয়েন?'

বড় করে দম নিয়ে বলল কুয়েন আন টু, 'অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স শালা কনি টুরেনের কাছে ভিড়তে দেবে না। ভাবছি, ঘুরে আসব ওর কোনও বান্ধবীর ওখান থেকে।'

আঠারো

কুচ-কুচ ইয়াং বার-এ আগেও এসেছে মাসুদ রানা। বার-এর ভারতীয় বৃদ্ধ মালিক কুলজাত সিঙের সঙ্গে হয়ে গিয়েছিল খাতির।

ধোঁয়াভরা ঘরের এক কোণে, টেবিলে বসেছে রেমারিক, লারসেন, ফুলজেন্স আর মারিয়া। অন্যদেরকে লায়ার ডাইস বা মিথ্যুকের পাশা শেখাচ্ছে রেমারিক।

বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত চমৎকার কেটেছে ওদের সবার। এরই ভেতর বেশ কয়েকটা ক্যাফে আর বার ঘুরেছে। একটু আগে ঢুকেছে কুচ-কুচ ইয়াং বার-এ।

'কেমন চলছে আপনার ব্যবসা?' বৃদ্ধের কাছে জানতে চাইল রানা।

অন্তত আধ মিনিট ওর চোখে চোখ রেখে তারপর বলল কুলজাত সিং, 'আগের চেয়ে ভাল। হবে না কেন, আপনার মত লোক আছে বলেই তো বন্ধ হয় ড্রাগের আখড়া। আর তখন মদ খেতে ছুটে আসে সবাই। ধন্যবাদ দিতে হলে আপনাদেরকেই দিতে হয়।'

গ্লাসে চুমুক দিয়ে কোণের টেবিল দেখল রানা।

ওর বন্ধুরা পাশা খেলতে ব্যস্ত, কিন্তু মারিয়া ওয়াকারের চোখ ওর ওপর। চোখে চোখ পড়তেই অন্যদিকে তাকাল আমেরিকান সুন্দরী। আবারও কুলজাত সিঙের ওপর চোখ ফিরিয়ে আনল রানা। 'একটা খবর পাব ভেবে এসেছি।'

'বলে ফেলুন কী জানতে চান।'

'আপনার মনে আছে এক বদমাস পুলিশ অফিসারের কথা, নাম ছিল তার কুয়েন আন টু?'

'ভুলি কী করে! পুলিশ বাহিনীর সবচেয়ে অসৎ লোক ছিল সে। গুজব শুনেছি, আপনিই তাকে গুলি করেন। এরপর দেশ ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু জানলেন না, বেঁচে গিয়েছিল সে।'

'গুজবটা সত্যি,' বলল রানা। 'কিন্তু আদালতে বিচার হলো না কেন তার?'

'এ দেশ ভরা ঘুষখোর সরকারী কর্মকর্তা, টাকা দিলেই

সেলাই করে ফেলে যে-যার মুখ।'

প্যাণ্টের পেছনের পকেট থেকে এক লাখ ডঙের একটা নোট বের করে কাঠের কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঠেলল রানা। নিচু স্বরে বলল, 'খুব খুশি হব সে এখন কোথায় আছে জানলে।'

নোট নিয়ে আবারও রানার দিকে বাড়িয়ে দিল কুলজাত সিং। 'টাকা রাখুন। আপনার কাছ থেকে নেব না। আগেই বলেছি, ড্রাগ বন্ধ হওয়ায় লাখ লাখ ডং মুনাফা করেছি। ...আমি খোঁজ বের করছি। কিছু জানলে কোথায় যোগাযোগ করব?'

'কণ্টিনেণ্টাল হোটেল। রুম ২২৩।'

'ঠিক আছে।'

নোট পকেটে রেখে গ্লাস হাতে ভিড় ঠেলে ঘরের কোনার টেবিলে চলে এল রানা। চেয়ার টেনে বসে দেখল লারসেন, ফুলজেন্স আর মারিয়াকে। সহজ সুরে বলল, 'রেমারিক শেখাচ্ছে মেক্সিকান লায়ার ডাইস। মনে হবে খুব সহজ খেলা। কিন্তু সারাজীবন লাগবে দক্ষ হতে। কয়েক দান খেলার পর রেমারিক বলবে, খুব ভাল খেলছ। তোমাদের কপাল আসলেই দেখার মত। তার কিছুক্ষণ পর বলবে, এসো ম্যাচের কাঠির বদলে টাকা দিয়ে খেলি। প্রথমে বেশ কয়েকবার হারবে ও। এদিকে বাড়তে থাকবে টাকার অঙ্ক। তোমাদের মনে হবে, আসলে তোমরা আইনস্টাইনের চেয়েও বুদ্ধিমান। আর তারপর সুযোগ মত মস্তবড় একটা দান মেরে তোমাদেরকে ফতুর করে দেবে রেমারিক।'

বন্ধুর দিকে তাকাল রানা। তাতে নাটকীয়ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমারিক। 'জরুরি খবর পেতে সময় লাগবে, বসে থাকতে হবে, তাই ভাবছিলাম, সবাই মিলে একটু মজা করি।'

রেমারিকের কাঁধ চাপড়ে দিল রানা। 'তা বটে, ভিটেলো! যেভাবে নতুন খেলোয়াড়কে স্টাড পোকার বা ব্যাকগ্যামন

শেখাও, তাতে মনে হয় পেশা হিসেবে তোমার বেছে নেয়া উচিত ছিল বাংলাদেশের কোচিঙের শিক্ষকতা, বড়লোক হয়ে যেতে চাপা মেরে।'

জবাব দিল না রেমারিক। রানার কাঁধের ওদিকে ঘরের দূরে চোখ, নিচু স্বরে বলল, 'বোধহয় পেছনে টিকটিকি লেগেছে।'

ঘুরেও দেখল না রানা। আস্তে করে মাথা দুলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। আগের দুই বার-এ ছিল।' চাপা স্বরে বলল, 'মারিয়া, দয়া করে স্বাভাবিক থাকুন। মাথা ওদিকে ঘোরাবেন না।'

'স্থানীয় পাহারাদার বা পুলিশের ওয়াচার,' মন্তব্য করল লারসেন।

'হয়তো,' বলল রানা, 'কিন্তু ভিয়েতনাম থেকে লোভ দেখিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে চাইছে কেউ, এমনও হতে পারে।'

'এই অবস্থায় কী করব আমরা?' জানতে চাইল মারিয়া।

'কিছুই করব না।' মারিয়াকে দেখল রানা। 'আপনার বন্ধু লেং সেঙের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন আমার?'

সামান্য ভেবে বলল মারিয়া, 'তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আগামীকাল সকালে ফোন দেব তাঁকে।'

চট্ করে হাতঘড়ি দেখে বলল রানা, 'অনেক রাত হলো। চলুন হোটেলে ফেরা যাক।'

হালকা একটা কার্ডিগান এনেছে মারিয়া। রানার সঙ্গেই চেয়ার ছাড়ল ও। কার্ডিগান পরতে ওকে সাহায্য করল রানা। তাতে একটু অবাক হলো মারিয়া। আজকাল অনেক নারী পুরুষের মতই সমান আয় করে বলে, এসব ভদ্রতা ত্যাগ করেছে আধুনিক জগতের পুরুষরা।

মনে মনে বলল মারিয়া, সত্যি, মাসুদ রানা লাখ লাখ মানুষের ভেতর একেবারেই আলাদা!

উনিশ

গভীরভাবে মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করে মাসুদ রানা। ভুল হয় না বেশিরভাগ সময়। প্রথম দর্শনেই লেং সেং-কে পছন্দ করে ফেলল ও। পাঁচ মিনিট হলো বৃদ্ধের অফিসে এসে ভিয়েতনামি কায়দায় পরিচিত হয়েছে। প্রথমে করমর্দন ও নাম বলা, তারপর হাজির হয়েছে চা, মিষ্টি ও আঠালো কেক। এখন সময় হয়েছে কী কারণে এসেছে বলার। তার আগে নিয়মমত রানা বলল, ওকে সময় দেয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।

'আমি মারিয়া ওয়াকারকে নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করি,' বললেন সেং। 'ওর অনুরোধ রাখব না, তা হয় না। অবশ্য আগেই ওর কাছ থেকে জেনে নিয়েছি আপনার অতীত। আপনার যে পেশা, সেটাকে খুব ভাল চোখে দেখি, তা বলব না। আপনি গোয়েন্দা, কিন্তু তদন্ত করতে এসেছেন অন্য দেশে। আমাদের পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে সাহায্য চাইতে পারতেন।'

'আমি গোয়েন্দা হিসেবে এখানে আসিনি,' বৃদ্ধের চোখে চোখ রেখে বলল রানা। 'সম্পূর্ণ অন্য কারণে এসেছি। ড্রাগ স্মাগলার বা উৎপাদনকারীদের ঠেকাতে আমেরিকা থেকে এসেছিল এক তরুণ সৈনিক। হারিয়ে গেছে সে, তাকে খুঁজছি। বলে রাখি, আমাকে টাকা দিচ্ছে না কেউ। ওই ছেলের বাবা-মা অনুরোধ করেছেন বলেই এসেছি।'

গরম চায়ে চুমুক দিলেন সেং। 'তো আপনার মন পরিষ্কার?'

‘এককথায় বলা মুশকিল,’ বলল রানা, ‘কিন্তু বলুন তো, নিজের বিবেক কি পরিষ্কার বলে মনে করেন আপনি?’

‘আমার তো তাই মনে হয়। অন্তর থেকে কমিউনিস্ট, ঘুষও খাই না। যে বেতন পাই, তাতে কোনওমতে চলে যায়।’

‘আপনি তো সরকারের পদস্থ অফিশিয়াল,’ বলল রানা। ‘শুনেছি আগে ছিলেন পুলিশে। ঠেকাতে পেরেছেন হাজার ড্রাগ ডিলার, স্মাগলার বা উৎপাদনকারীকে? রক্ষা করতে পেরেছেন লাখো অ্যাডিক্টকে? ওই কাজ করতেই ভিন দেশ থেকে এসেছে অনেকে। তাদের ভেতর আমিও একজন। আপনার পছন্দ না-ও হতে পারে আমার পেশা, কিন্তু জেনেবুঝে আমিও কোনও অপরাধ করিনি এবং করব না। এতে আপনি সন্তুষ্ট না হলে আমার কিছুই বলার নেই।’

রানা দেখল হাসছেন বৃদ্ধ, তাতে মুখে পড়েছে হাজারখানেক ভাঁজ। কিন্তু তাতে তাঁকে আরও কমবয়সী মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকের হাসি দেখে রানার মনে হলো, ওকে পছন্দ করে ফেলেছেন বৃদ্ধ।

‘আপনি কি আমার পেছনে কাউকে রেখেছেন?’ জানতে চাইল রানা।

‘অবশ্যই।’

‘নাক ভাঙা এক মাঝবয়সী, কপালে কাটা দাগ?’

মাথা নাড়লেন সেং। ‘না। আমার দু’জন মহিলা।’ ভুরু উঁচু করলেন তিনি। ‘জানেন, বেশিরভাগ মানুষ মনে করে, কেউ তার পিছু নিলে, সে হবে পুরুষ। ওটা ভুল চিন্তা। আমি সবসময় ব্যবহার করি মহিলা। ধরতে পেরেছেন তাদেরকে?’

‘একজনকে দেখেছি। লম্বা চুল। ব্যবহার করে নতুন হোণ্ডা মোপেড। পরনে নীল শার্ট আর জিন্স, নাইক জুতো। দুর্দান্ত লোভনীয় ফিগার।’

মাথা দুলিয়ে বললেন সেং, 'ওকে বকে দেয়া হবে। ...এবার বলুন, মিস্টার রানা, আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

'আপনার মতামত জানতে চাই,' বলল রানা। 'আপনি মিস ওয়াকারের কাছ থেকে জেনেছেন, কুয়েন আন টু নামের এক লোকের ব্যাপারে তথ্য দরকার আমার। সে ভিয়েতনামে আছে বা নেই, তা জানতে চাই। যদি থেকে থাকে, তা হলে কাদের সঙ্গে মিশছে সে?'

দেরি না করে জবাব দিলেন লেং সেং, 'বলা কঠিন বর্তমানে সে কোথায়। ধরে নিতে পারি এ দেশে নেই। গতকাল মারিয়ার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছে। নতুন করে কুয়েন আন টুর বিষয়ে তদন্ত করছি। গুজব শোনা গেছে, সে আছে ক্যামবোডিয়ায়। নতুন করে জড় হচ্ছে খেমার রুয বাহিনী, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বেআইনী সব কাজে সহায়তা দিচ্ছে। আদালতের সমন জারি না হলেও মনে করি না চট্ করে আসবে এ দেশে। বহু লোকের সঙ্গে খাতির আছে তার। হতে পারে ওই নাক ভাঙা তার হয়ে পিছু নিচ্ছে।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বলল রানা, 'আপনার সহায়তার কথা মনে রাখব, মিস্টার সেং। কাজেই এরপর থেকে যা ঘটবে, তা জানিয়ে দেব আপনাকে। সরাসরি নিজে, বা অন্য কারও মাধ্যমে।'

রানার হাত শক্ত করে ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন লেং সেং। নরম সুরে বললেন, 'আপনাকে বিশ্বাস করি। পিছু নেয়া বন্ধ করা হবে। এরপর কাউকে অনুসরণ করতে দেখলে বুঝবেন, সে আমার লোক নয়। মনে রাখবেন, রানা, ভিয়েতনাম এখনও বিপজ্জনক দেশ। তার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক ক্যামবোডিয়া। দয়া করে চোখ রাখবেন মারিয়ার ওপর, কোনও বিপদে না পড়ে যায়। সত্যিই খুব ভাল মেয়ে ও।'

'আমার সাধ্য মত দেখব,' কথা দিল রানা।

বিশ

'যথেষ্ট দক্ষ,' বলল রেমারিক। 'সেরা দলের একজন।'

মাথা দোলাল রানা। 'সরকার থেকে চোখ রাখা হয়নি। টোপ যে বা যারা দিয়েছে, সে বা তাদের তরফ থেকে এসেছে।'

হোয়া দাই স্ট্রিটের এক ক্যাফের পেভমেন্টে বসে আছে ওরা। কমিউনিস্ট আমলের বেশিরভাগ সময়ে যেভাবে স্থবির হয়ে ছিল ভিয়েতনামের রাজধানী, সে-তুলনায় অনেক ব্যস্ত সড়ক। এইমাত্র নাস্তা শেষ করেছে রানা ও তার বন্ধুরা। আলাপ করছে, গত দু'দিন খুব সতর্ক হয়ে ওদের পিছু নিচ্ছে যে লোকটা, তাকে নিয়ে।

'পেশাদার,' প্রশংসার সুরে বলল রানা। 'কাজ করছে একা। বারবার পাল্টে নিচ্ছে ছদ্মবেশ। মোটেও প্রকট নয়। সাধারণ মানুষ বুঝবেও না জুটে গেছে লেজ। পাল্টে ফেলছে হাঁটার ভঙ্গি। খুঁড়িয়ে হাঁটছিল গতকাল। আজ সুস্থ। সরাসরি তাকায় না কখনও। দূরত্ব রাখে, উধাও হয়ে গিয়ে আবারও হাজির হয় পরে।'

'ওর ব্যাপারে কী ভাবছ?' জানতে চাইল রেমারিক।

চিন্তিত ভঙ্গিতে কফির কাপে চুমুক দিল রানা। চট্ করে দেখে নিল লোকটাকে। রাস্তার ওদিকে এক খাবারের দোকানে ঢুকে খাচ্ছে বাটি ভরা নুড্ল্স্। পরনে কালো ব্যাগি প্যান্ট, সাদা টি-শার্ট, মাথায় চ্যাপ্টা টুপি। লাখ লাখ ভিয়েতনামি কৃষকের মতই

পায়ে টায়ারের চপ্পল। চট্ করে সবার ভেতর খুঁজে বের করা কঠিন।

'আজ রাতে তুলে নেব,' বলল রানা, 'জানা যাবে কে পাঠিয়েছে। গাড়ি ভাড়া করতে হবে সন্ধ্যার দিকে।' রাস্তার এদিক ওদিক দেখল রানা।

'আমরা খুঁজছি এমন এক ছেলেকে, যে সম্ভবত মারা গেছে চার বছর আগে,' বলল রেমারিক, 'সেজন্যে ছুটে এসেছ দুনিয়ার আরেক মাথা থেকে। যে রানাকে চিনি, তার সঙ্গে তোমাকে মেলাতে পারছি না।'

জবাব দিল না রানা। ওর হাতের ইশারায় খালি কফির পট সরিয়ে নিয়ে নতুন কফি ভরা পট দিয়ে গেল ওয়েটার। দু'জনের কাপে কফি ঢেলে তার ভেতর চিনির কিউব ফেলল রানা। 'আগে কফিতে চিনি নিতাম না। তারপর একবার ভুল করে কফিতে চিনি দিল এক ওয়েটার। মনে হলো খেলে ক্ষতি কী।' চুপ হয়ে গেল রানা।

'তো?' কৌতূহল নিয়ে তাকাল রেমারিক।

'বুঝতেই পারছ, সময়ে মানুষ পাল্টে যায়,' শ্রাগ করল রানা।

হেসে ফেলল রেমারিক। 'তো বলতে চাও, তুমি মিষ্টি ছেলে হয়ে গেছ?'

হাসল না রানা। 'না, তা নয়। তবে তোমার মত তিতকুটে মন নিয়ে কোনওমতে বেঁচে আছি, তা-ও নয়। কৌতূহল মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। জানতে চাই বেঁচে আছে কি না জর্জ হার্টিগান। আর কেন টোপ ঝুলিয়ে ডাকা হচ্ছে আমাকে।' বন্ধুর দিকে তাকাল রানা। 'আমি না হয় কৌতূহলী, কিন্তু তুমি কেন এলে, ভিটেলা?'

কাঁধ ঝাঁকাল প্রাক্তন মার্সেনারি। 'বিরক্ত হয়ে গেছি। প্রতিদিন রেস্তোরাঁয় সার্ভ করছি একই ধরনের কাস্টোমারকে। টিভিতে

দেখছি প্রায় একই রকম ধাক্কাধাক্কি ফুটবল খেলা। খবরে পড়ছি, প্রতিদিন চুরি করে আরও মোটা হয়ে উঠছে রাজনীতিকদের হাণ্ডু-ভরা পেট। বলতে পারো, একাকী বোধ করছিলাম। যখন বললে এশিয়ায় আসবে রহস্যময় এক কাজ হাতে নিয়ে, মনে পড়ল অতীতের আমাদের সেই দামাল সময়ের কথা। খারাপ সময় ছিল, কিন্তু বিরক্তি ছিল না মনে।' মৃদু মাথা কাত করে অনুসরণকারীকে দেখাল রেমারিক। 'কাজের কথায় আসি, আজ রাতে কখন আর কীভাবে ওই লোককে তুলে নেব?'

'সন্ধ্যার পর খুব ভদ্রতার সঙ্গে বলবে, তোমার সঙ্গে গাড়িতে করে একটু ঘুরতে যেতে হবে ওকে,' নিচু স্বরে বলল রানা।

মুচকি হাসল রেমারিক। 'সবসময় ভদ্রভাবেই কথা বলি।'

রাস্তার দিকে তাকাল ওরা। ওদিক থেকে আসছে মারিয়া। পেছনে লারসেন ও ফুলজেন্স। ওরা পৌঁছে যেতে উঠে দাঁড়িয়ে মারিয়ার জন্যে চেয়ার টেনে দিল রানা। ওকে দেখছে রেমারিক, চোখে হাসি। বুঝতে দেরি হয়নি, সুন্দরী মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে ওর বন্ধুর।

রানাকে 'থ্যাংক ইউ' বলে চেয়ারে বসল মারিয়া, অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। 'এত গরম পড়েছে, উহ্!' ওয়েটারের দিকে তাকাল। 'বরফের মত ঠাণ্ডা পানি পাব?'

'ওঁর জন্যে বরফ দেয়া তাজা কমলার জুস,' অর্ডার দিল রানা। অন্যদের জন্যে চাইল বিয়ার।

মাথা দুলিয়ে রওনা হয়ে গেল তরুণ ওয়েটার।

মারিয়ার পরনে সবুজ, কাঁচা লেবু রঙের শর্ট-স্লিভ ড্রেস। পেটের অংশ খালি। ফ্লুরেসেণ্ট বাতির মত জ্বলজ্বল করছে ফরসা ত্বক। কাঁধ, হাত ও লোভনীয় ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম।

একবার ওকে দেখে নিয়ে ডেইন গোয়েন্দার দিকে ফিরল রানা, 'পিটার, আজ রাতে মারিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্ব তোমার

হাতে। আমি বেরোব ফুলজেন্সকে নিয়ে।'

'কোনও সমস্যা নেই,' বলল লারসেন, 'কিছু ঘটছে বলে মনে হচ্ছে!'

'যে পিছু নিয়েছে, তাকে তুলে নেব,' বলল রানা। 'জেনে নেব কার হয়ে কাজ করছে। আমরা এখন জানি, কর্তৃপক্ষ বা লেং সেঙের লোক নয় সে। যে নাকের কাছে মুলো ঝুলিয়ে আমাকে এখানে এনেছে, তার লোক। আজ হোটেলে মারিয়া আর তুমি ডিনার সারলে ভাল হয়, পিটার। বাইরে যাওয়া উচিত হবে না।'

'আপনি ভাবছেন মুখ খুলবে ওই লোক?' জানতে চাইল মারিয়া।

চট্ করে রেমারিককে দেখে নিয়ে বলল রানা, 'আমরা বোঝাব, যেন ভুল না করে।'

'তার মানে, দরকার পড়লে নির্যাতন করবেন আপনারা?'

সামনে ঝুঁকল রেমারিক। 'তার দরকার পড়বে বলে মনে করি না। বেশিরভাগ সময় মানসিক চাপ তৈরি করি আমরা।'

'আর যদি মানসিক চাপে কাজ না হয়?'

'বাধ্য হলে বহু কিছুই করতে হয়,' বলল রানা। 'প্রথম, এবং মূল কথা: জানতে হবে কে ওকে লাগিয়ে দিয়েছে পেছনে। নইলে এক পা-ও এগোতে পারব না।'

মুখ নিচু করে কী যেন ভাবছিল লারসেন, মাথা তুলে বলল, 'রানা, আমার মনে হয়, ভুল তথ্য দেয়ার জন্যে পাঠানো হয়েছে ওই লোককে।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'হতে পারে। ভেবে দেখেছি। কিন্তু সম্ভাবনা কম। ভুল খবর দেয়ার জন্যে লোক ভাড়া করলে এর মত পেশাদার কাউকে ব্যবহার করত না। এমন একজনকে বেছে নিয়েছে, যে নিজের কাজে প্রায় নিখুঁত। আমার ধারণা, এ টোপ নয়। যাই হোক, সব বোঝা যাবে আজ রাতেই।'

ড্রিঙ্ক টেবিলে পৌঁছতে জুসের গ্লাস তুলে নিল মারিয়া। অর্ধেক জুস শেষ করে রানার দিকে তাকাল। 'ওই লোক যদি ইংরেজি না জানে, তখন? আজকাল ইংরেজি ব্যবহার করে না এ দেশের বেশিরভাগ মানুষ। স্কুলেও চাপ নেই শেখার। শুধু সরকারী চাকরি চাইলে শিখতে হবে। কিন্তু এই লোক সরকারী চাকুরে না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে হয়তো জানেই না ইংরেজি। আপনারা ভিয়েতনামিয ভাষা জানেন, রানা?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। চেহারা দেখে মনে হলো, জীবনে মস্ত পাপ করেছে। নিচু স্বরে বলল, 'এই দেশে ছিলাম বড়জোর এক কি দেড় মাস। শেখার সময় ছিল না। দু'চার কথা বলতে পারি, কিন্তু বলতে গেলে বুঝিই না কিছু। এ ব্যাপারটা আগেই ভেবেছি, কুচ-কুচ ইয়াং বারের কুলজাত সিঙের সাহায্য নেব। সে হয়তো জোগাড় করে দেবে ভাষান্তরিক।'

চেহারায় দ্বিধা নিয়ে চুপ করে আছে রেমারিক।

'ওই ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না,' বলল মারিয়া। 'আমি নিজেই যাব আপনাদের সঙ্গে।'

নীরব দীর্ঘ একটা সময় পেরিয়ে গেল। তারপর মন্তব্য করল লারসেন, 'ওখানে গোলাগুলিও হতে পারে। আপনি ইউএস সরকারের কর্মকর্তা, তা মাথায় রাখতে হবে। আপনার কোনও ভুল পেলে হাউমাউ করে উঠবে ভিয়েতনাম সরকার আর খবরের কাগজ।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল মারিয়া, 'আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন আপনাদেরকে সহায়তা করি। কী করতে পারব, আর কী পারব না, তা বলে দেয়া হয়নি।' রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। 'বিপদের ঝুঁকি কতটা, মিস্টার রানা?'

'খুব কম। এ ধরনের কাজে অভ্যস্ত রেমারিক আর আমি। তা ছাড়া, ওই লোক জানেও না আমরা ওকে চিনি। ওর সঙ্গে যদি

পিস্তল বা ছোরা থাকেও, সেসব ব্যবহারের সুযোগ পাবে না বললেই চলে।'
www.boighar.com

'এক কাজ করা যায়, আমরা দু'জন প্রথমে তুলে নিয়ে যাব ওকে,' বলল রেমারিক, 'তারপর যদি দেখি সে ইংরেজি বোঝে না, তখন ডেকে নেব মিস ওয়াকারকে।'
www.boighar.com

মাথা নাড়ল রানা। 'জটিলতা এড়াতে হবে। এখনও ঠিক করিনি কী ধরনের প্ল্যান করব, কিন্তু একবার তুলে নেয়ার পর শহর থেকে দূরে কোথাও সরিয়ে নেব। যা করার চট্ করে করতে হবে। মারিয়া চাইলে, প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে।' কাঁচের প্রতিবিম্বে ফেউকে দেখল রানা। সিদ্ধান্ত নিল। 'ঠিক আছে, আমাদের সঙ্গে যাবে মারিয়া।'

একুশ

মস্ত বিছানায় বিকৃত ফুর্তির শীৎকার ও ব্যথায় গোঙাচ্ছে উলঙ্গ দায়না বেলগুতাই। ওর কোমরে চেপে বসেছে এক হালকা-পাতলা কিশোরী মেয়ে, ঝোড়ো হাওয়া এলেই যেন উড়ে যাবে শুকনো পাতার মত। কিন্তু তার হাতের আঙুল যেন ইস্পাতের, গেঁথে যাচ্ছে দায়নার ঘাড় ও কাঁধের মাংসপেশির ভেতর।

চমৎকার বিকেল। আধঘণ্টা আগে হোটেলে উঠেছে দায়না। সুইটে অপেক্ষা করছিল বরফ-ঠাণ্ডা, ফ্যাকাসে লাল শ্যাম্পেন আর মস্ত বাউল ভরা নানান ফলমূল। শ্যাম্পেনের বোতল খুলে কয়েক চুমুক দেয়ার পর ইণ্টারকম তুলে চেয়েছে ম্যাসাজের জন্যে মেয়ে।

ছোট ব্যাগ হাতে হাজির হয়েছে সাদা কোট পরা কিশোরী। দায়না পোশাক খুলে ফেলার সময় নিজেও খুলে ফেলেছে কোট, চিতার মত ক্ষিপ্র দেহে শুধু সাদা প্যান্টি। ব্যাগের ভেতর থেকে বের করেছে নানান ধরনের তেল।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ার আগে মেয়েটাকে এক গ্লাস শ্যাম্পেন দিয়েছে দায়না, আগেই তাকে বুক করেছে একঘণ্টার জন্যে। গত পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে দক্ষ হাতে ওর শরীর ডলেছে সে। রীতিমত ব্যথা লাগছে এখন। বুঝতে পারছে দায়না, শিথিল হয়েছে সারাশরীরের মাংসপেশি। কাত হয়ে শুয়ে থাই ভাষায় বলল, 'এবার আস্তে করে। মনে করো আমি আসলে বেড়াল।'

তাতে হাসল কিশোরী, পাল্টে গেল ইস্পাত-শক্ত আঙুলের চলন। ব্যথা দেয়ার বদলে তেল-মসৃণ মাংসপেশিকে আরাম দিচ্ছে।

মন-শরীর জুড়িয়ে গেছে, টের পেল দায়না। একবার ভাবল, মৃত স্বামীর কথা। কঠিন মনের লোক ছিল। প্রায় ওর মতই নিষ্ঠুর। কিছু আদায় করতে চাইলে, তার সারাশরীর ম্যাসাজ করে দিত ও। একটু আগে যে কঠিন ব্যথা সহ্য করেছে, তেমন করেই ব্যথা দিত স্বামীকে, তারপর দিত নরম মালিশ। তাতে গলে পড়ত লোকটার মন, চলত ওর আঙুলের ইশারায়। নানান দিক থেকেই সে ছিল ওর জন্যে আদর্শ। যদি না অন্য মেয়ের দিকে হাত বাড়াত, আজও বেঁচে থাকত। মাঝে মাঝে আফসোস করে দায়না, স্বামীর প্রতি অত প্রবল ঘৃণা না জন্মালেই বুঝি ভাল ছিল। তার হৃৎপিণ্ড ফেড়ে দিয়েছিল ছোরা দিয়ে। তখনই স্থির করেছিল, আর কখনও খুব কাছে আসতে দেবে না কোনও পুরুষকে। এরপর থেকে ফুর্তি করেছে বহু পুরুষকে নিয়ে, কিন্তু তাদেরকে রেখেছে হাতের মুঠোয়। নিজের পছন্দ মত পরিবেশ না পেলে কখনও মিলিত হয়নি।

ওর নিতম্ব ডলছে কিশোরী। উপুড় হয়ে আরাম নিচ্ছে দায়না। ভাবতে লাগল বর্তমান পরিস্থিতি। মুনাফার জন্যে খেমার রুযের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছে। ওর জন্ম হয়েছে পাকা ব্যবসায়ী হিসেবে। নতুন করে যুদ্ধ আরম্ভ হলে হাজার কোটি ডলার আসবে হাতে। ইতিমধ্যেই ড্রাগ ও অন্যান্য বেআইনী মালপত্র বিক্রি করে জাপানের ব্যাঙ্কে জমা করেছে লাখ লাখ ডলার। ভবিষ্যতে আরও জমবে, তখন বিনিয়োগ করবে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে। এরই ভেতর প্যারিসে মস্ত এক ভিলা কিনেছে। নিউ ইয়র্কের ফিফথ অ্যাভিন্যুতে বাড়ি। নতুন করে খেমার রুয বাহিনীর লোক জড় করলে, আগামী কয়েক বছরে ইংল্যাণ্ডের রানির চেয়েও বড়লোক হয়ে উঠবে ও।

মাসুদ রানাকে শেষ করে দেয়ার পর, নিজের হেডকোয়ার্টার সরিয়ে নেবে প্যারিসে। ঢুকে পড়বে ফরাসি সমাজে। কে জানে, হয়তো নামমাত্র কোনও ফরাসি উপস্বামীও রাখবে। অবশ্য তাকে হতে হবে সরকারী দলের লোক, বা বড় ব্যবসায়ী। বিত্ত ও রূপের জোরে উঁচু সমাজে উঠতে সমস্যা হবে না ওর। সরবোন ইউনিভার্সিটিতে ল্যাঙ্গুয়েজ, ফিলোযফি ও আর্টের ওপর মাস্টার্স কমপ্লিট করেছে। আলাপ শুরু হলে যে-কোনও আঁতেলকে কাত করে ফেলে দিতে পারবে। ক্ষমতার স্বাদ চাইছে এমন যে-কোনও পুরুষের মনে হবে, ওকে বিয়ে করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বিয়ের কথা উঠলে নিজের খুশিমত পুরুষ বেছে নেবে ও। তাকে বলে দেবে, যত খুশি প্রেমিকা নিয়ে বিছানায় যাও, আমার নিজের প্রেমিকদের নিয়ে একটা কথাও বলবে না। পারস্পরিক সুবিবেচনা থাকবে দু'জনের ভেতর। যখন খুশি বেড়াতে যাবে নিউ ইয়র্কে। কখনও গোপন রাখবে না দৈহিক প্রেমের বিষয়ে, যার যা খুশি বলুক, কী যায় আসে!

নিতম্বের ওপর পৌঁছে গেছে কিশোরীর আঙুল। সামনে ঝুঁকে

ফিসফিস করে কী যেন জিজ্ঞেস করল।

আস্তে করে মাথা নাড়ল দায়না। আপাতত বিশেষ আদর চাই না তার। পরে সেসব করিয়ে নেবে প্রেমিককে দিয়ে। আর একজন প্রেমিক কেন, ব্যবহার করবে দুটো প্রেমিক। কাত হয়ে গড়িয়ে গিয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল দায়না। নিজের এক গাদা বোতল কুড়িয়ে নিয়ে ব্যাগে তুলল কিশোরী, পরে নিল সাদা কোট। সে পেল কল্পনার চেয়েও বেশি— পুরো পাঁচ শ' ইউএস ডলার।

সুইট থেকে কিশোরী বেরিয়ে যাওয়ার পর গ্লাস ও বরফ ভরা বাকেটে শ্যাম্পেন নিয়ে মার্বেলে মোড়া বাথরুমে গিয়ে ঢুকল দায়না। এমন তপ্ত শাওয়ার নিল, বেশিরভাগ মানুষ সহ্য করতে পারে না অত তাপ। ঝরঝর করে গরম পানি পড়ছে, তার ভেতর অনেকক্ষণ ভিজল দায়না। তারপর বাথটাবে নেমে বাটন টিপে ফেনিল করে নিল পানি। সেখানে শুয়ে আবারও ভাবতে লাগল মাসুদ রানার কথা।

চার বছর!

একেকটা দিন ছিল যেন একেকটা বছর!

চুপচাপ অপেক্ষা করেছে। অর্জন করেছে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বিত্ত। নতুন করে গুছিয়ে নিয়েছে বাবার সংগঠন। কুকুর রানার জন্যে তৈরি করেছে টোপ ও ফাঁদ। চরম শাস্তি দেবে ওই শুয়োরটাকে। মাসুদ রানাকে এমনভাবে নির্যাতন করে তিলতিল করে খতম করবে, যাতে শান্তি পায় ওর বাবার বিদেহী আত্মা। সব গুছিয়ে ফেলেছে। শ্যাম্পেনে বড় চুমুক দিয়ে নতুন করে বর্তমানে ফিরল দায়না। একঘণ্টা পর হয়ে উঠবে পাকা শিকারী— জাল পেতে ধরবে অন্তত দু'জন পুরুষকে।

'কিন্তু আবারও ফালতু কোনও ম্যাসাজ পার্লারে গিয়ে প্রতারিত

হতে চাই না,' রাগ নিয়ে চাচাত ভাই অ্যাডোনেডকে বলল এইমে। 'পার করেছি পুরো চার দিন তিন রাত, আর প্রতি দিন বলছ এরপর ভাল কোথাও যাবে। আমি কি মোটা জার্মান সেক্স-টুরিস্ট, সাধারণ কোনও মেয়ের সুড়ঙ্গে ঢুকলেই খুশি! আমার বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ, দেখতে ভাল, যথেষ্ট বড়লোক, শরীর শোয়ার্যনেগারের মত— মোট কথা, আমার দৈহিক ফুর্তির জন্যে চাই এই দেশের সেরা সুন্দরীকে!'

চাচাত ভাইয়ের কথা শুনে হাসল অ্যাডোনেড। বয়সে চার বছরের বড় সে। আগেও এসেছে এশিয়ার বেশ কয়েকটি শহরে। প্রথমবার এসেছে এইমে। প্যারিসে নিজেদের পারিবারিক ব্যবসার জন্যে এ দেশ থেকে নেবে ওরা কয়েক হাজার থান সিল্ক কাপড়। দুই ভাই প্রেমিকা বা স্ত্রীকে ভালবেসে নয়, সামাজিক অবস্থান আরও নিশ্চিত করতে বিয়ে করেছে ফ্রেঞ্চ উঁচু সমাজের দুই পরিবারে। আগেও সুযোগ পেলেই দেশের বাইরে এসে যা খুশি করেছে অ্যাডোনেড। তার বর্ণনা দিয়েছে ছোট ভাই এইমেকে। ফলে এবার দেশের বাইরে এসে পাগল হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু অ্যাডোনেড জানে, এখনও কিছু আদর্শ আঁকড়ে রেখেছে এইমে। সেক্সের জন্যে পয়সা দেবে না কাউকে। তাতে গর্বে আঘাত লাগবে ওর। এইমে যখন নিউ ইয়র্ক বা লণ্ডনে ঘুরতে যায়, ওর ফরাসি কায়দা বা আচরণ দিয়ে বেশিরভাগ সময় জোগাড় করে ফেলে বিছানায় যেতে আগ্রহী মেয়ে। পরে দেখা যায় দু'জনই সন্তুষ্ট।

অ্যাডোনেড মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হংকং, টোকিও বা ব্যাংককের ব্যাপার আলাদা। চাইলেই ভাল মেয়ে পাবে না। একেবারে পাবে না, তা-ও নয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে মিশতে হবে তাদের সমাজে। হাতে সময় নেই বলেই তোমার সে সুযোগ নেই। তবে কোনও টুরিস্ট মেয়ে সস্তা হোটেল থেকে আমাদের

দামি হোটেলে উঠতে চাইলে, তবে না তাকে ভোগ করার সুযোগ দেবে। অথবা জোগাড় করতে হবে বিধবা আমেরিকান মহিলা। সেক্সের জন্যে পাগল ওরা।' একটু দূরে ককটেল নিয়ে বসেছে নীল পোশাক পরা দুই মেয়ে, চোখের ইঙ্গিতে তাদেরকে দেখাল অ্যাডোনেড। 'ওদের কেউ হলে চলবে?'

তিক্ত চেহারা করল এইমে, ঝট্ করে সরিয়ে নিল মাথা। তখনই চোখ পড়ল বার-এর দরজায়। সোজা হয়ে বসে ফিসফিস করে বলল চাচাত ভাইকে, 'ওই মেয়ে, খেয়াল করো!'

বার স্টুলে চরকির মত ঘুরে বসল দুই চাচাত ভাই।

ওই মেয়ে যেভাবে মস্ত ঘরে ঢুকেছে, যেন হোটেলের মালকিন সে। দীর্ঘাঙ্গিনী, তামার মত ত্বক, কোমরে নেমেছে কালো চুল, স্ট্র্যাপলেস ড্রেস আঁকড়ে রেখেছে দেহের লোভনীয় প্রতিটা বাঁক।

'ড্রেসটা লেগারফিল্ড,' মন্তব্য করল অ্যাডোনেড। 'বসন্তের কালেকশনে দেখেছি।'

মুগ্ধ এইমে বিড়বিড় করে বলল, 'ড্রেসের কথা বাদ দাও, দুর্দান্ত ওই শরীরটা চেয়ে দেখো!'

বার থেকে তিরিশ ফুট দূরের এক টেবিলে বসল দায়না বেলগুতাই। সঙ্গে সঙ্গে ওর জন্যে শ্যাম্পেন ককটেল নিয়ে ছুটে এল এক ওয়েটার।

'আগেও এখানে এসেছে,' বলল এইমে। 'এমন কী অর্ডারও দিতে হয়নি।'

'দিবাস্বপ্ন দেখা বন্ধ করো,' বলল অ্যাডোনেড। 'এ ধরনের মেয়েরা একা বাইরে বেরোয় না। কারও জন্যে অপেক্ষা করছে। হয় স্বামী, নইলে বয়ফ্রেণ্ড।'

দমে যাওয়ার লোক নয় এইমে, নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয়, মেয়েটা থাই?'

'উঁহুঁ। ইউরোশিয়ান। মস্ত বড়লোক। যে ড্রেস পরেছে, দাম

কমপক্ষে বারো হাজার ডলার। গলার নেকলেস বা কানের রিঙের হীরাও আসল। সোনার রোলেক্স ঘড়িটাও নকল না। থাইল্যাণ্ডের চোরাই মার্কেটে এসব বিক্রি হয় না।'

মস্ত ঘরের চারপাশে ক্ষুধার্ত প্যান্থারের মত চোখ বোলাচ্ছে দায়না। বিশেষ করে দীর্ঘ বার কাউন্টারের কাছে বসেছে অনেকে। ব্যাংককের নামকরা সব হোটেলের বার-এর মতই, নব্বুই ভাগ কাস্টোমার পুরুষ। তাদের বড় অংশ বৃদ্ধ আর মোটা। পরনে বিলাসবহুল স্যুট, চেহারায় বিরক্তি।

দুই ফ্রেঞ্চ যুবককে পছন্দ হলো দায়নার। খুব কমবয়সী নয় তারা, আবার প্রৌঢ়ও নয়। পরনে দামি পোশাক। বড়টার নাক একটু ঈগলের চঞ্চুর মত ঝুঁকে এলেও, সব মিলে ওই দু'জনকে সুদর্শনই বলা চলে। চেহারা দেখে দায়নার মনে হলো, ওরা ভাই। তাতে সুড়সুড় করে উঠল ওর তলপেট। দারুণ হয় দুই ভাইকে একইসঙ্গে বিছানায় তুললে!

বার-এর দিকে ফিরেছে তারা। দায়না খেয়াল করল, আয়নায় চোখ রেখে ওকেই দেখছে। শুরু হলো দু'পক্ষের নীরব আহ্বান। দু'ভাই পিঠ আড়ষ্ট করে বসে আছে স্টুলে। কমবয়সী যুবক একহাতে ঠিক করে নিল চুল, তারপর কোটের পকেটের ঘিয়ে রঙের রুমালটা জায়গামত রাখল।

'পনেরো মিনিট,' ভাবল দায়না। 'এরই ভেতর পরিচিত হতে আসবে যে-কোনও জন।' চট্ করে দেখে নিল রোলেক্স।

দশ মিনিট পর স্টুল ছেড়ে মেন্স রুমের উদ্দেশে গেল কমবয়সী জন। কিছুক্ষণ পর ফেরার সময় গেল দায়নার টেবিল ঘেঁষে। লোভী চোখে দেখল ওকে। বার-এ বড় ভাইয়ের সঙ্গে ফিসফিস করে কী যেন আলাপ চলল, ফিরে এল দায়নার টেবিলের সামনে, বাউ করে বলল, 'সেনোরিটা, আমি এইমে

মার্সেল, এসেছি মার্সেইল্স্ থেকে।'

একবার হাতঘড়ি দেখে নিয়ে হেসে বলল দায়না, 'তুমি এক মিনিট পর এলে, এইমে।'

নদীর তীরে ফ্রেঞ্চ রুফটপ রেস্তোরাঁয় ডিনারে বসল ওরা। একটু অবজ্ঞার ভঙ্গি নিয়েছে অ্যাডোনেড, চাইছে অল্প কথায় মুগ্ধ করতে। রীতিমত ব্যগ্র এইমে।

চেয়ারে বসেছে পাঁচ মিনিটও হয়নি, এমন সময় দায়না টের পেল, ওর হাঁটু স্পর্শ করছে পাগলাটে ফ্রেঞ্চ এইমের পা। ঊরু ফাঁক করে বসল দায়না। বুঝে গেছে, দু'ভাইয়ের ভেতর আলাপ শেষ, প্রথম সুযোগ এইমের। এ কারণেই অ্যাডোনেডকে বেশি গুরুত্ব দিল দায়না। কথায় কথায় বলল, ও থাকে রোমে। ওর বাবা ইতালিয়ান কূটনীতিক, মা ক্যামবোডিয়ার রাজবংশের মেয়ে। হেসে বলল, 'কখনোই ভাবি না আমার দেহে রাজকীয় নীল রক্ত আছে। থেকে থাকলেও আছে এক মিলিলিটার। বলতে পারেন, রাজবংশের দূর সম্পর্কের আত্মীয় আমি।'

এ কথা শুনে আরও আগ্রহী হয়ে উঠল দুই ভাই। এসব শুনে খুশি হয় পুরুষরা। সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে আছে আভিজাত্য, আর কপাল ভাল হলে, মিলিত হওয়ার সুযোগ দেবে এমন সুন্দরী!

দায়না বলল, ব্যাংককে এসেছে বাবার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু আপাতত জাতিসংঘের এক মিশনে ব্যস্ত তিনি, গেছেন ইন্দোনেশিয়ায়। ছোটবেলা থেকেই স্বাধীন মনের মেয়ে, তাই বাবাকে বলে উঠেছে ওরিয়েন্টাল হোটেলে। দু'ভাইকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, গত দু'চার দিনে হয়ে উঠেছে মহাবিরক্ত। ব্যাংকক আসলে পুরুষদের শহর, চাইলেই একা নাইট ক্লাবে যাওয়া কঠিন। তিক্ত হেসে বলল দায়না, ওর মনে হচ্ছে বন্দি হয়ে গেছে ছোট্ট এক খাঁচার ভেতর। একথা শুনে চট্ করে পরস্পরের দিকে তাকাল দু'ভাই।

মনে মনে হাসল দায়না। ক্যাভিয়ার অর্ডার দিল, তারপর বাচ্চা ভেড়ার প্রোভেনসেল। দুই ভাইও নিল ক্যাভিয়ার, তারপর ভাগ করে নিল গরুর পুরু স্টেক, সঙ্গে বিয়ের্নেইস সস। গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে এক বোতল শ্যাতো লাতুওর ১৯৭১ অর্ডার দিল অ্যাডোনেড।

দায়নার ইচ্ছে মত চলছে সব। ওর উরুর ভেতর অংশ স্পর্শ করছে এইমের হাতের আঙুল। খেয়ালই করছে না, এমন ভঙ্গি নিল দায়না। নিজে পা দিয়ে আলতো টোকা দিল অ্যাডোনেডের হাঁটুতে।

দু'ভাই বুঝতে পারছে, পাড়ি দিতে পেরেছে অনেক পথ। বারকয়েক লবণ ও মরিচ নেয়ার জন্যে ঝুঁকে উদ্যত স্তন দেখিয়ে দিল দায়না। লো কাট ড্রেস পরেছে এ জন্যেই তো। ভেতরে ব্রা নেই। গভীর মনোযোগে পুরুষ্টু স্তন দেখল দু'ভাই, যেন দেখছে দুর্দান্ত কোনও টেনিস ম্যাচ। আরও কিছুক্ষণ পর ডেযার্টের ট্রলি এলে ফালি করা কলা নিল দায়না। এতই আয়াস করে খেতে লাগল, উত্তেজিত হয়ে দম আটকে আসতে চাইল এইমের। দায়নার উরুর গোপন অংশে হাত বোলাতে শুরু করেছে ও। ওদিকে দায়নার বাম হাঁটুর ওপর মৃদু টোকা দিচ্ছে অ্যাডোনেড, বুঝিয়ে দিচ্ছে সে কী চায়।

'তোমরা কি বিবাহিত?' জানতে চাইল দায়না।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে থমকে গেল দু'ভাই, পরস্পরকে দেখল। তারপর অ্যাডোনেড বলল, 'আমি বিবাহিত, কিন্তু এইমে অবিবাহিত— ব্যাচেলার হলে যা হয়, ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে!'

হারামজাদা মিথ্যা বলছে! ভাবল দায়না। গায়ে এখনও বউয়ের শরীরের গন্ধ! বড়ভাই সুযোগ করে দিচ্ছে ছোট ভাইকে। তবে তাতে মন খারাপ তার।

কফি ও কনিয়্যাকের অর্ডার দিল ওরা। এক বাক্স সিগার নিয়ে

এল ওয়েটার। মার্সেলরা বেছে নিল হাভানা চুরুট। ওয়েটার বিদায় হচ্ছে দেখে তাকে ডাকল দায়না, তার কাছ থেকে নিল কালো ব্রাযিলিয়ান চুরুট। অবাক হয়ে ওকে দেখছে অ্যাডোনেড ও এইমে। ক্লিপ দিয়ে চুরুটের শেষমাথা কেটে ওটা ওর কনিয়্যাকের গ্লাসে চুবিয়ে দিল দায়না। কয়েক সেকেণ্ড পর ভেজা চুরুট তুলে ঝুলিয়ে নিল লাল ঠোঁটে। সামনে ঝুঁকে ওয়েটারের লাইটার দিয়ে জ্বেলে নিল চুরুট।

'খুব মজা পাই এটা করলে,' দু'ভাইকে বলল দায়না, 'খাওয়া শেষে কড়া চুরুট।'

বিস্ময় গোপন করল অ্যাডোনেড ও এইমে।

'আর কিছু ইচ্ছে করে না?' জানতে চাইল ছোটজন।

তার দিকে ধোঁয়া ছুঁড়ে হাসল দায়না। 'তা নয়, এইমে। ডিনারের পর চমৎকার কোনও ম্যাসাজ পেলে মন্দ লাগে না। তারপর ওয়ার্লপুলে গোসল।' অ্যাডোনেডের চোখে লোভ দেখল দায়না। 'পানির স্পর্শ প্রায় সেক্স করার মতই মজার।'

'প্রায়?' আগ্রহ নিয়ে বলল অ্যাডোনেড।

'হ্যাঁ, অ্যাডোনেড, প্রায়। আমি স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। ম্যাসাজ করলে খুশি হই। ওয়ার্লপুল, ভাল ওয়াইন, কড়া চুরুট... আর পুরুষদের পছন্দ করি। সত্যি বলতে ওদেরকে খুব দরকার আমার। খাবারের চেয়ে কম জরুরি নয় সেক্স। এক সপ্তাহের বেশি হলো রোমে রেখে এসেছি আমার স্বামীকে। মনে হচ্ছে পুরো এক সপ্তাহ ধরে আমার শরীর ক্ষুধার্ত।' প্রায় ফিসফিস করে বলল দায়না।

কান পেতে শুনতে হয়েছে অ্যাডোনেড ও এইমেকে।

এইমে বলল, 'আমি ফ্রেঞ্চ পুরুষ। আমি যদি তোমার মত এক অদ্ভুত সুন্দরীকে ক্ষুধার্ত রাখি, সে দায় পড়বে আমার দেশের ওপর। এই অপমান সহ্য করতে পারবে না ফ্রান্স।'

'সত্যিই, ভয়ঙ্কর লজ্জার বিষয়,' সায় দিল অ্যাডোনেড। চট্ করে একবার চেটে নিল নিচের ঠোঁট।

দু'ভাইকে দেখে নিয়ে মিষ্টি হাসল দায়না। আদর মাখা কণ্ঠে বলল, 'তোমরা সত্যিই ভদ্রলোক। কিন্তু বড় সমস্যার ভেতর পড়ে গেলাম যে?'

'কী সেই সমস্যা?' প্রায় আঁৎকে উঠে কোরাস তুলল দুই ভাই।

'গত দু'ঘণ্টা ধরে স্থির করতে চাইছি, তোমাদের ভেতর কোন্ জনকে বলব আমার খিদে দূর করাতে। সত্যিই, আমি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি।'

অ্যাডোনেড ও এইমে হতাশ চেহারা করে পরস্পরকে দেখল। আর তখনই বলল দায়না, 'গত কয়েক সপ্তাহ আগে প্যারিসে দুটো ড্রেসের ভেতর ঠিক কোনটা নেব, বুঝলাম না। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হলে খুব অসহায় হয়ে পড়ে মেয়েরা। তখন ভাবতে লাগলাম। তারপর কিনে নিলাম দুটো ড্রেসই।' চেয়ার ছেড়ে উঠে কোমরের কাছে ড্রেস ঠিক করে নিল দায়না। 'আমি আছি সমারসেট মম সুইটে ইচ্ছে হলে আধঘণ্টা পর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারো তোমরা।' ডান হাতে ওয়াইনের বোতল স্পর্শ করল দায়না। 'হয়তো নিয়ে এলে আরেক বোতল শ্যাতো লাতুওর ১৯৭১?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রেস্তোরাঁর দরজার দিকে চলল দায়না।

হতবাক হয়ে বসে আছে দু'ভাই। দশ সেকেণ্ড পর বলল অ্যাডোনেড, 'ব্রাদার এইমে, আজকের রাতটা হবে আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর রাত!'

'ঠিক, বিগ ব্রাদার!'

বাইশ

ফোনে ডায়াল করে মারিয়া ভাবল, কপাল ভাল থাকলে পেয়ে যাবে, এখনও বাসা ছেড়ে অফিসের দিকে রওনা হননি কর্নেল গর্ডন। অফিসে ফোন করলে যে ক্ষতি হবে, তাও নয়, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চাইছে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে। ভদ্রলোকের স্ত্রী ফোন তুলতেই জিজ্ঞেস করল মারিয়া ওয়াকার, 'স্যর কি অফিসে চলে গেছেন?'

'না, এইমাত্র তৈরি হয়েছে,' কিচেন থেকে মোটা গলায় হাঁক ছাড়লেন কর্নেলের স্ত্রী।

বিশ সেকেণ্ড পর লাইনে এলেন কর্নেল। 'হ্যালো।'

'স্যর, মাসুদ রানার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে,' বলল মারিয়া, 'আজ রাতে তুলে নেবে ওয়াচারকে। আমি রাজি হয়েছি সাহায্য করতে। আমার কাজ অনুবাদকের। ফোন করলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে নেয়ার জন্যে।'

কিছু চিবিয়ে খাচ্ছিলেন কর্নেল, কচর-মচর আওয়াজ থেমে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ধরনের কাজে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছ?'

'খোলা লাইনে বলতে চাই না। কিন্তু এক ভিয়েতনামিযের কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করবে মাসুদ রানা। আমার কাজ ভিয়েতনামি ভাষা ইংরেজি করা।'

'কাজটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

‘হতে পারে।’

‘শেষ কবে ছুটি নিয়েছ?’

‘জী?’

‘ছুটি। শেষবার কবে ছুটি নিয়েছিলে?’

‘স্যর, ঠিক বুঝলাম না আপনার...’

কড়া সুরে বললেন কর্নেল গর্ডন, ‘মারিয়া, ভেবে দেখো, শেষবার কবে নিয়েছ ছুটি।’

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল মারিয়া, ‘নয় মাস আগে, স্যর। দু’সপ্তাহ ছিলাম চাচাত বোনের বাড়িতে, ক্যালিফোর্নিয়ায়।’

‘ঠিক আছে, আবারও দু’সপ্তাহের ছুটি দেয়া হলো। অফিসে গেলেই তোমার হোটেলে পাঠিয়ে দেব ছুটির কনফার্মেশন লেটার। বুঝতেই পারছ, ছুটিতে যা করছ, তার সঙ্গে আমাদের ডিপার্টমেন্টের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। ফ্যাক্স পাওয়ার পর থেকে অফিশিয়াল কোনও কাজে থাকছ না। ছুটির ভেতর যা করবে, তার কোনও দায় নেবে না আমাদের অফিস। কাজেই কোনও বিপদে পড়ে গেলে দৌড়ে আসবে না আমার কাছে।’

মৃদু হাসল মারিয়া। ‘ঠিক আছে, স্যর। আপনি যে শুধু দেখতে সুন্দর তা-নন, একটু বুদ্ধিও আছে মগজে। আজ রাতের অপারেশন শেষ হওয়ার পর আপনার বাড়িতে ফোন দেব, তখন খুলে বলব কী হয়েছে।’

‘ঠিক আছে, মারিয়া। সবসময় প্রশংসা করেছি তোমার কমন সেন্সের। আশা করি মস্ত কোনও ভুল করবে না। আর...’

একটু বিরক্তি নিয়ে ফোন রাখল মারিয়া। এইমাত্র শুনতে পেয়েছে টোকার আওয়াজ। দরজা খুলতেই দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীর রানা।

ভুরু উঁচু করে ওর দিকে তাকাল মারিয়া।

‘আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা বলতে এলাম,’ বলল রানা।

পিছিয়ে এল মারিয়া, হাতের ইশারায় দেখাল মিনি-বার। 'কোনও ড্রিঙ্ক?'

মাথা নাড়ল রানা। 'দু'মিনিট লাগবে কথাটা বলতে। আশা করি আমার কথা বুঝতে পারবেন।'

ঘরের কোণে চেয়ারে বসল মারিয়া। 'বলুন।' সিরিয়াস হয়ে গেছে।

পায়চারি করছে রানা, ঘুরেও দেখছে না সুন্দরী মেয়েটাকে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আমাদের কাজে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন, কিন্তু বাস্তবতা বুঝতে পেরেছেন কি না, তা আমার জানা নেই। আজ রাতে ভাল কোনও দৃশ্য দেখবেন না। ভয় দেখাতে হবে এক লোককে। এ কাজ যে আমার ভাল লাগবে, তা-ও নয়। হয়তো ভাববেন, অসহায় এক লোককে অত্যাচার করে আমি খুশি। কিন্তু আসলে তা নয়, এ ছাড়া উপায়ও নেই। তাকে করতে হবে আতঙ্কিত। কিন্তু বাধ্য না হলে তাকে নির্যাতন করব না। আমার ডোশিয়ে দেখেছেন। ভাল করেই জানেন, আমি কোনও সাধু-সন্ত নই। তবে পশু যেন না হয়ে উঠি, সেদিকে খেয়াল রাখি। আজ পর্যন্ত এমন কাউকে খুন করিনি, যে কি না আমাকে খুন করতে চায়নি। আজ রাতে আপনার মনে হবে, ভয়ঙ্কর নির্যাতন করছি, কিন্তু বাস্তবে নির্যাতন কী, তা ভাবতেও পারবেন না। আমার একমাত্র কাজ হবে ওই লোকের আত্মা কাঁপিয়ে দেয়া। তবুও আমাকে নরপশু বলে মনে হলে, মাথায় রাখবেন দুটো বিষয়। প্রথমত: ওই লোক ঝুঁকি নিয়ে রোজগার করছে। বিপদে ফেলছে আমাদেরকে। দ্বিতীয়ত: ওকে বাঁচার সুযোগ দেব। এই দুটো বিষয় মনে রাখলে হয়তো বুঝবেন, আমরা আসলে সত্যিকারের দানব নই। ইচ্ছে করলে আপনি আমাদের সঙ্গে না-ও আসতে পারেন; আমরা অন্য ব্যবস্থা করে নেব।'

পায়চারি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। ওর দিকে চেয়ে

মারিয়ার মনে হলো, মিথ্যা বলছে না বাঙালি গুপ্তচর। সে যেন এমন এক যাজক, যে দিয়েছে স্বীকারোক্তি। উঠে রানার সামনে থামল মারিয়া, হাতে তুলে নিল ওর বাম হাত। ওখানে কয়েকটা ক্ষতের দাগ। নিচু স্বরে বলল, 'এগুলো কীভাবে হয়েছিল?'

'একবার বন্দি করে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। ইন্টারোগেটর খুব বেশি সিগারেট খেত। অ্যাশট্রে ছিল না কোথাও। তাই...' মৃদু হাসল রানা।

ওর চোখে তাকাল মারিয়া। 'আপনি মুখ খুলেছিলেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। আসলে বলার মত কোনও জবাবই ছিল না। কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করতে পারেনি সে।'

রানার হাত ছেড়ে দিল মারিয়া। চুপ করে আছে।

ঘুরে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেছে রানা, পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল মারিয়া, 'রানা, আপনার কথা মন দিয়ে শুনেছি। আমার মন বলছে, মানুষ হিসেবে আপনি অশুভ নন। মারকুটে, হ্যাঁ, কিন্তু পাথর নন। সত্যি হয়তো এমন দৃশ্য দেখব, যেটা আমার ভাল লাগবে না, কিন্তু কথা দিতে পারি, পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করব।'

দরজার নবে হাত রেখেও ঘুরে তাকাল রানা, ঠোঁটে মৃদু হাসি। চোখ যেন বুঝে নেবে মারিয়ার বুকের সব কথা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ঠিক আছে, আমরা রওনা হব একঘণ্টা পর।'

তেইশ

ব্যাংককের সব আবাসিক হোটেল আর বার-এ চিরুনি তল্লাসী করলেও ওই দুই ভাইয়ের মত অন্য দু'জনকে খুঁজে বের করতে পারত না দায়না বেলগুতাই। আত্মাভিমান আছে তাদের, তবুও নার্ভাস— আগে কখনও পড়েনি এমন পরিস্থিতির ভেতর। অবশ্য, পরিষ্কার বোঝা গেল, খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তারা। তাদের পাশ কাটিয়ে লাউঞ্জের কাউন্টারে এক বোতল শ্যাতো লাতুওর ১৯৭১ রেখে বিদায় নিল ওয়েটার। বেডরুমের দরজা খুলে রেখেছে দায়না। এমপেরার সাইয বেড দেখতে পাচ্ছে অ্যাডোনেড ও এইমে। ঘরে মৃদু বাতি।

শ্যাতো লাতুওর ১৯৭১-এর বোতল নিয়ে বেডরুমে ঢুকল অ্যাডোনেড, সঙ্গে তার চাচাত ভাই। তিনটে গ্লাসে ঢেলে নিল মদ। দায়নার হাতে গ্লাস দিতেই টোস্ট করল সে, 'আমাদের ইচ্ছে পূরণ হোক।'

'আমেন,' বিড়বিড় করল দুই ভাই।

দুটো আর্মচেয়ার দেখিয়ে দিল ওদেরকে দায়না। দুই ভাই বসে পড়ার পর নিজে বসল সেটিতে। 'সত্যি মজা করতে চাইলে আগে থেকেই নিতে হয় প্রস্তুতি। আজ রাত ফুর্তি করব আমরা। এরপর আর কখনও দেখা হবে না। সবসময় মনে রাখব কেমন ছিল এ রাত। আজ সব আগল খুলে যা খুশি করব আমরা।' বড়জনের দিকে তাকাল দায়না। 'তোমরা কখনও একই মেয়ের

সঙ্গে একই সময়ে মিলিত হয়েছ?'

শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে মাথা নাড়ল বড়ভাই।

এইমের দিকে তাকাল দায়না। 'কী দিয়ে শুরু করতে চাও, এইমে?'

ওয়াইনে চুমুক দিল যুবক। চট্ করে বড় ভাইকে দেখে নিয়ে বলল, 'এক এক করে না হয় মিলিত হলাম আমরা?'

মাথা নেড়ে হাসল দায়না। 'ওটা খুব বিরক্তিকর! তোমাদের তো অভিজ্ঞতা নেই, আমিই সেক্ষেত্রে দেখাব কী পছন্দ করে অভিজ্ঞ মেয়েরা। আর ফুর্তির শেষমুহূর্তে বুঝবে, পৌঁছে যাচ্ছি আমরা স্বর্গে। যা বলব, দ্বিধা না করে তা-ই করবে। যদি ব্যর্থ হও, সঙ্গে সঙ্গে শেষ হবে খেলা। তখন বাধ্য হয়ে খুঁজে আনব সত্যিকারের পুরুষ। মনে রেখো, সবসময় মেয়েদের কথা মেনে কামনার সাগরে স্নান করে খাঁটি পুরুষ। আজ তোমরা এখানে না এলে পড়ে থাকতে গিয়ে কোনও সামান্য পতিতার ঘরে। কিন্তু আজ বুঝবে কীভাবে পূরণ হয় দুই পুরুষ ও এক নারীর কামনা।'

এক চুমুকে ওয়াইন শেষ করে উঠে দাঁড়াল দায়না। হ্যাঁচকা টান খেয়ে ফর্সা গোড়ালিতে নামল সিল্কের ড্রেস। দু'পা পিছিয়ে গেল দায়না, দেখতে দিল ওকে পুরো আধমিনিট, তারপর বিছানার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'আপাতত দর্শক অ্যাডোনেড। শুধু দেখবে চেয়ে চেয়ে। কই, এসো! সব খুলে ফেলো, এইমে, ডার্লিং!'

বারোটি মোমবাতির লালচে আলোয় অদ্ভুত এক পরিবেশ। কস্তুরীর সুবাস ঘরে। জ্বলছে সুগন্ধী আগরবাতি। বেডের মাঝে শুয়ে পড়ল দায়না। আদর ভরা চোখে দেখল এইমেকে।

তিন মিনিট পেরোবার আগেই বিছানা জুড়ে শুরু হলো উদ্দাম ঝড়। তার কয়েক মিনিট পর দ্বিতীয় ভাইকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল দায়না।

‘আগামীকাল বাড়ি ফিরতে পারব না,’ বিমর্ষ সুরে বলল অ্যাডোনেড।

‘সমস্যা কী?’ জানতে চাইল এইমে।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে মস্ত বাথরুমে।

‘নিজের পিঠ দেখো,’ আয়না দেখিয়ে দিল অ্যাডোনেড।

ঘুরে তাকাল এইমে, কালো হয়ে গেল মুখ। পিঠ চিরে দিয়েছে দায়না বেটি। এখনও তিরতির করে রক্ত পড়ছে ক্ষত থেকে।

‘একই অবস্থা আমার,’ বলল অ্যাডোনেড। ‘সেরে উঠতে লাগবে কমপক্ষে এক সপ্তাহ। একবার এ অবস্থায় আমাদেরকে দেখলে দেরি না করে তালাক দেবে বউ।’

‘অথচ কোনও ব্যথাই পাইনি,’ বিড়বিড় করল এইমে।

‘আমিও না,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যাডোনেড। ‘পিঠের সর্বনাশ করে দিয়েছে হিংস্র এক মেয়ে-বেড়াল!’

চব্বিশ

অন্তরে ভয় নেই মারিয়া ওয়াকারের। তার বড় কারণ, একটু উত্তেজনাও নেই রানা, রেমারিক বা ফুলজেন্সের আচরণে। ওরা যেন রোজকার কোনও কাজ করছে রুটিন মাফিক। ভাড়া নেয়া টয়োটা ভ্যানের প্যাসেঞ্জার সিটে ফুলজেন্সের পাশে বসে আছে মারিয়া। সরু এক রাস্তার পাশে গাড়ি রেখেছে ওরা। নিভিয়ে দেয়া

হয়েছে বাতি। ইঞ্জিন বন্ধ।

নিচু স্বরে মারিয়াকে ব্যাখ্যা করল ফুলজেন্স: 'আমাদের দুই শ' গজ দূরের বার-এ বসে ড্রিঙ্ক করছে রানা। কিন্তু ঠিক তিন মিনিট 'পর ওখান থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে হাঁটতে শুরু করবে।' বামে সরু অন্ধকার গলি দেখাল। 'ওখানে অপেক্ষা করছে রেমারিক। রানার ষাট গজ পেছনে থাকে ওর লেজ। রাস্তার ওদিক দিয়ে আসবে না, কারণ এদিকে আলো নেই বললেই চলে। লোকটা গলির মুখে পৌঁছতেই লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে জোর গলায় ধমকে উঠব। স্বাভাবিক, ঘুরে দেখবে সে। আর তখন পেছন থেকে ওকে কাবু করবে রেমারিক। ভ্যানের পেছনে তোলা হবে তাকে, তারপর রানাকে তুলে নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাব আমরা।' www.boighar.com

'এত সহজ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

'আরও কঠিন হওয়া উচিত?' হাসল ফুলজেন্স। 'রেমারিক ঝড়ের গতিতে কাজ করে। পিছু নেয়া লোকটার কাছে ছোরা বা পিস্তল থাকলেও ব্যবহার করার সময় পাবে না।'

ঠিক তিন মিনিট পর দেখা গেল রানাকে, ধীর পায়ে হেঁটে আসছে। ভ্যানের ডানদিক দিয়ে যাবে। তার এক মিনিট পর উদয় হলো বামদিকে কালো, ছোট এক ছায়া। খুব সতর্ক। সত্যিকারের ফেউ। গাড়ির দরজা আলগা করে রাখল ফুলজেন্স। লোকটা পেরিয়ে যেতেই লাফিয়ে নেমেই বিকট এক হাঁক ছাড়ল: 'অ্যাই, ব্যাটা!'

ধেড়ে বাঁদরের মত লাফ দিয়ে চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়েছে লোকটা। বুঝল না পেছনে হাজির হয়েছে আরেকটা ছায়া। ধুপ করে কী যেন নামল তার মাথার তালুর ওপর। ভোঁতা একটা আওয়াজ পেল মারিয়া। খুলে গেছে ভ্যানের একপাশের স্লাইডিং দরজা। পরক্ষণে একই সময়ে বন্ধ হলো স্লাইডিং ডোর ও গাড়ির

সামনের দরজা। আবারও উঠে পড়েছে ফুলজেন্স। চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। পুরো এক শ' গজ গিয়ে আবারও থামল গাড়ি। ছায়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রানা। উঠল পেছনের সিটে। গাড়ি রওনা হয়ে গিয়ে পড়ল টো ডো স্ট্রিটে। মন্থর গতি তুলে বেরিয়ে এল শহর ছেড়ে।

এবারের যাত্রা আধঘণ্টার। পুরো সময় ধরে অন্তর কাঁপল মারিয়ার। মনে পড়ল হোটেলে রানার বলা কথা। বুঝে গেল, মাসুদ রানা, ভিটেলা রেমারিক বা ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স ভয়ঙ্কর কঠোর মনের মানুষ, এমন নয় যে বাঁচিয়ে রাখবে অনুসরণকারীকে। মনে মনে প্রার্থনা করল মারিয়া, লোকটা যেন ভুল না করে। নইলে...

ধুলোময়, সরু কাঁচা রাস্তা ধরে জঙ্গলের ভেতর ঢুকল ওরা, থামল গিয়ে ধীর গতিতে বয়ে যাওয়া ছোট এক নদীর সামনে। একটু দূরেই কাঠের ছোট জেটি। আকাশে ঝলমল করছে মস্ত বড় চাঁদ। এমনই চমৎকার পরিবেশ, নিজেদের ভেতর মগ্ন হয়ে বসে থাকতে পারত প্রেমিক-প্রেমিকারা। কিন্তু আশপাশে কেউ নেই। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মারিয়া। ঐকতান তুলেছে শতখানেক ঝিঁঝি। ঘুমিয়ে পড়ার আগে গাছের ওপর কিচির-মিচির করছে পাখি। ভ্যান ঘুরে একপাশে থামল মারিয়া। তখনই সরসর আওয়াজ তুলে খুলে গেল স্লাইডিং ডোর। নেমে এল রানা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ভ্যানের ভেতর থেকে তুলে নিল হালকা ওজনের লোকটাকে।

তার পরনে কালো জিন্সের প্যান্ট ও কালচে-নীল শার্ট। কালো টেপ দিয়ে আচ্ছামত বেঁধে রাখা হয়েছে দুই কবজি ও গোড়ালি। দু'বগলের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয়েছে লম্বা দড়ি। লোকটার দু'পায়ে বেঁধে দেয়া হলো বড় কুমড়োর মত আকৃতির এক পাথর। টেপ দিয়ে আটকে দেয়া হলো মুখ। কথা বলবে সে উপায় নেই। লোকটার চোখে ভীষণ ভয় দেখল মারিয়া। গাড়ি থেকে বেরিয়ে

এসেছে রেমারিক। রানাকে সাহায্য করল, দু'জন মিলে বয়ে নিয়ে গেল ভিয়েতনামি লোকটাকে ছোট জেটিতে। ওদের পিছু নিল মারিয়া ও ফুলজেন্স। অস্বস্তি নিয়ে জানতে চাইল মারিয়া, 'মিস্টার রানা, কী করতে চান?'

'কপাল ভাল, সঙ্গে আপনি আছেন,' বলল রানা। 'ইংরেজি জানে না এ। ওকে বলবেন, কয়েক মিনিট পর ওর কাছ থেকে কিছু খবর জানতে চাইব। তবে তার আগেই বুঝিয়ে দেব, ভুল করলে কী হবে। আমাদের কাজে মন না দিয়ে ওর চিন্তা বুঝতে চেষ্টা করুন।' রেমারিককে হাতের ইশারা করল রানা।

পরক্ষণে ভীষণ চমকে গেল মারিয়া।

দড়ির শেষমাথা শক্ত হাতে ধরল রানা। আর তখনই নাদান ছেলের মত হালকা ভিয়েতনামি লোকটাকে তুলে নিয়েই নদীতে ফেলে দিল রেমারিক। ভারী পাথরের মত টুপ করে ডুবে গেল লোকটা।

হতবাক হয়ে সামনে বাড়তে গেল মারিয়া। কিন্তু বাহু ধরে তাকে বাধা দিল ফুলজেন্স, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'অপেক্ষা করুন।'

ভারী পাথরের ওজনে নদীতে তলিয়ে গেছে ভিয়েতনামি। ধীরে ধীরে পেরোতে লাগল সময়। মারিয়ার মনে হলো চিরকাল ধরে অপেক্ষা করছে। আরও কিছুক্ষণ পর সহ্য করতে পারল না, চিৎকার করে বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই! বেচারা ডুবে মরে যাচ্ছে! আপনারা কি পাগল? মিস্টার রানা!'

হাত তুলে ঘড়ি দেখল রানা। 'একটু অপেক্ষা করুন।'

দড়ির অ্যাংগেল খেয়াল করছে রেমারিক। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'একেবারে তলে গিয়ে ঠেকেছে, মনে হয় একমিনিট দিলেই হবে।'

'না, দু'মিনিট,' মতামত দিল রানা। 'দরকার হলে ওর পেট

থেকে পাম্প করে বের করব পানি।'

পরের দু'মিনিট মারিয়ার মনে হলো অনন্তকাল। সামনে বেড়ে অসহায় মানুষটাকে তুলে আনতে চাইল, কিন্তু দু'বাহু শক্ত করে ধরে বাধা দিল ফুলজেন্স। মারিয়া বুঝে গেল, নরম-সরম মনে হলেও ষাঁড়ের জোর ফ্রেঞ্চের গায়ে।

পুরো দু'মিনিট পর দড়ি টেনে তুলতে লাগল রানা ও রেমারিক। কয়েক সেকেণ্ড পর উঠে এল ভিয়েতনামি, ভেজা বেড়ালের মত দেহ থেকে ঝরঝর করে ঝরছে পানি। কাঁপছে ঝড়ে পড়া বাঁশপাতার মত। জেটির কাঠের তক্তার ওপর তাকে বসাল রানা, ফড়াৎ আওয়াজ তুলে মুখ থেকে খুলল টেপ। লোকটাকে উপুড় করে ফেলল মেঝেতে। পাম্প আরম্ভ করতেই তার নাকের দু' ফুটো দিয়ে কুলকুল করে বেরোল পানি। ঘাড় ধরে তাকে বসিয়ে দিল রেমারিক, হাত রাখল পিঠে, ফুসফুসে তৈরি করছে চাপ। বন্দির মুখ থেকে গলগল করে বেরোল পানি, বেদম কাশতে লাগল দম আটকে।

মারিয়ার দিকে ফিরল রানা, হাতে প্লাস্টিকের ওয়ালেট। ওটা খুলে বলল, 'ওর নাম ভ্যান ট্রং ট্রি। বয়স তেতাল্লিশ বছর। স্ত্রী আর দুটো মেয়ে আছে। বাস করে চোলোনে। আমি জানতে চাই, কার হয়ে কাজ করছে বা কখন থেকে পিছু নিয়েছে।'

ঘড়ঘড় শব্দে খাবি খেয়ে বাতাস টানছে ভিয়েতনামি। মারিয়াকে বলল রানা, 'ওকে বলুন, আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে আবারও নদীর নিচে যাবে, কিন্তু এরপর আর টেনে তুলব না।'

একথা শুনে সামলে নিতে পুরো একমিনিট লাগল মারিয়ার। ততক্ষণে রানা আর রেমারিকের প্রতি মনে জমেছে চরম ঘৃণা।

এরা মানুষ?

দানব!

ভয়ঙ্কর দানব!

পশু!

বেচারা মানুষটাকে মেরে ফেলবে বলছে!

'বলেছিলে কোনও নির্যাতন করবে না, রানা!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল মারিয়া। 'যা করলে, ওটা কী!'

রানা নয়, জবাব দিল রেমারিক, 'কখনও দয়া দেখাতে গিয়ে কঠোর হতে হয়। আমরা ওর মগজে এনে দিয়েছি বুদ্ধি, শুধু তাই নয়, এই গরমে চমৎকার গোসলও করিয়েছি। এসবের বদলে ভাঙতে পারতাম ওর হাত-পা-আঙুল, উপড়ে নিতে পারতাম দাঁত। তা করিনি। আশা করি, বোকা মেয়ে, এবার নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করবে তুমি।'

'মর্, হারামজাদারা!' ঘুরে হাঁটতে লাগল মারিয়া।

কিন্তু জেটি থেকে নামার আগেই শুনল রানার কণ্ঠ: 'তোমার হাতে এই লোকের প্রাণ, মারিয়া। আমরা যদি ওর কাছ থেকে তথ্য না পাই, হয়তো বাধ্য হয়েই খুন করব। বা ছেড়েও দিতে পারি, যে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে, সে ধরে নেবে, ওর পেট থেকে সব খবর বের করেছি— তাতেও মরবে ও।'

ঝগড়াটে মুরগির মত ঘুরে বলল মারিয়া, 'পারবে তুমি, রানা, ওকে খুন করতে?'

'গলা টিপে মেরে ডুবিয়ে দেব লাশ, আমরা পিকনিক করতে আসিনি, মারিয়া! হয় ওর সঙ্গে কথা বলো, নইলে গিয়ে বসো ভ্যানে।'

আবারও ফিরল মারিয়া, একবারও দেখল না রানা, রেমারিক বা ফুলজেন্সের দিকে। কান্না আসছে তীব্র ঘৃণার কারণে। ভাল করেই বুঝেছে, পড়ে গেছে একদল জানোয়ারের মাঝে। এখন সামলে নিতে হবে নিজেকে, ওর হাতে বেচারা লোকটার প্রাণ!

উঠে রেমারিকের বুকে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে ভিয়েতনামি, দু'চোখ ঘোলাটে।

ভিয়েতনামিয ভাষায় বলল মারিয়া, 'তুমি আছ মস্তবড় বিপদে। এদের প্রশ্নের জবাব না দিলে তোমাকে মেরেই ফেলবে।'

কয়েক সেকেণ্ড পর মারিয়ার চোখে তাকাল ভ্যান ট্রং ট্রি। 'এরা কী জানতে চায়?'

'তুমি কে, কাদের হয়ে কাজ করছ, আর কেন করছ,' বলল মারিয়া।

ওয়ালেট থেকে ঝাপসা দুটো ছবি বের করেছে রানা। ওগুলো দেখাল মারিয়াকে। ছোট্ট দুই মেয়ের ছবি। একজনের বয়স পাঁচ, অন্যজন তিন। গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা, 'ওকে বলো, ওকে ডুবিয়ে মারার পর যাব ওর বাড়িতে, তখন দুই মেয়েকেও খুন করব।'

চাঁদের আলোয় রানার চোখ দেখল মারিয়া, শিউরে উঠল।

হ্যাঁ, তাই করবে জানোয়ারটা!

নরপশু!

সামান্য দয়া নেই চোখে!

ঢোক গিলল মারিয়া। এখন ওর হাতে তিনজন মানুষের প্রাণ!

জরুরি ভিত্তিতে কথা শুরু করল মারিয়া।

কিন্তু ঘটল অবাক ঘটনা। জবাব না দিয়ে হাসতে লাগল ভ্যান ট্রং ট্রি। যেন হিস্টিরিয়া ধরেছে তাকে। পেছন থেকে ওর ঘাড়ে প্রচণ্ড থাবড়া মারল রেমারিক। জেটির আরেক পাশে ছিটকে পড়ল লোকটা। আবার উঠল খুব ধীরেসুস্থে। মুখ খুলল মারিয়ার দিকে চেয়ে। হাতের ইশারায় দেখাল রানাকে।

দোভাষীর কাজ করল মারিয়া।

'যারা ওকে ভাড়া করেছে, তারাও ওই একই কথা বলেছে। ও যদি মুখ খোলে, বাঁচতে দেবে না ওর স্ত্রী আর মেয়েদেরকে।'

'আস্ত কুকুর!' বিড়বিড় করল রানা। হাঁটতে গিয়ে থামল জেটির শেষ মাথায়।

বিড়বিড় করে তাকে যেন অভিশাপ দিল রেমারিক।

পুরো দু'মিনিট চুপ করে কী যেন ভাবল রানা, তারপর ঘুরে ফিরে এল ধীর পায়ে। রেমারিককে বলল, 'খুলে দাও ওর হাত-পার বাঁধন। সরিয়ে ফেলো পাথর।'

রানার নির্দেশ পালন করল রেমারিক।

আবারও পায়চারি করছে রানা।

কবজির বাঁধনের জায়গা ডলছে ভিয়েতনামি। চোখে এখনও আতঙ্ক। পালা করে দেখছে রানা, রেমারিক ও ফুলজেন্সকে।

কিছুক্ষণ পর তার সামনে থামল রানা, দু'হাতে শক্ত করে ধরল দু'কাঁধ। মারিয়ার উদ্দেশে বলল, 'আমার প্রতিটা কথা ওকে বুঝিয়ে বলবে।' ভিয়েতনামির চোখে চোখ রাখল রানা। 'কখনোই তোমাকে মেরে ফেলতাম না। বা ক্ষতি করতাম না তোমার বউ-বাচ্চার। কিন্তু যাদের হয়ে কাজ করছ, তাদের বাধবে না নিরীহ মহিলা বা বাচ্চা মেয়েকে খুন করতে।' মারিয়ার অনুবাদ হয়ে গেলে আবারও বলল রানা, 'মস্ত বিপদে পড়েছ। তোমার কাছ থেকে যা জানতে চাই, তা বললে তার বদলে দেখব, যাতে বাঁচে তোমার স্ত্রী ও বাচ্চারা। সব বলার পরেও পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা পিছু নেবে তুমি, নিয়ম অনুযায়ী রিপোর্ট দেবে মালিকের কাছে। যেখানে যাব, অনুসরণ করবে। আর এই সময়ে এ শহরে আসবে দু'জন বিদেশি। তারা পাহারা দেবে তোমার পরিবারকে। এবার কী করবে, তা ভেবে দেখো। সব বলে আমার দেয়া নিরাপত্তা নেবে, না চলে যাবে?'

অনুবাদ শেষ করল মারিয়া। চোখ তুলে তাকাতে পারল না রানার চোখে। কোত্থেকে এসেছে ভীষণ লজ্জা। রানা, রেমারিক ও ফুলজেন্সকে ভেবেছিল নরপশু, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, চট্ করে কাউকে খারাপ ভেবে নেয়া উচিত নয়।

ভিয়েতনামির কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল রানা, পিছিয়ে গেল এক পা। জঙ্গলে নানান আওয়াজ। প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন জেটির

দিকে চেয়ে আছে ভ্যান ট্রং ট্রি। কয়েক মুহূর্ত পর মুখ তুলে রানাকে দেখল। শুধু জিজ্ঞেস করল: 'ওরা কারা, যারা নিরাপদে রাখবে আমার পরিবারকে?'

তার কথা ভাষান্তরিত করল মারিয়া, তারপর তাকে জানিয়ে দিল রানার বক্তব্য: 'ওরা আমার মতই কঠোর মানুষ, কিন্তু জান থাকতে তোমাদের ক্ষতি হতে দেবে না।'

'সেক্ষেত্রে আপনাকে সবই খুলে বলব,' জানাল ভ্যান ট্রং ট্রি।

পঁচিশ

'বুঝলাম সত্যিই মস্ত হৃদয় আছে তোমার।' লাজুক হাসল মারিয়া।

মেয়েটা অদ্ভুত রূপসী, কিন্তু হাসলে মনে হয় দেবী, ভাবল রানা। 'কয়েক মাস আগে খুব নামকরা এক ক্লিনিকে জোর করে ভর্তি করে দেয়া হয় আমাকে। ফুল চেক-আপ করেন ডাক্তার। তার ভেতর ছিল আলট্রাসাউণ্ড স্ক্যান। অবাক হয়ে টিভি মনিটরে দেখলাম আমার ভেতরের সব যন্ত্রপাতি। ফুসফুস, লিভার, কিডনি, ইনটেসটাইন... তারপর হঠাৎ দেখলাম ওটা... ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওটা কী?" ভদ্রলোক বললেন, "ওটা আপনার হৃৎপিণ্ড।"' মৃদু হাসল রানা। 'তখনই বুঝলাম, আরেহ্, সত্যি তো আমার হৃদয় আছে! মাঝে মাঝে কাজও করে! দুঃখিত, মারিয়া, কিন্তু নদীর তীরে ওই নাটক ছাড়া চলত না। তুমি ছিলে সাইকোলজিকাল কণ্ডিউট, তোমার মনের অবস্থা খেয়াল করেছে

ভ্যান ট্রং ট্রি। তুমি আমার কথা বিশ্বাস না করলে, ও-ও পাত্তা দিত না।'

মাথা দোলাল মারিয়া। 'পরে বুঝেছি, ভাবোনি তাকে ডুবিয়ে মারবে, বা খুন করবে ওর মেয়েদেরকে।'

'আগেই বলেছি, এমন কাউকে খুন করিনি, যে আমাকে খুন করতে চায়নি।'

কণ্টিনেন্টাল হোটেলে রানার ঘরে বসে আছে মারিয়া। একটু দূরে টেবিলে কমপিউটার রেখে খটাখট শব্দে কি-বোর্ড টিপছে লারসেন। পাশেই বড় একটা ইন্দো-চিন মানচিত্র। টেলিফোনে ব্যস্ত রেমারিক। নিজের জগতে ডুব দিয়ে গান শুনছে ফুলজেন্স। রাস্তার ওদিকে এক বার-এ বসে চোখ রেখেছে ভ্যান ট্রং ট্রি।

ক্রেডলে রিসিভার রেখে উঠে দাঁড়াল রেমারিক। 'ঠিক আছে, ব্রাসেলসে সিম কর্নেলিস যোগাযোগ করেছে জ্যাঁ মউরোসের সঙ্গে। আগামীকাল সকালে প্যারিস থেকে বিমানে করে রওনা হয়ে পৌঁছুবে ট্যান সন নাট এয়ারপোর্টে। ফ্লাইং ক্লাব ক্লাসের টিকেট, পৌঁছে বিশ্রাম লাগবে না। কিন্তু সমস্যা অন্যখানে, রানা, জোগাড় করতে হবে ওদের জন্যে অস্ত্র।'

'কুচ-কুচ ইয়াং বার-এর মালিক কুলজাত সিঙের সঙ্গে কথা বলব। আমাদেরও অস্ত্র দরকার। ঠিক সময়ে পেয়ে যাব।'

'যারা আসছে, তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কীভাবে?' জানতে চাইল মারিয়া।

'সিম কর্নেলিস আর জ্যাঁ মউরোস পুরনো বন্ধু,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'নামকরা মার্সেনারি। একই সময়ে দক্ষ বডিগার্ড। ফোর্ট নক্সে ভ্যান ট্রং ট্রি আর তার পরিবারকে লুকিয়ে রাখলে যেমন বিপদের ঝুঁকি কমবে, তেমনি নিরাপদ থাকবে ওরা ওই দু'জনের হাতে।' লারসেনের দিকে তাকাল রানা। 'কিছু পেলে, পিটার?'

আড়মোড়া ভেঙে মনিটর দেখল লারসেন, কণ্ঠে পুলিশ-পুলিশ ভঙ্গি নিয়ে বলল, 'ভ্যান ট্রং ট্রি। জন্ম হুই গ্রামে উনিশ শ' তিয়াত্তর সালে। পড়েছে প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত। বারো বছর বয়সে তার বাবা-মা মারা যায় ডিসেণ্ট্রি রোগে। বাধ্য হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে আসে রাজধানীতে। একবছরের ভেতর হয়ে ওঠে কয়েক হাজার কমবয়সী পকেটমারের সেরা। যোগ দেয় সিক্রেট পুলিশের ইনফর্মার হিসেবে। তারাই ট্রেনিং দেয় সার্ভেইল্যান্স টেকনিক। ইনফর্মার হিসেবে রয়ে গেলেও, পাশাপাশি বড়লোকদের হয়ে চোখ রাখার কাজও নিতে লাগল। তিন সপ্তাহ আগে চাকরি দিতে চাইল ভিয়েন ট্র্যান নামের এক লোক । ওই নাম সম্ভবত নকল। যাই হোক, দুই সপ্তাহ আগে ভ্যান ট্রং ট্রিকে বলা হলো, এয়ারপোর্টে চোখ রাখতে হবে এক বাংলাদেশি যুবকের জন্যে। সেজন্য অগ্রিম দিয়েছে নগদ একহাজার ইউএস ডলার। বলা হয়েছে, কোনও তথ্য পেলে সঙ্গে সঙ্গে যেন যোগাযোগ করে তুইয়ে প্যান গেস্ট হাউসে এক ক্যামবোডিয়ান মহিলার সঙ্গে। ধরে নিতে পারি, ওই মহিলার নামও নকল।

'এর ভেতর একবার থাই সীমান্তে সিসোফোন শহরে ভ্যান ট্রং ট্রিকে নিয়ে গেছে মহিলা। ওখান থেকে ল্যাণ্ড রোভার চেপে দু'ঘণ্টা যাওয়ার পর থেমেছে কাঁচা এক রাস্তায়। ওই দু'ঘণ্টা কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল তার। চোখ খোলার পর সে দেখল, জঙ্গলের ভেতর একটা গ্রাম, পাশেই আর্মি ক্যাম্প। ভ্যান ট্রং ট্রির ধারণা: ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে উত্তর দিকে। পরে মানচিত্র দেখে ওর মনে হয়েছে, ওই গ্রামের নাম সম্ভবত চেক। খেমার রুয ক্যাম্প আসলে। ওখানে তার সঙ্গে দেখা করেছে এক লোক। নাম হি মিন নাইয়ান। তার যে বর্ণনা ভ্যান ট্রং ট্রি দিয়েছে, তার সঙ্গে মেলে কুয়েন আন টু। সে ট্রং ট্রিকে একটা ছবি দিয়ে জানিয়েছে, অনুসরণ করতে হবে কাকে। তোমার ওই ছবি

কমপক্ষে চার বছর আগের। ওখানে ট্রিকে দেয়া হয়েছে নগদ আরও দু'হাজার ডলার। এ ছাড়া পোর্টেবল স্যামসাং ফ্যাক্স মেশিন। নম পেন-এর একটা ফ্যাক্স মেশিনের নম্বরও দিয়েছে। ওই ফ্যাক্স মেশিনে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাতে হবে, আর সেজন্য আছে প্রিফিক্স কোড: মালাম। এরপর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টার সময় রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। একদিন আর একরাত ওই ক্যাম্পে ছিল ভ্যান ট্রং ট্রি। সেসময় কান পেতে শুনেছে কয়েকজনের আলাপ। খেমার রুযদের হাতে আটকা পড়েছে কয়েকজন আমেরিকান সৈনিক। তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে মাইন সরিয়ে নেয়ার কাজে। পরদিন সকালে রওনা হওয়ার আগে দূরে দেখতে পেয়েছে এক শ্বেতাঙ্গকে। পায়ে ছিল শেকল। বয়স কত বোঝা যায়নি। এরপর আবারও চোখ বেঁধে ভিয়েতনামি রাজধানীতে ফিরিয়ে এনেছে তাকে। তখন ভ্যান ট্রং ট্রিকে মহিলা বলেছে: কাজে ভুল করলে খুন করবে হি মিন নাইয়ান। শুধু তা-ই নয়, তার স্ত্রী ও দু'মেয়েকেও বাঁচতে দেবে না।'

মুখ তুলে রানাকে দেখল লারসেন। 'ক্যামবোডিয়ার ম্যাপ দেখেছি, ইন্টারনেট ঘেঁটেও জানলাম, আবারও ওদিকে জড় হচ্ছে খেমার রুয বাহিনী।' মানচিত্র দেখল। 'জায়গাটা থাই সীমান্ত থেকে মাত্র বিশ মাইল দূরে। দুর্গম, তার ওপর ওখানে আছে শত্রুবাহিনী, তাই ভুলেও ওদিকে যাচ্ছে না ক্যামবোডিয়ান আর্মি।'

উঠে ফোনের দিকে চলল মারিয়া। 'ওয়াশিংটনে আমার বসের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ওই এলাকায় আমেরিকান সৈনিক বন্দি থাকলে, নিশ্চয়ই তারা এমআইএ।'

'একমিনিট,' বলল রানা, 'তুমি ওই তথ্য জানালে সেক্ষেত্রে কী করবেন তোমার বস?'

'এজেন্ট পাঠাবেন, নিজেও চলে আসতে পারেন। কয়েক বছরের ভেতর প্রথমবারের মত দেখা গেছে বন্দি শ্বেতাঙ্গ

সৈনিক।'

'সেসব এজেন্ট কী করবে?'

'গোপনে ঢুকে পড়বে ওই এলাকায়।'

একবার রেমারিককে দেখে নিয়ে বলল রানা, 'অত্যুৎসাহী আমেরিকান এজেন্টরা ওদিকে গেলে ক্ষতিই হবে। এমআইএরা থাকলেও মাত্র কয়েক মিনিটে ওদেরকে সরিয়ে নেবে খেমার রুয বাহিনী।'

'কর্তৃপক্ষকে তথ্য দেয়া আমার দায়িত্ব,' বলল মারিয়া।

'জাহান্নামে যাক তোমার দায়িত্ব, মারিয়া,' চাপা স্বরে বলল রেমারিক। 'আগেই তোমাকে বলে দিয়েছে, কাজ করতে হবে আমাদের সঙ্গে মিলে। তুমি নিজেও বলেছ, আপাতত ছুটিতে আছ। মন দিয়ে শোনো: ভেবেচিন্তে ভাল কোনও প্ল্যান করে তারপর ব্যাকআপ লাগলে তখন যোগাযোগ করব আমরা তোমার ডিপার্টমেন্টে।'

'ঠিক বলেছে রেমারিক,' বলল লারসেন। 'প্রথমে চাই প্রয়োজনীয় তথ্য। ট্রেস করব ক্যামবোডিয়ার ওই ফ্যাক্স নম্বর। আমাদের পক্ষে কাজ করছে ভ্যান ট্রং ট্রি। ওকে ব্যবহার করে ফাঁদ পাতার সুযোগ পাব। চাইলে তুইয়ে প্যান গেস্ট হাউসের মহিলাকে তুলে নিয়ে তার পেট থেকে বের করতে পারব খবর। এ কাজে এগোতে হবে এক পা এক পা করে।' রানার দিকে তাকাল লারসেন। 'ভ্যান ট্রং ট্রি বোধহয় জানে না, তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে টোপ হিসেবে। শত্রুপক্ষ চাইছে ওকে তুলে নেব আমরা। তারপর তার পেট থেকে খবর বের করে এগোব। এদিকে তারা গুটিয়ে আনবে তাদের জাল।'

চুপ করে আছে রানা।

'যৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে না, পিটার,' বলল রেমারিক। 'ভ্যান ট্রং ট্রি দক্ষ ওয়াচার। ওকে ব্যবহার করে ফাঁদ পাতবে

কেন? সেক্ষেত্রে কাজ দিত অদক্ষ কাউকে। চট্ করে বুঝতাম আমরা। তা ছাড়া, কেন ওকে চোখ বেঁধে নিয়ে গেল ওই ক্যাম্পে?'

'কারণ ওরা বুদ্ধিমান,' বলল লারসেন, 'সিসোফোন শহর থেকে দশ মিনিট যাওয়ার পর বেঁধেছে চোখ। ততক্ষণে সূর্যের অবস্থান দেখে সে বুঝে গেছে, চলেছে কোন্ দিকে। যে রানাকে তুলতে চাইছে জালে, সে খুব সতর্ক। তার জানা আছে, দক্ষ ওয়াচার দিলেও তাকে চিনে ফেলবে রানা। কিন্তু এখানে একটা ভুল করেছে। আমরা যেভাবে রানাকে চিনি, ততটা চেনে না। ধরেই নিয়েছে, ভ্যান ট্রং ট্রিকে ধরে তার পেটের খবর বের করবে রানা, তারপর খুন করবে, যাতে খবরটা জানিয়ে দিতে না পারে সে।'

'সেক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা আমাদের দিকে,' বলল রেমারিক।

মারিয়ার দিকে তাকাল লারসেন। 'আমাদের মধ্যে একমাত্র তুমি ট্রির ভাষা বুঝতে পারো। তোমার কি মনে হয়, সে ভাবছে রানা তার পরিবারকে রক্ষা করতে পারবে?'

আবারও সোফায় বসল মারিয়া। 'হ্যাঁ, ওর ধারণা, রানা কথা রাখবে।'

'সেটাও আমাদের পক্ষে আসবে,' বলল রানা, 'এ ছাড়া, জরুরি কোনও তথ্য আমাদের হাতে নেই। পিটার, আগামীকাল পেঁচাকে নিয়ে যাবে নম পেন শহরে। ট্র্যাক করবে ওই ফ্যাক্স নম্বর। আশপাশের এলাকা বা চেক্ গ্রাম সম্পর্কে জোগাড় করবে তথ্য। স্থানীয় খেমার রুয কমাণ্ডার বা কতজন তার সঙ্গে আছে, এসব জানলে কাজে আসবে পরে।'

রেমারিকের দিকে তাকাল রানা। 'এদিকে আগামীকাল সকালে কুচ-কুচ ইয়াং বার-এর মালিকের সঙ্গে দেখা করবে। একটা চিঠিও দেব ওকে দেয়ার জন্যে। কালো বাজারে তোমার

ঢোকার ব্যবস্থা করবে সে। দরকারী যন্ত্রপাতি লাগবে। প্রথমেই চাই কমপক্ষে দুটো এসএমজি, চারটে পিস্তল, কয়েকটা গ্রেনেড। আরও কিছু লাগলে কিনবে। এই এলাকায় সহজেই পাবে রাশান একে-৪৭। উযি না পেলে ওটাই নেবে। সোভিয়েত আমলের টোকারেভ পিস্তলের নকল করেছে চিনারা। কাজে খারাপ নয়। বেছে নেবে টাইপ ৫১। প্রচুর পরিমাণে ম্যাগাযিন চাই।'

মারিয়াকে দেখল রানা। 'আগামী পরশু সকালে এয়ারপোর্টে গিয়ে রিসিভ করবে সিম কর্নেলিস আর জ্যাঁ মউরোসকে। ওদের হাতে দেবে রেমারিকের আনা পিস্তল। ওখান থেকে ওদের নিয়ে যাবে ভ্যান ট্রং ট্রির বাড়িতে। সঙ্গে নেবে ওরা এক সপ্তাহ চলার মত টিনের ক্যান ভরা খাবার আর বোতলজাত পানি। যাওয়ার পথে ওদেরকে জানিয়ে দেবে, এখানে আসার পর থেকে যা ঘটেছে। ট্রির বাড়িতে যাওয়ার সময় কিনবে তিনটে মোবাইল ফোন। একটা দেবে সিমের হাতে, একটা নেবে নিজে, আর অন্যটা দেবে আমাকে। সবসময় নিজেদের ভেতর যোগাযোগ রাখতে হবে। বাধ্য না হলে হোটেল রিসেপশনের মাধ্যমে যোগাযোগ করব না আমরা।'

'আর তুমি কী করবে?' জানতে চাইল মারিয়া।

'আমি দেখে বেড়াব শহরের দর্শনীয় সব জায়গা,' বলল রানা। 'ভ্যান ট্রং ট্রি ফ্যাক্স করে জানাবে, টুরিস্টের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওদিকে নম পেনে গ্রাউণ্ডওঅর্ক করবে পিটার। তারপর সোজা যাব আমরা ক্যামবোডিয়ায়।' হাতঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল রানা। 'হয়তো বাপের মতই ভয়ঙ্কর চরিত্র বেলগুতাইয়ের মেয়েটার।'

ছাব্বিশ

বর্ণনা না দিলেও ওদেরকে চিনত মারিয়া। কাস্টম্‌স্‌ থেকে বেরিয়ে আসছে, হাতে ক্যানভাস ব্যাগ, বিমানে ওঠার সময় নিজেদের কাছেই রেখেছে। দু'জনের একজন মাঝারি উচ্চতার লোক, পেশিবহুল, চওড়া কাঁধ, মাথায় চিকচিক করছে কয়েকটা পাকা চুল। অন্যজন লম্বা, অভিজাত চেহারার। কুচকুচে কালো চুল, গায়ের ত্বক রোদে পুড়ে বাদামি। দৈহিক দিক থেকে আলাদা দু'জন, কিন্তু সতর্ক পায়ে হাঁটার ভঙ্গি বা আচরণ একইরকম। চোখ রাখছে চারপাশে। যেন আছে রণাঙ্গনে, হাতে অস্ত্র পেলেই যোগ দেবে শত্রু নিধনে। www.boighar.com

সামনে বেড়ে নিজ পরিচয় দিল মারিয়া, তারপর বলল, 'রানা বলেছে, আপনাদেরকে পৌঁছে দিতে হবে গন্তব্যে।' ওর মনে হলো, ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ভেতর দিয়ে ওকে দেখছে লোক দু'জন।

হাত বাড়িয়ে দিল ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি। 'আমি জ্যাঁ মউরোস, আর এ সিম কর্নেলিস।'

হ্যাণ্ডশেক করল ওরা। www.boighar.com

বাড়তি কথা হলো না ওদের ভেতর। মারিয়ার ভাড়া করা গাড়িতে উঠল। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে মউরোস। পেছনের সিটে সিম। চোলোনের দিকে চলল মারিয়া।

কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল কর্নেলিস, 'মেশিন এনেছেন?'

'হ্যাঁ। পেছনের সিটের সামনে মেঝেতে রাখা।'

'ভেতরে কী আছে?'

বড় করে দম নিল মারিয়া। কখনও ভাবেনি, এসব বিষয়ে কথা বলতে হবে কোনও মার্সেনারির সঙ্গে। 'চিনের তৈরি দুটো টোকারেভ পিস্তল আর ছয়টা স্পেয়ার ম্যাগাযিন। ছয় শ' গুলি। নোকিয়া মোবাইল ফোন। এ ছাড়া, ফরমায়েশ অনুযায়ী বিশ বর্গ গজ মাছের জাল।'

'সাপ্লাই?'

'এক সপ্তাহ চলার মত খাবার আর পানি।'

'ওই পরিবারের জন্যে?'

'ওরা জড় করে রেখেছে এক মাসের খাবার। আগেই তাদেরকে সব বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।'

সন্তুষ্ট হয়ে নাক দিয়ে ঘোঁৎ শব্দ করল মউরোস। কয়েক সেকেণ্ড পর জিজ্ঞেস করল, 'আর অন্যরা?'

'গতকাল নম পেনে গেছে লারসেন ও ফুলজেন্স। টুরিস্টের ভূমিকায় অভিনয় করছে রানা। এদিকে উধাও হয়েছে রেমারিক।'

'উধাও?'

'হ্যাঁ। বুঝতে পারিনি কোথায় গেছে। এ ব্যাপারে কোনও কথাও বলেনি রানা।' আয়নায় কর্নেলিসকে দেখল মারিয়া।

রিয়ার ভিউ মিররে বারবার দেখছে লোকটা। কিন্তু ফ্রেঞ্চ লোকটা চেয়ে আছে সামনে। এরা উত্তেজিত নয়, তবে মনে হলো সতর্ক। মারিয়াকে বলল সিম, 'ভ্যান ট্রং ট্রির বাড়ির পাঁচ শ' গজ দূরে গাড়ি থামাবেন, চালু রাখবেন ইঞ্জিন।'

প্রথমবারের মত কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল মউরোস। 'তোমার কী মনে হয়, কী করছে রেমারিক?'

হাসল সিম। 'ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই কাজে ওস্তাদ। বাড়ির ভেতর থাকব। বাইরে থাকবে ও। মিস ওয়াকার, রেমারিকের

কাছে মোবাইল ফোন আছে?'

'হ্যাঁ, প্রয়োজনে যোগাযোগ করবে। আর... আপনারা আমাকে মারিয়া বলে ডাকতে পারেন।' ওর কাঁধে মৃদু টোকা টের পেল মারিয়া।

পেছন থেকে বলল সিম কর্নেলিস, 'ধন্যবাদ। আপাতত সব ভাল বলেই মনে হচ্ছে। ওই পরিবারকে সব ভেঙে বলা হয়েছে? ...আশা করি বোকার মত কোনও কাজ করবে না?'

'করবে না, সিম। প্রাণের ভয়ে অস্থির হয়ে আছে।'

'ঠিক আছে। এবার সব ঠিক করে নেয়া যাক। আমরা প্রথমে ওই বাড়ি থেকে পাঁচ শ' গজ দূরে থামব। কয়েক মিনিট চারপাশ বুঝে নেব। তারপর যদি দেখি পিছু নেয়া হয়নি, তখন মারিয়া আমাদেরকে নিয়ে যাবেন ওই বাড়ির দশ গজ দূরে। ওখান থেকে আরেকবার দেখব আশপাশ। তারপর ঢুকে পড়ব ওদের বাড়িতে। দশ মিনিট পর আপনি আসবেন। ভ্যান ট্রং ট্রি বোধহয় ইংরেজি জানে না?'

'সামান্য।'

'সেক্ষেত্রে আমাদের হয়ে ওদেরকে ব্রিফ করবেন। জোর দিয়ে বলবেন, ভুলেও যেন আমাদের নির্দেশের বাইরে না যায়। বলে দেবেন, বোকার মত কোনও ভুল করলে, বা আমাদের নিয়মের বাইরে চললে, দেরি না করে মুহূর্তে নিরাপত্তা তুলে নিয়ে সরে যাব আমরা।'

কড়া কথাগুলো শুনে আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল মারিয়া, 'বুঝতে পেরেছি। ওদেরকে আবারও খুলে বলব, পরিস্থিতি কত খারাপ।'

সেতু পেরিয়ে গেল মারিয়া, পাঁচ মিনিট পর গতি হ্রাস করে গাড়ি রাখল রাস্তার একপাশে। সামনে ঝুঁকে রিয়ার ভিউ মিরর ঠিক করে নিল কর্নেলিস। পরিষ্কার দেখবে পেছনের দৃশ্য। ব্যস্ত সড়ক। চলছে গাড়ি, বাস, রিক্সা ও সাইকেল; হনহন করে হাঁটছে

পথচারীরা। মউরোসকে দেখে মনে হলো, সামনে চোখ রেখেছে। পাথরের দুই মূর্তি যেন দুই মার্সেনারি। হাঁচি এলেও বাধ্য হয়ে নাক চেপে সামলে নিল মারিয়া।

আরও কিছুক্ষণ পর বলল কর্নেলিস, 'ঠিক আছে, সামনে এগোন।'

গিয়ার ফেলে রওনা হলো মারিয়া। কান পেতে শুনল লোক দু'জনের কথা।

'অনেক নড়াচড়া, জ্যা,' বলল কর্নেলিস, 'ব্যাগের ভেতর যেন এক কেজি পিঁপড়ে।'

'হুঁ। কাজ বাড়ির ভেতরে। সিল করতে হবে ঢোকার পথ। হামলা হলে দেরি না করে প্রতিক্রিয়া দেখাব। কিন্তু এক জায়গায় বেশিক্ষণ টিকব না। সামনে কাভার নিতে পারব না।'

বাঁকের কাছে থামল মারিয়া। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল। সামনে বাড়াল গাড়ি। থামল নির্দিষ্ট বাড়ির দশ গজ দূরে। 'সরু পথের পাশে ওই বাড়িটা। বামদিকে। সামনের দরজা কালো রং করা। বাচ্চাদেরকে নিয়ে অপেক্ষা করছেন মিসেস ট্রি।'

একমিনিট পেরিয়ে গেল, কথা বলল না মার্সেনারিরা। তারপর বলল কর্নেলিস, 'ঠিক আছে, চল, জ্যা।'

গাড়িতে বসে মারিয়া দেখল, স্বচ্ছন্দ গতি তুলে সরু গলিতে হেঁটে চলেছে দু'যুবক। একহাতে ঝুলছে ব্যাগ, অন্যহাতে ওদের মেশিনের থলি। একটু দূরে বড় রাস্তায় ব্যস্ত মানুষের আসা যাওয়া। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হলো মারিয়ার। স্বাভাবিক। পাকা দুই খুনিকে ছেড়ে দিয়েছে এই সমাজে।

দশ মিনিট পর গাড়ি লক করে নির্দিষ্ট বাড়ির দিকে পা বাড়াল। দরজা খুলল জ্যা মউরোস। ঢিলা প্যান্ট ও স্পোর্টস্ জ্যাকেট খুলে কালো জিন্স ও কালো পোলো-নেক শার্ট পরে নিয়েছে। পায়ে স্নিকার।

দুশ্চিন্তা নিয়ে সোফায় বসে আছেন মিসেস ট্রি। পাশেই দুই মেয়ে। ব্যস্ত কর্নেলিসের কাজ চুপচাপ দেখছে সবাই। এখন মার্সেনারির পরনে কালো প্যান্ট ও শার্ট। সোফার পাশেই একটা চেয়ার টেনে বসল মারিয়া। আগ্রহ নিয়ে দেখছে কী করে এরা।

মাছের জালের একাংশ কেটে জানালায় আটকে দিল কর্নেলিস। এদিকে এক রোল সাদা মার্কার টেপ নিয়ে কাজে নেমেছে মউরোস। তার অন্যহাত চোখের ওপরে। ঘরের প্রতিটি জানালা দিয়ে দেখল। কাজটা করার সময় রোল করা টেপ খুলে কাঠের মেঝেতে তৈরি করছে লম্বা সব সরল রেখা। মারিয়া জানতে চাইল, 'খুলে বলবেন কী করছেন? সেক্ষেত্রে মিসেস ট্রিকে বুঝিয়ে দিতাম কী হচ্ছে।'

ঘুরে বলল কর্নেলিস, 'জানালার নেটিং কাজ করবে অ্যান্টি গ্রেনেড হিসেবে। এত মোটা নয় যে বাইরে থেকে ওটা দেখে ফেলবে। কেউ জানালা দিয়ে গ্রেনেড ছুঁড়লে, বাড়ি খেয়ে বাইরে গিয়ে পড়বে ওটা।' মউরোসকে দেখাল কর্নেলিস। 'কিন্তু জাল ঠেকাবে না বুলেট। তাই লাইন অভ ফায়ার খুঁজে বের করছে জ্যাঁ।' একটা জানালা দেখাল। 'যেমন ওদিকের দালানে কোনও স্নাইপার থাকলে, সে দেখবে এ ঘরের মাত্র সামান্য জায়গা। আমরা স্থির করে নেব, কোন্ অ্যাংগেল নিরাপদ। আলোও বুঝতে হবে। আগে আমাদের কাজ শেষ হোক, তারপর সবই বুঝিয়ে দেব।'

কাজ যতটা পারা যায় এগিয়ে নেয়া উচিত। মিসেস ট্রিকে দেখে নিয়ে নিচু স্বরে ব্যাখ্যা দিল মারিয়া।

গভীর মনোযোগে শুনল ভিয়েতনামি মহিলা। ছোট্ট দুটো পুতুলের মত দেখতে দুই মেয়ে। গোল মুখ। কুচকুচে কালো চুল, মাথায় চুড়ো করে বাঁধা। দেখলেই মনে হয় কোলে তুলে একটু আদর করে দেয়া উচিত। ছোট মেয়েটাকে কোলে নিল মারিয়া।

টেপ দিয়ে তৈরি লাইন শেষ করেছে মউরোস, এবার সিলিং থেকে খুলে ফেলল কারুকাজ করা লাল ল্যাম্পশেড।

জাল কত শক্তভাবে আটকে আছে, তা দেখছে কর্নেলিস। সন্তুষ্ট হয়ে মারিয়াকে বলল, 'অন্যসব ঘরে কাজ শেষ করতে বেশিক্ষণ লাগবে না।' টেপের লাইন দেখাল। 'ওগুলো নিরাপদ পথ। এখন থেকে প্রতিটি ঘরে যাওয়ার সময় এসব লাইনে পা রেখে হাঁটতে হবে। এর বাইরে গেলে বিপদ। মউরোসের টেপ মত চললে জানালা দিয়ে গুলি করলেও গায়ে লাগাতে পারবে না স্নাইপার। এ ছাড়া, অনিরাপদ দিকে যেন আলো না পড়ে, সেজন্যে খুলে ফেলব কিছু বাল্ব। নিরাপদ এলাকা তৈরি করা হবে বাথরুমে।' ক্যানভাস ব্যাগ টেনে নিয়ে তার ভেতর থেকে কালো কয়েকটা ছোট বাক্স বের করল সে। এসব বাক্সের সঙ্গে রয়েছে দীর্ঘ, সরু সব তার। 'রাত নামার পর বাইরে সেট করব এসব। ইনফ্রারেড অ্যালার্ম সিস্টেম। জানালা বা দরজার কাছে কেউ এলেই প্রতিটা ঘরে জানান দেবে। সেক্ষেত্রে দেরি না করে মেয়েদেরকে নিয়ে বাথরুমের মেঝেতে শুয়ে পড়বেন মিসেস ট্রি। মউরোস বা আমি ফ্লাশ করতে বললে, তখন বেরিয়ে আসবেন।'

ভিয়েতনামিয় ভাষায় ব্যাখ্যা দিল মারিয়া। ভেবেছিল অবাক হবে মহিলা, কিন্তু সহজভাবেই মেনে নিল। অবশ্য অন্য বিষয় তুলল সে, তার কণ্ঠে আপত্তি: 'আমি নিজে নিরাপদ থাকব?'

চট্ করে কর্নেলিস ও মউরোসকে দেখল মারিয়া, তারপর বলল, 'ওরা এসেছে আপনাদেরকে নিরাপদে রাখতে। ওদের কাজ আপনি আর আপনার মেয়েদেরকে রক্ষা করা।'

মাথা নাড়ল মহিলা। 'তা বলিনি। জানি না কত দিনের জন্যে আটকা পড়ছি। এরা যদি মদ খেয়ে রেপ করে আমাকে?'

জবাব দিতে শুরু করেও থেমে গেল মারিয়া। জিজ্ঞেস করল দুই মার্সেনারিকে।

কথা শুনে মনে হলো না অপমানিত হলো ওরা।

কর্নেলিস বলল, 'প্রথম কথা, বাড়ির ভেতরে অ্যালকোহল পান করব না আমরা।' চট্ করে দেখল মউরোসকে, একগাল হাসল, 'দ্বিতীয় কথা, মহিলাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলুন: আমরা দু'জন আসলে গে।'

কর্নেলিস আর মউরোসকে আরেকবার দেখে নিয়ে তাদের বক্তব্য মহিলাকে জানিয়ে দিল মারিয়া।

প্রথমবারের মত হাসল মহিলা। মাথা দুলিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি, ওঁরা মোটেও গে নন, তবে ওঁদের ওপর ভরসা রাখতে পারব। দয়া করে আমার হয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে দিন। আশা করি এ বাড়িতে অতিথি হিসেবে থাকতে পারবেন তাঁরা।'

সাতাশ

আগে কখনও রানাকে খালি গায়ে দেখেনি মারিয়া। বারবার ওর চোখ চলে যাচ্ছে সুঠামদেহী সুদর্শন যুবকের পেশিবহুল শরীরে। বুক, কাঁধ, পেটের ওপরের অংশে শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতচিহ্ন। কতবার আহত হয়েছে, ভাবতে গিয়ে ভয় লেগে গেল ওর।

কয়েক মিনিট আগে টোকা দিয়েছে এ ঘরের দরজায়।

রানা দরজা খুলতেই মারিয়া দেখেছে, ওর পরনে শর্টস্। আবারও নষ্ট হয়েছে হোটেলের এয়ার-কণ্ডিশনার। বিকেলের বদ্ধ পরিবেশে সামান্য হাওয়াও নেই। আভনের মত তপ্ত হয়ে আছে ঘরের পরিবেশ।

ফ্লাস্ক থেকে দু'গ্লাস শীতল পানি নিয়ে একটা গ্লাস মারিয়ার হাতে তুলে দিয়েছে রানা। চুপচাপ শুনেছে মেয়েটার কথা।

সঠিক সময়ে ভ্যান ট্রেং ট্রির বাড়িতে পৌঁছে গেছে জ্যাঁ মউরোস ও সিম কর্নেলিস। ওরা নিরাপদ করে তুলেছে বাড়িটা।

'যোগ্য লোক মনে হলো,' বলল মারিয়া।

মৃদু হাসল রানা। 'ওরা বেঁচে আছে তার একমাত্র কারণ ওরা যোগ্য। বহুবার বিপদে পড়ে হয়ে উঠেছে অভিজ্ঞ।'

রানার বুক থেকে চোখ সরিয়ে ওকে দেখল মারিয়া। 'তুমিও তাই?'

'হয়তো,' মৃদু হাসল রানা। গিয়ে থামল জানালার সামনে। ওখান থেকে ঘুরে তাকাল মারিয়ার চোখে। 'মনে হয় না এখানে রয়ে গিয়ে আর কোনও লাভ হবে। আগামীকাল যাব নম পেন-এ। এদিকে আরও কয়েক দিন ভ্যান ট্রেং ট্রির বাড়ির ওপর চোখ রাখবে রেমারিক।'

'ওই কাজই করছে সে, তাই না?'

মাথা দোলাল রানা। 'হয়তো অবিশ্বাস করা উচিত ভ্যান ট্রেং ট্রিকে।' ফিরে এসে চেয়ারে বসল। 'লেং সেঙের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছ, তাই উপকৃত হয়েছি। আর নদীর তীরে ওই দৃশ্য দেখতে হয়েছে, সেজন্য আমি দুঃখিত। সাহায্য করেছ বলে ধন্যবাদ।'

চুপ করে বসে আছে মারিয়া, ভাবছে।

গত ক'দিন রানা বা ওর বন্ধুদের সঙ্গে মিশে ভাল লেগেছে মানুষগুলোকে। তখন হাতে কাজ ছিল। কিন্তু তারপর অফিস থেকে বলে দিল, যা করবে, তা করতে হবে ওকে নিজ দায়িত্বে। এখন স্থির করতে পারছে না, দেশে ফিরবে কি ফিরবে না। মনের গভীরে রয়ে গেছে রানার পাশে কাজ করার আগ্রহ। কেমন হয় ওদের সঙ্গে গেলে?

‘কোনও কারণে মন খারাপ, মারিয়া?’ জানতে চাইল রানা।

উঠে দাঁড়িয়ে স্কার্ট মসৃণ করে নিল মারিয়া। ‘না, মন খারাপ না। ভাবছি, আরও ক’দিন থেকে যাই, তারপর ফিরব ওয়াশিংটনে। আশা করি ক্যামবোডিয়ায় বিপদে পড়বে না তোমরা। আমি খুশি যে টুকটাক কিছু কাজে আসতে পেরেছি।’

রানার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল মারিয়া। চেয়ারে বসে হঠাৎ করেই প্রথমবারের মত টের পেল, কখন যেন ভাল লাগতে শুরু করেছিল মানুষটাকে। সিংহের মত সাহসী এক পুরুষ, যে কি না পাশে থাকলে মনে হয় নিজে ও নিরাপদ। দৃষ্টি যদিও কখনও কঠোর, আবার কখনও নরম। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায়, বাঙালি মানুষটার অন্তরে সবার জন্যে আছে গভীর মায়া।

চিন্তায় পড়ে গেল মারিয়া। আপাতত কোনও কাজ নেই ওর। রয়ে যাবে এ দেশে? বা ক্যামবোডিয়ায় যাবে রানার দলের সঙ্গে? তাতে রাজি হবে রানা?

নিচু আওয়াজে বেজে উঠল ফোন।

কল রিসিভ করল মারিয়া।

ফোন করেছে রানা। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘এইমাত্র ফ্যাক্স করেছে লারসেন। কাজে এগোতে পেরেছে। আগামীকাল চলে যাচ্ছি।’ চুপ হয়ে গেল ও।

‘হ্যাঁ, বলো?’ বুকের ভেতর কীসের এক অভিমান এল মারিয়ার। যেন হারিয়ে বসেছে কিছু।

‘এর আগেরবার যখন আসি, কো ব্যান স্ট্রিটে এক ফ্রেঞ্চ বাবুর্চির রেস্তোরাঁয় গিয়েছি, সে ছিল ইন্দো-চিন এলাকার সেরা,’ বলল রানা, ‘শুনলাম তার দোকান এখনও চালু আছে। তুমি সন্ধ্যায় ফ্রি থাকলে ডিনারে যেতে পারি ওখানে।’

কয়েক সেকেণ্ড ভাবল মারিয়া, তারপর বলল, ‘তুমি বোধহয়

নিয়ম অনুযায়ী ধন্যবাদ দিতে চাইছ? তার কোনও দরকার নেই। আমি শুধু পালন করেছি নিজের ডিউটি। তবে খুশি হব ফ্রেঞ্চ ওই রেস্তোরাঁয় ডিনারে যাওয়ার সুযোগ পেলে।'

'ঠিক আছে, সাতটের সময় তোমাকে তুলে নেব,' বলল রানা।

আটাশ

বাক্সের ডালা তুলে হাঁ হয়ে গেল মিস্টার উবোন। বিরাট এক লাফ দিয়েছে হৃৎপিণ্ড। এবার আর বাক্সের ভেতর কোনও ওপাল পাথর নেই! আসলে কোনও রত্নই নেই! আছে ছয়টা বড় জেড পাথরের টুকরো। আগে কখনও এত বড় জেড দেখেনি সে।

নিজেকে সামলে দায়নার দিকে তাকাল মিস্টার উবোন।

টেবিলের ওদিক থেকে তার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে যুবতী। আগের মতই বসে আছে তারা সেই জঙ্গলের ভেতরের কেবিনে। দায়নার দু'পাশে কালো পোশাকে দু'মহিলা, কোমরে হোলস্টার।

গত তিনবার ব্যবসা করে দুর্দান্ত মুনাফা পেয়েছে মিস্টার উবোন। যে দামে কিনেছে, বিক্রি করেছে তার দেড়গুণ দামে।

পাথরের ছোট একাংশে আছে 'উইংগো', পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাদাটে ইমপিরিয়াল জেড। ওই জিনিস পাওয়া যায় শুধু মায়ানমারের উত্তর দিকের পাহাড়ে।

রত্নের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নয় মিস্টার উবোন, কিন্তু মনে মনে

কষছে টাকার অঙ্ক। চেহারা নির্বিকার রেখে জিজ্ঞেস করল, 'এগুলোর জন্যে কত চান?'

সামনে ঝুঁকে নিচু, শীতল কণ্ঠে বলল দায়না, 'বারো লাখ ডলার। কোনও দরদাম চলবে না। আপনি আগ্রহী না হলে আমি নিজেই ওগুলো নিয়ে যাব ব্যাংককে।'

ধূসর পাথর আবারও দেখল মিস্টার উবোন। বিড়বিড় করল, 'অনেক টাকার ব্যাপার।'

'মোটেও তা নয়,' সাফ বলে দিল দায়না, 'এসব জেড অন্যরকম। আগের তিনবার মুনাফা না করলে আজ এখানে আসতেন না। ভাল করেই জানেন, এসব জেডের মূল্য কত। এসব সরাসরি রেঙ্গুন বা হংকঙের নিলামে যায়। অন্তত আট লাখ ডলার দিতে হবে, নইলে বিক্রি করব না এ-জিনিস। আপনি নিজে এর দ্বিগুণ মুনাফা করবেন।'

ব্যবসায়ীর চোখ দেখছে দুই মহিলা।

মিস্টার উবোনের চোখে তীব্র লোভ।

হঠাৎ বাক্স বন্ধ করল উবোন, মাথা দোলাল। মানি বেল্ট থেকে বের করল বেশ কয়েক বাণ্ডিল ডলার।

পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে গেল মিস্টার উবোন, জানল না ন্যাংটো করে দেয়া হয়েছে তাকে।

দুই মহিলার দিকে চেয়ে হাসল দায়না। ওই হাসি সেই বিড়ালের, যার সামনে রাখা হয়েছে তাজা গলদা চিংড়ি। আবারও মনোযোগ দিয়ে টাকা গুনতে লাগল দায়না।

ঘরে ঢুকে দায়নার সামনে পাহাড়ের মত উঁচু বাণ্ডিল দেখে কপালে ভুরু তুলল কুয়েন আন টু। জানতে চাইল, 'ভাল ব্যবসা হলো?'

মুচকি হাসল দায়না। 'নিশ্চয়ই! এরপর আর আসছে না মিস্টার উবোন। যখন ব্যাংককে গিয়ে সত্যিকারের এক্সপার্টকে

দেখাবে ওসব পাথর, সে বলে দেবে, আট লাখ ডলার দিয়ে উবোন কিনে এনেছে আলাস্কান জেডাইট— যার দাম বড়জোর পঞ্চাশ ডলার।' আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল দায়না। 'সত্যিই জানি না কোন্‌টা আমাকে বেশি আনন্দ দেয়— সেক্সুয়াল প্লেযার, না থাই ব্যবসায়ীর কলজে উপড়ে নেয়া!'

হাসল কুয়েন আন টু, চোখ সরাতে পারল না ডলারের বাণ্ডিলের উপর থেকে। জানতে চাইল, 'ব্যাংককে চমৎকার কাটল সময়?'

স্মৃতি মনে পড়তেই হাসল দায়না। 'হ্যাঁ, দারুণ! আগে কখনও এত ভাল লাগেনি।'

'সামনে আরও ভাল সময় আসছে,' বলল কুয়েন আন টু। 'নতুন খবর পেলাম। ডেইন আর ফ্রেঞ্চ লোকদুটো পৌঁছে গেছে নম পেন-এ, একঘণ্টা আগে উঠেছে ক্যামবোডিয়ানা হোটেলে।'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিল দায়না। মুহূর্তে ভুলে গেছে টাকার কথা। জিজ্ঞেস করল, 'তো অনুসরণকারীকে ধরে ফেলেছে ওরা?'

'অবশ্যই। খুব ধূর্ত লোক ওই মাসুদ রানা। বোধহয় টাকাও আছে মেলা। ভিয়েতনাম থেকে এখনও রিপোর্ট দিচ্ছে ওর অনুসরণকারী লোকটা। চোখ উল্টে নিয়েছে। রাজধানীতে রয়ে গেছে রানা। কিন্তু উধাও হয়েছে ওর বন্ধু ভিটেলা রেমারিক।'

ভাবছে, কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা দোলাল দায়না। 'হ্যাঁ, বুদ্ধিমান লোক। সামনে বিপদ আছে বুঝে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে লোক। এরপর দেরি না করে চলে আসবে সে। আর তখনই দ্বিতীয় স্টেজের কাজ ধরব আমরা।' চোখ সরু করল দায়না। 'তুমি না লোকটাকে বলেছিলে, মুখ খুললে খুন হয়ে যাবে ওর বউ-বাচ্চা?'

'হ্যাঁ, বলেছি। তাতে রানার পক্ষে আরও জটিল হয়েছে আমাদেরকে বোঝা।'

'গুড। রানা ভিয়েতনাম ছেড়ে এদিকে রওনা হলেই ব্যবস্থা নেবে, যাতে ঝাড়েবংশে শেষ করে দেয়া হয় ভ্যান ট্রং ট্রির পরিবারকে।'

'এটা কি জরুরি?'

'অবশ্যই! কেউ যেন হালকা চোখে না দেখে আমাদেরকে। হুমকি দেয়ার পরেও বাড়াবাড়ি করলে, বুঝিয়ে দিতে হবে, যা-তা লোক নই আমরা। ছড়িয়ে পড়বে কথাটা। ভয় পাবে অন্যেরা। তাতে সুবিধা হবে ব্যবসা করতে।'

ঊনত্রিশ

কোনও মেন্যু দেখানো হলো না। রানাকে জড়িয়ে ধরল বিস্ট্রোর মালিক, দু'গালে দিল দুটো চুমু। অতীতে একই মার্সেনারি দলে কাজ করেছে ওরা। সবসময় যোগাযোগ ছিল ই-মেইলে। চার বছর আগে ড্রাগ লর্ড আর ড্রাগ উৎপাদনকারীদের ছিন্নভিন্ন করে দেয়ার সময় রানাকে জরুরি সব তথ্য জোগাড় করে দিয়েছে সে। রানার গালে চুমু দেয়ার পর মারিয়ার হাতে চুমু দিল ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁর মালিক ম্যাসেমো। ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল এক কোণের নির্জন এক টেবিলে।

প্যারিসের আর সব সাধারণ বিস্ট্রোর মতই এই রেস্তোরাঁ। টেবিলে চেক কাপড়ের ঢাকনা, দেয়ালে নানান তৈলচিত্র। বাড়ির তৈরি খাবারের মতই সুস্বাদু প্রতিটা খাবার, গোলমাল পাকাবে না পেটে গিয়ে। রানা ও মারিয়াকে দেয়া হলো মাছের ঘন সুপ,

তারপর বাচ্চা ভেড়ার মাংস, সঙ্গে ফ্রেঞ্চ পনির ও স্থানীয় ফলমূল।

এসবের ভেতর পার্থক্য হচ্ছে: টেবিলে বৈদ্যুতিক বাতির বদলে জ্বলল মৃদু আলোর মোমবাতি। প্যারিসে সাধারণত এমন ঘটে না। ওয়াইন যা দেয়া হলো, সেটা দুর্দান্ত। রানার সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে কি না জানে না বলেই হয়তো, একটু বেশিই পান করল মারিয়া।

কথা কমই হলো ওদের ভেতর। আসলে বলার মত কোনও বিষয় খুঁজে পেল না ওরা। রানা লক্ষ করল, মাঝে মাঝে কী যেন ভাবছে মেয়েটা। মোমবাতির আলোয় ওকে লাগছে অপ্সরার মত। কী ভাবছে, কে জানে। রানার মনে হলো, ওর দিকে চেয়ে লালচে হয়ে উঠছে মারিয়ার দু'গাল। রানা তাকালে দৃষ্টি সরিয়ে অন্য দিকে দেখছে মারিয়া। ওরা দু'জন যেন পরস্পরের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছে কিছু। নিজেকে সদ্য প্রেমে পড়া তরুণ-তরুণী বলে মনে হচ্ছে ওদের। যদিও দু'জনের কেউ স্বীকার করবে না মরলেও।

ব্যস্ত রেস্তোরাঁ, কিন্তু মোটেও হৈ-হল্লা নেই। মৃদু আওয়াজে বাজছে জনপ্রিয় ফ্রেঞ্চ গানের মিউযিক। মারিয়া দেখল, হঠাৎ করেই বার-এর মালিকের দিকে তাকাল রানা। স্টুলে বসে আছে লোকটা, হাত তুলে স্যালুট দিল। জবাবে স্যালুট দিল রানাও।

'কী ব্যাপার?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

একটু দ্বিধা করল রানা, তারপর বলল, 'ওটা ওর অভ্যেস।'

'অভ্যেসটা হলো কী করে?'

'বলতে গেলে সময় লাগবে।'

'তা-ও শুনি।'

'বেশ, সংক্ষেপে বললে, কঙ্গোর সীমান্ত থেকে দশ মাইল ভেতরে আহত হয়ে পড়ে গিয়েছিল,' বলল রানা, 'আমরা তখন পিছিয়ে যেতে শুরু করেছি। দলের কেউ খেয়াল করেনি ম্যাসেমো

আমাদের সঙ্গে নেই। আর যখন বুঝলাম ও নেই, ততক্ষণে আমরা পিছিয়ে এসেছি প্রায় দশ মাইল দূরে।' চুপ হয়ে গেল রানা, চোখে স্মৃতির ছায়া।

'তারপর?'

সহজ সুরে বলল রানা, 'সন্ধ্যার আঁধারে আবারও ফিরলাম। ওকে পেলাম নির্যাতন কেন্দ্রে বন্দি অবস্থায়। নয়জন সৈনিক আর দু'জন অফিসারকে শেষ করে বেরিয়ে এলাম ওকে নিয়ে।'

'ব্যস? ফিরলে কী করে?' সামনে ঝুঁকে বসল মারিয়া।

'বিদ্রোহীদের একটা জিপ কাজে এসেছিল।'

'তাড়া করেনি ওরা?'

'করেছিল। দেড় মাইল যাওয়ার পর জিপের পেছনে এসে লাগল লঞ্চ করা গ্রেনেড। তার আগেই ম্যাসেমোকে নিয়ে নেমে পড়ে পালাতে শুরু করি পাহাড়ি এলাকায়।' রানা বুঝে গেছে, পুরো না শুনে ছাড়বে না এ মেয়ে। 'বাকি সাড়ে আট মাইল ওকে কাঁধে তুলে ফিরে আসি নিজেদের ক্যাম্পে।'

'তার মানে প্রতিটা মুহূর্তে তাড়া খেয়ে পালাতে হয়েছে?'

'ঠিক তা নয়, আমাদের ক্যাম্পের দু'মাইল আগে হাল ছেড়ে দেয় ওরা।'

মারিয়া বুঝে গেল, কেন ওর বন্ধুরা এত ভালবাসে মাসুদ রানাকে। মনে পড়ল, ইণ্টারপোল থেকে পাওয়া ফাইলের তথ্য। এই মানুষটা কখনও হয়ে উঠেছে দেবতা, কখনও আবার মৃত্যু-দূত। চোখ থেকে প্রশংসা লুকাতে পারল না মারিয়া। একবার ঢোক গিলল। মুখে স্বীকার করবে না, কিন্তু বড্ড ইচ্ছে হলো মানুষটাকে খুব কাছে পেতে।

খানিকটা ঠাট্টার সুরে বলল রানা, 'মনে পড়ে না আগে কখনও কোনও ইউএস আর্মির মহিলা ক্যাপ্টেনকে নিয়ে ডিনারে এসেছি।'

মারিয়ার হাসিটা খুব মিষ্টি, যেন কলকল করে উঠল উচ্ছল ঝর্না। 'তা হলে বুঝি আমার উচিত ছিল ইউনিফর্ম পরে আসা?'

গম্ভীর চেহারায় মাথা নাড়ল রানা। নির্দ্বিধায় স্বীকার করল, 'না। ভাল লাগত না তাতে। দুর্দান্ত মানিয়ে গেছ তোমার এই পোশাকে। সত্যিই, অদ্ভুত সুন্দর লাগছে।'

কথাটা শুনে খুব ভাল লাগল মারিয়ার। মনে হলো, বহুদিন পর কেউ প্রশংসা করল। সেই সুযোগই তো নেই, কোনও পুরুষ এগোতে গেলেই তাকে বাধা দেয়। আসলে সেই কিশোরী বয়সে স্কুলের ওই টিচার জোরাজুরি করে ধর্ষণের চেষ্টা করার পর থেকেই দূরত্ব বজায় রেখেছে পুরুষদের কাছ থেকে। সেই স্যারের গালে কষে চড় দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল ও স্কুল থেকে। আর ফেরেনি ওখানে। কেন স্কুলে যাবে না, তা-ও বলেনি কাউকে। পরে চাচাত ভাই ভর্তি করে দিয়েছিল অন্য স্কুলে।

'কোনও মেয়ে নেই তোমার জীবনে?' আমেরিকান স্টাইলে সরাসরি জানতে চাইল মারিয়া।

কয়েক সেকেণ্ড ভাবল রানা, তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'না, আসলে মেয়েরা সংসার চায়। যেটা আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয়?' ভুরু নাচাল মারিয়া। একটু যেন হতাশ।

'এখানে আসার আগে আমার ফাইল পড়েছ,' সহজ সুরে বলল রানা, 'তুমি জানো, আমি কাউকে কাছে টানলে তা হবে তার প্রতি আমার চরম অন্যায়। না পাবে সে সংসার, না আমাকে। জ্বলবে, আমিও জ্বলব। অথচ কিছুই করতে পারব না।'

'তার মানে তুমি কখনও সংসার করবে না?'

'হয়তো কখনও। যদি বুঝি সংসার করতে পারব।'

মাথা দোলাল মারিয়া। 'বুঝতে পেরেছি। মস্ত সব বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ো, কখনও দেশের জন্যে, কখনও সাধারণ যে-কোনও

মানুষের বিপদে— আমার কিন্তু হিংসে হচ্ছে তোমাকে। যদি পারতাম তোমার মত হতে। কিন্তু জানি, পারব না। সবার যোগ্যতা সমান হয় না।' নিজের ক্ষুদ্রতা গোপন করছে না ও।

'গত কয়েক দিন ধরে তোমাকে দেখছি,' বলল রানা, 'অস্বীকার করব না, পছন্দ করার মতই মেয়ে তুমি। শুধু আমি না, আমাদের সবাই তোমাকে পছন্দ করে। যাক, বহু কিছুই জানতে চাইলে। এবার তোমার পালা, বলবে না তোমার কৈশোর, তারুণ্য বা বর্তমান সময়ের কথা?'

'কৈশোর?' হাসল মারিয়া। 'কষ্টের। বাবাকে হারিয়েছি কম বয়সে। তারও আগে হারিয়ে বসেছি মাকে। তার কথা আমি মনে রাখতে চাই না।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করেও পরক্ষণে বলল রানা, 'নিশ্চয়ই কারণ আছে। দুঃখিত, জানতে চাওয়া উচিত হয়নি আমার।'

'আমি কিছু মনে করিনি,' বলল মারিয়া। ঠিক করেছে গোপন করবে না কিছুই। খুব সংক্ষেপে নিখুঁত একটা চিত্র পেয়ে গেল রানা। ওর বাবা নেই, মা-ও নেই। বড় হয়েছে প্রায় একা। এক শিক্ষক ওকে ধর্ষণের চেষ্টা করার পর থেকে এড়িয়ে গেছে পুরুষদেরকে। লেখাপড়ার ফাঁকে যোগ দিয়েছে আর্মিতে। কিন্তু অফিসই হোক, বা ব্যক্তিগত জীবন, কোথাও নাক গলাতে দেয়নি কাউকে।

খুব সংক্ষেপে কারও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলতে গেলেও সময় লাগে। কিন্তু সাত মিনিটে নিজের গল্প শেষ করল মারিয়া।

কোনও মন্তব্য না করে চুপচাপ শুনল রানা। ও নিজেও সেই ছোটবেলা থেকে একা। টের পেল, অদ্ভুত এক বন্ধন তৈরি হয়েছে ওদের ভেতর। আরও কিছুক্ষণ পর আর কোনও কথা থাকল না ওদের।

একবার হাতঘড়ি দেখল রানা। 'তোমাকে হোটেলে নামিয়ে

দিয়ে আরেক জায়গায় যাব। চলো উঠে পড়ি।'

'কোথায় যাবে? আমার তো কোনও কাজ নেই। তোমার আপত্তি না থাকলে সঙ্গে যেতে পারি।'

'বেশ, চলো। কাছে। হেঁটেই যাই।'

উঠে পড়ল ওরা।

www.boighar.com

ডিনারের বিল মিটিয়ে দিতে গেল রানা, কিন্তু পাছা বরাবর ম্যাসেমোর হাতের বেমক্কা এক চাপড় খেয়ে সিদ্ধান্ত নিল, জীবনে আর ওই ব্যাটাকে টাকা সাধবে না।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে নদীর তীর ধরে ভাটির দিকে চলল রানা ও মারিয়া। আধ মাইল পর থামল বড় এক সাদা দালানের সামনে। মেইন গেটের ওপর বড় করে লেখা: সেন্ট পল্'স্ অর্ফানেজ। মারিয়াকে নিয়ে দালানে ঢুকে নানদের অফিসে হাজির হলো রানা।

www.boighar.com

'রানা!' খুশি হয়ে ডেস্কের পেছন থেকে উঠে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধা নান। 'অনেক দিন পর!'

'কেমন আছেন, সিস্টার? বাচ্চারা কেমন?'

'ভাল, তবে ভাল থাকতাম না দু'মাস আগে তোমার ব্যবস্থা করে দেয়া ডোনেশনটা না পেলে। তোমার বন্ধুর ওই অর্গানাইযেশন থেকে ছেলে-মেয়েদের জন্যে নতুন খাট, তোষক, মশারী, চাদর, বালিশ... সবই পাঠিয়ে দিয়েছে। চলো, দেখবে।'

কথাগুলো শুনে চট্ করে একবার রানাকে দেখল মারিয়া। ফাইল অনুযায়ী মাসুদ রানা মুসলিম, কিন্তু বাচ্চাগুলো কোন্ ধর্মের তা দেখতে যায়নি, এতিমখানার জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছে ডোনেশনের। এখন নিজে এসেছে খোঁজ-খবর নিতে। অন্তরে বুঝে গেল মারিয়া, রানা আসলে মানব-ধর্ম বিশ্বাস করে। ভাল কোনও কাজে যে-কোনও মানুষের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে দ্বিধা নেই ওর।

ওদেরকে নিয়ে মস্ত এক ঘরে এলেন নান। মারিয়ার মনে হলো চারপাশে ভাসছে সাদা কুয়াশা। সারি সারি মশারী ঘেরা বেড। নয়টা বাজার আগেই শুয়ে পড়েছে বাচ্চারা। সরু পথ ধরে চলতে চলতে এতিমখানার কাজ মারিয়াকে বোঝাতে লাগলেন সিস্টার লিণ্ডা জনসন। একটা খাটের পাশে থেমে মশারী তুলে কোলে তুলে নিলেন এক শিশুকে। বয়স হবে ওর বড়জোর পাঁচ মাস। পুতুলের মত সুন্দর। মেয়ে। ফোঁপাচ্ছিল, লাল হয়ে গেছে গাল।

নানের বামদিকের বেড থেকে চ্যাঁ করে উঠল আরেক বাচ্চা। 'একটু ধরো,' বলে বাচ্চাটাকে মারিয়ার হাতে দিলেন সিস্টার। তুলে নিলেন ক্রন্দনরত শিশুকে। পিঠে মৃদু চাপড় দিতে দিতে গুনগুন করে গান শোনাচ্ছেন।

এদিকে অবাক চোখে মারিয়াকে দেখছে আর ঠোঁট ফুলিয়ে কান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওর কোলের শিশুটা। একটু একটু দুলিয়ে নিজেও মৃদু কণ্ঠে গান ধরল মারিয়া। ওকে পছন্দ হয়েছে পিচ্চির, থেমে গেল কান্না। গানের ফাঁকে একবার রানাকে দেখল মারিয়া। মৃদু হেসে বলল, 'ভবিষ্যতে বিয়ে করেও ফেলতে পারি!' জীবনের অন্য অর্থ যেন বুঝতে শুরু করেছে ও।

ত্রিশ

ক্যামবোডিয়ান হোটেলের এক বাংলো বাড়ির প্যাটিয়োতে বসে আছে পিটার লারসেন ও ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স। অন্তত এক শ' ফুল

ফুটেছে সামনের মায়াবী বাগানে, জায়গাটা যেন নেমে এসেছে স্বর্গ ছেড়ে। আকাশে লণ্ঠনের মত ঝুলছে গোল, মস্ত এক চাঁদ। সেই রুপালি আলোয় চিকচিক করছে বাংলোর দেয়ালে বোগেনভিলা। তানপুরার একটানা আওয়াজ তুলেছে ঝিঁঝিপোকা। বাতাস ভারী, তাতে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার অদ্ভুত এক সুবাস।

সম্পূর্ণ তৃপ্ত লারসেন। নদীর তীরে ছোট এক ছাতহীন রেস্তোরাঁয় স্থানীয় খাবার খেয়ে এসেছে ওরা। সঙ্গে ছিল ফুলজেন্সের বাছাই করা ক্ল্যারেট। বাংলোয় ফিরে চমক দেখিয়ে সুটকেস থেকে এক বোতল ডিউটি ফ্রি হেনেসি এক্সও বের করেছে পেঁচা। সে-সময়ে স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে লারসেন। দেশে স্ত্রী ও মেয়ে ভাল আছে। আর আজ দিনটাও গেছে ভাল। পেশাদারি দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হবে, আজ অনেক জরুরি তথ্য পেয়েছে ও।

দুপুর বারোটার দিকে এ দেশে পা রেখেছে। পরের দু'ঘণ্টার ভেতর বের করে ফেলেছে, কোন্ ফ্যাক্স নম্বরে যোগাযোগ করে ভ্যান ট্রেং ট্রি। লারসেনের কাজ দেখে প্রশংসা না করে পারেনি ফুলজেন্স। সে কারণেও মনটা ফুরফুর করছে। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি ওরা গেছে ফুনান টেলিকমিউনিকেশন কর্পোরেশন অফিসে। লারসেনের হাতে ছিল নকল ব্যবসায়িক কার্ড। রিসেপশনিস্ট মেয়েটাকে মনোমুগ্ধকর হাসি দিয়ে বলেছে, ঠিক কোন্ টেকনিকাল এগযেকিউটিভের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ও। রিসেপশনিস্ট ওদের দু'জনকে সাজানো একটা অফিসে নিয়ে যেতে একটু অবাকই হলো লারসেন। ডেস্কের পেছনে বসে আছে রোদে পোড়া এক অস্ট্রেলিয়ান। উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করল সে। 'সমস্যা কী, মাইট?'

'পরে বলছি, আগে জেনে নিই, এখানে কোত্থেকে এল এক অস্ট্রেলিয়ান?' পাল্টা জানতে চাইল লারসেন।

অফিসের কোণে ফ্রিয রেখেছে লম্বু শ্বেতাঙ্গ, ওখান থেকে তিনটে হিমশীতল লাগার বিয়ার নিয়ে বুঝিয়ে দিল, আসলে সে অতিথি-পরায়ণ লোক। তার কোম্পানি কাজ করছে ফুনান টেলিকমিউনিকেশন কর্পোরেশন অফিসের সঙ্গে যৌথভাবে। চেহারায় বিরক্তি নিয়ে স্বর্গের দিকে আঙুল তাক করে বলল, 'এখনও সব আসছে সেই পুরনো রাশান স্যাটালাইটের মাধ্যমে। আপনি ফোন, ফ্যাক্স বা ইন্টারনেট সব ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু পরের শহরে ফোন করতে পারবেন না।' হাতের ইশারা করল চেয়ারে বসতে।

আসন দখল করে ওর সমস্যা খুলে বলল লারসেন। সে কোপেনহেগেনের এক এক্সপোর্টার, তার কাজ মাংসের প্রোডাক্ট বিক্রি করা। গত একমাস ধরে এ দেশে খাবার সাপ্লাইয়ের বিষয়ে একটি কোম্পানির সঙ্গে ফ্যাক্স চলছে, আর দু'পক্ষই মনে করছে ভাল ব্যবসার সুযোগ আছে। এবার হো চি মিন সিটি, ব্যাংকক আর হংকঙে ব্যবসায়িক কাজে এসে ঠিক করেছে, একবার নম পেন-এ ঢুঁ মেরে দেখবে ব্যবসার কাজ এদিকেও কিছুটা এগিয়ে রেখে যাওয়া যায় কি না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, হো চি মিন সিটিতে এসে এয়ারপোর্ট থেকে চুরি হয়ে গেছে তার ব্রিফকেস। ওটার ভেতর ছিল দরকারী সব ফাইল। এমন কী যে-কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করবে ঠিক করেছে, তাদের নামও বলতে পারবে না। কিন্তু ওর ঠিক মনে আছে তাদের ফ্যাক্স নম্বর।

সাদা মনে লারসেনকে সহায়তা দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান। ডেস্কে রাখা কমপিউটারে নম্বর তুলে দিয়ে এণ্টার কি টিপে দিতেই স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে নির্দিষ্ট নম্বর। খুশি খুশি স্বরে বলেছে অসি, 'বিংগো! ওটা ক্যামবোডিয়ানা হোটেলের বিযনেস সেণ্টারের তিন ফ্যাক্সের একটা।'

ততক্ষণে পকেট নোটবুক কমপিউটার বের করে ফেলেছে

লারসেন, টুকে নিতেও দেরি হয়নি দরকারী তথ্য। এরপর জিজ্ঞেস করেছে, 'আচ্ছা, আপনি কি কোনওভাবে জানতে পারবেন ওই ফ্যাক্স চালাচ্ছিল কে?'

মাথা নেড়ে বলেছে অস্ট্রেলিয়ান, 'ওই তথ্য দিতে পারবে শুধু হোটেল কর্তৃপক্ষ। ওটার ম্যানেজার এক ফ্রেঞ্চ, নাম থিয়েরিনা আঁরি। সে সাহায্য করতে পারে, আবার না-ও পারে। মহিলা গায়ে-পড়া টাইপের। বোঝেনই তো ফ্রেঞ্চরা কেমন হয়!'

চওড়া হেসে পেঁচাকে দেখিয়ে দিল লারসেন। 'বুঝি না মানে? এটাও তো আরেকটা ফ্রেঞ্চ!'

দমে যাওয়ার লোকই নয় জন ব্র্যাণ্ডন, পেঁচার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলেছে, 'কোনও কোনও ফ্রেঞ্চ ঠিকই আছে। অনেক দিন আগে দুর্দান্ত সুন্দরী এক ফ্রেঞ্চ গার্লফ্রেণ্ড ছিল আমার।'

'ওটা কি ভাল হোটেল?' জানতে চেয়েছে লারসেন।

'হ্যাঁ, দেশের সেরা। সবচেয়ে বড়ও। নদীর তীরে। পুরো এয়ার-কণ্ডিশণ্ড। খাবারও দারুণ। বিশাল বার। যদি থাকতে চান, বেছে নেবেন ক্যামবোডিয়ান হোটেল। ওটার সঙ্গেই আছে একের পর এক বাংলো। তবে একটা কথা, তাতে যে টাকা খরচ হবে, মনে হবে ওরা কেটে নিচ্ছে আপনার আস্ত হাতটাই।'

উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে লারসেন, 'তাতে কী। চমৎকার চলছে ব্যবসা। পরে হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা হবে হোটেলের বার-এ। তখন আপনার স্বাস্থ্য পান করব, সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

এরপরের কাজ ছিল সহজ। বাংলোতে উঠে হোটেলের বিযনেস সেণ্টার ঘুরে দেখল ওরা দু'জন। অত্যন্ত আধুনিক সব ব্যবস্থা। কাজ করছে তিনটে ফ্যাক্স, টেলেক্স, ফোন ও গোটা দশেক কমপিউটার। দেখতে মিষ্টি, হাসিখুশি ক্যামবোডিয়ান-ফ্রেঞ্চ ম্যানেজারেসের সঙ্গে পরিচিত হলো। বাংলোর জন্যে এক

সপ্তাহের নগদ টাকা পরিশোধ করল লারসেন। তখনই বলল, প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটের মধ্যে জরুরি কিছু ফ্যাক্স আসবে ওর কাছে। এ কথা শুনে মহিলা বলল, কোনও চিন্তা নেই, ফ্যাক্স পৌঁছলেই সরাসরি ওর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে। গলা নিচু করে লারসেন বলল, খুব গোপনীয় ব্যবসায়িক ফ্যাক্স তো, তাই ভাবছে ওই সময়ে বিযনেস সেন্টারে উপস্থিত থাকা যাবে কি না। ডেনমার্কের মস্তবড় এই ব্যবসায়ী কী চাইছে বুঝল মহিলা। মাথা দুলিয়ে বলল, ঠিক আছে, লারসেন থাকতে পারে ওখানে। আর অর্ডার দিলে রুম সার্ভিস থেকে ওকে পৌঁছে দেয়া হবে খাবার ও ড্রিঙ্ক।

ফলে নির্দিষ্ট সময়ে বিযনেস সেন্টারে হাজির থেকেছে লারসেন, ওদিকে হোটেলের বাইরে ট্যাক্সিসহ অপেক্ষা করেছে পেঁচা।

বিযনেস সেন্টারে কোনও ভিড় নেই। বিকেল পাঁচটা থেকে পাঁচটা তিরিশ মিনিটের ভেতর এল তিনজন চাইনিজ ব্যবসায়ী, ফ্যাক্স পাঠাল, কয়েক মিনিটেই পেয়ে গেল জবাব। পৌনে ছয়টায় কফি ও বার্গারের জন্যে অর্ডার দিল লারসেন। ছয়টা পাঁচ মিনিটে দরজা ঠেলে ঢুকল পাতলা এক লম্বা ক্যামবোডিয়ান লোক। পরনে বিযনেস স্যুট, হাতে ব্রিফকেস। লারসেনের উদ্দেশে একবার মাথা দুলিয়ে চলে গেল ফ্যাক্স মেশিনের টেবিলের পাশে, বসল চেয়ারে। বার্গারে কামড় মেরে তিন সপ্তাহ আগের টাইম ম্যাগাযিনে চোখ বোলাল লারসেন। তখনই জ্যান্ত হয়ে উঠল সেন্টারের ফ্যাক্স মেশিন। ক্যামবোডিয়ান লোকটার মতই লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল লারসেন, পৌঁছে গেল কাগজ বেরোতে শুরু করা মেশিনের সামনে। ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, 'আমার একটা ফ্যাক্স আসার কথা।'

'আমারও,' হাসল ক্যামবোডিয়ান।

গোল পাকিয়ে বেরোচ্ছে কাগজ। ওটার মাথা ঘুরিয়ে পোস্টস্ক্রিপ্ট পড়ল ক্যামবোডিয়ান। দুঃখিত চেহারা করে বলল, 'এটা আমার জন্যে।' মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে কাগজটা ঢেকে ফেলল সে। তবে তার আগে পড়ে ফেলেছে লারসেন: মালাম।

ওই নাম নিয়ে এ দেশে ফ্যাক্স পাঠাচ্ছে ভ্যান ট্রং ট্রি। তার মানেই এর পিছু নিলে ওরা বুঝবে, কে বা কারা ডেকে আনতে চাইছে রানাকে। ওখানে দাঁড়াল না লারসেন, আবারও গিয়ে সিটে বসে চোখের সামনে মেলে ধরল ম্যাগাযিন। ওটার ওপর দিয়ে দেখছে ক্যামবোডিয়ানকে।

মাত্র একবার ফ্যাক্স পড়ল সে, তারপর কাগজটা ব্রিফকেসে রেখে বেরিয়ে গেল। পাঁচ সেকেণ্ড পর লবিতে বেরোল লারসেন, দেখল এণ্ট্র্যান্সের কাছে পৌঁছে গেছে লম্বু খুঁটি। সে বেরিয়ে যেতেই পিছু নিল ও। অপেক্ষারত এক কালো মার্সিডিয গাড়িতে চেপে বসেছে লোকটা। বারান্দা থেকে পেঁচার উদ্দেশে মাথা দোলাল লারসেন। ফলে একলাফে ট্যাক্সির পেছনের সিটে চেপে বসল ফুলজেন্স।

ফিরল সে বিশ মিনিট পর। লারসেনকে বলল, 'ওই লোক গেছে আচার হেমচিয়ে বুলেভার্ডে। যে অফিসে ঢুকেছে, ওটার নাম দায়না ট্রেড কোম্পানি।'

কথা শুনে আবারও বিযনেস সেণ্টারে ঢুকল লারসেন, ফ্যাক্স করল হো চি মিন সিটিতে কণ্টিনেণ্টাল হোটেলে, রানার কাছে। কাজটা শেষ করে পেঁচাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ডিনার সারতে। সুস্বাদু আর দামি খাবার ওদের প্রাপ্য।

একত্রিশ

হোটেলের বার-এ বসে আছে রানা ও মারিয়া। কোনও ভিড় নেই মস্ত ঘরে। মৃদু শব্দে বাজছে মিউযিক। গত কয়েক ঘণ্টায় মানসিক দিক থেকে অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে ওরা দু'জন।

মাত্রাতিরিক্ত ড্রিঙ্ক করেনি রানা, পরিষ্কার বুঝতে পারছে, একটু বেশি হয়ে গেছে মারিয়ার।

আবারও বলল মারিয়া, 'রানা, সত্যিই, ভাবা কঠিন, মাত্র কয়েক দিনের ভেতর সব গুছিয়ে নিয়েছ। এখনও দশ দিন পেরোয়নি জর্জ হার্টিগানের বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার ব্রাসেলস-এ। মাত্র এক সপ্তাহ আগে আমরা পড়লাম তোমার ওপর লেখা ইন্টারপোল রিপোর্ট। আর এরই ভেতর চলে এসেছ হো চি মিন সিটিতে। তোমার চারপাশে ডিফেন্সিভ টিম, আরেক টিম কাজ করছে নম পেন-এ তথ্য জোগাড় করতে। তোমার জড় করা ওই দুটো টিমকে দেখেছি। মনে মনে প্রশংসা না করে পারিনি। তোমার মত আর কাউকে দেখিনি, যে সঠিক সময়ে সঠিক লোক জোগাড় করতে পারে।'

'কাজটা কঠিন নয়,' বলল রানা। 'ওদেরকে বহু দিন ধরে চিনি।' মারিয়ার চোখে চোখ রাখল ও। 'অনেক কাজে এসেছে তোমার সাহায্য। খারাপ লাগবে তুমি ফিরে গেলে।'

চকচক করছে মারিয়ার চোখ। স্টুলে ঘুরে রানাকে দেখল। 'খারাপ লাগবে না, কারণ ট্যাক্সি করে আসার সময় সিদ্ধান্ত

নিয়েছিঃ আমি আপাতত ওয়াশিংটনে ফিরছি না। আমি সরকারী ছুটিতে আছি। তোমার দলে কাজ করতে চাই। তোমার আপত্তি না থাকলে আগামীকাল তোমার সঙ্গে যাব নম পেন-এ।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'পরিস্থিতি ওখানে অন্যরকম হতে পারে। হয়তো মস্ত বিপদে পড়ব। চাই না তোমার নিতে হোক বাড়তি ঝুঁকি।'

মৃদু হাসল মারিয়া। 'প্লিয, রানা, আমি থাকতে চাই এই মিশনে। যে গতি তুলে কাজ করছ, আগামী এক বা দুই সপ্তাহের ভেতর শেষ হবে সব ঝামেলা। তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। নম পেন-এ আমাদের অফিস আছে। হয়তো ওটা কাজে আসবে। আর ভুলো না, ওই দেশের ভাষাও জানি। কাজে লাগতে পারি।'

আবারও মাথা নাড়ল রানা।

তাতে মারিয়া বলল, 'তা ছাড়া, আমি যদি তোমার সঙ্গে না যাই, আমার মনে হবে জরুরিভাবে যোগাযোগ করা উচিত ওয়াশিংটনে—ওই দেশে দেখা গেছে আমেরিকান এমআইএ।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'তুমি কিন্তু ব্ল্যাকমেইল করছ।'

'তাই ধরে নাও।' রানার দিকে চেয়ে নিজেও গম্ভীর হতে চাইল মারিয়া, যদিও ঠোঁটে মৃদু হাসি। 'বেশি কিছু চাইছি না, রানা, শুধু দেখতে চাই শেষ পর্যন্ত কী হয়। তা ছাড়া, সত্যি বলতে এটাই ছিল আমার দায়িত্ব।'

রানার চোখে চেয়ে আছে মারিয়া।

কয়েক সেকেণ্ড পর ছোট্ট নড করল রানা। 'ঠিক আছে। কিন্তু আগামীকাল সকালে কথা বলবে লেং সেঙের সঙ্গে। এমনিতে কয়েক দিন লাগে ক্যামবোডিয়ার ভিসা পেতে। সে তোমার ভিসা জোগাড় করে দিলে সড়কপথে ওখানে যাব আমরা। ঠিক আছে?'

রানা রাজি হয়ে গেছে দেখে ড্রিঙ্কের গ্লাস কাউন্টারে রেখে দিল মারিয়া। 'আর রেমারিকের কী হবে?'

‘কয়েক দিন পর আসবে। ভুল না হয়ে থাকলে, আমরা হো চি মিন সিটি ছাড়ার পর ভ্যান ট্রং ট্রির পরিবারের ওপর হামলা করবে দায়না বেলগুতাই। কাজেই ওই বাড়ির ওপর চোখ রাখবে রেমারিক। ভেতরে থাকবে মউরোস আর কর্নেলিস।’

‘নম পেন-এ কী পাবে ভাবছ?’

গ্লাসের ভোদকা গলায় ঢেলে বলল রানা, ‘যারা ট্রির কাছ থেকে ফ্যাক্স পেয়েছে, তাদের পিছু নেব। ধরে নিতে পারো, পথ শেষ হবে না নম পেন-এ।’

‘শেষ হবে কোথায়?’

‘জানি না। কিন্তু সব শেষ হবে মৃত্যুর মাধ্যমে। সেই মৃত্যু হয়তো আমার, নয়তো অন্য কারও।’ স্টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ‘আমাকে আগ্রহ নিয়ে ডাকছে কেউ। তা গালে চুমু দেয়ার জন্যে নয়। চলো, উঠে পড়ি। ঘুমাতে হবে। ভোরে উঠব।’

বরাবরের মতই নষ্ট হোটেলের এলিভেটর।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় মারিয়া বলল, ‘সরি, রান্না, আজ আসলে আবেগ-প্রবণ হয়ে গিয়েছিলাম। বোধহয় বলে ফেলেছি অনেক বাড়তি কথা। হয়তো ওয়াইনের কারণেই। বা অন্য কারণে। কারণ আজ সাতাশ তারিখ।’

ওরা পৌঁছে গেছে করিডরে।

রানা জিজ্ঞেস করল, ‘শেষ কথাটার মানে বুঝিনি।’

মারিয়ার ঘরের দরজার সামনে থামল ওরা। চাপা স্বরে বলল মেয়েটা, ‘আজ আমার বাবার জন্মদিন।’

ওদের দু’জনের হাতে যার যার ঘরের চাবি।

কোমল দৃষ্টিতে মারিয়াকে দেখল রানা।

তালায় চাবি দিল মেয়েটা।

নরম সুরে বলল রানা, ‘মারিয়া, আজ রাতে একা থাকতে না চাইলে আমার ঘরে ঘুমাতে পারো।’

তিক্ত হাসল মারিয়া। ‘অনেক কথা শুনেছি ছেলেদের মুখে, কিন্তু তোমারটা বোধহয় পৃথিবীর সেরা!’

‘আমি সিরিয়াস,’ বলল রানা, ‘তোমাকে বিছানায় প্রেম করতে ডাকিনি। মানসিক কোনও বাঁধনেও আটকা পড়িনি। তোমাকে আসতে বলেছি, কারণ মনে হয়েছে, আজ রাতে বড় একা বোধ করবে তুমি। হয়তো সারারাত ঘুমাবে না।’ মৃদু হাসল রানা। ‘আশা করছি বুঝতে পারছ, আমার প্রস্তাবের ভেতর কুমতলব নেই।’

অন্তত একমিনিট রানার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল মারিয়া। তারপর একবার মাথা দুলিয়ে তালা থেকে বের করে নিল চাবি।

বত্রিশ

মোক বাই সীমান্তে মাত্র দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো রানা ও মারিয়াকে। গাড়ি থেকে নেমে পাসপোর্ট হাতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করল রানা। ওই পাসপোর্টের ভেতরে ভাঁজ করে রাখা এক শ’ ডলারের পাঁচটা নোট। সিল ও সই শেষ হলে গাড়িতে উঠে রওনা হয়ে বলল রানা, ‘সব আগের মতই আছে।’

‘কখনও বদলাবার নয়,’ মাথা দোলাল মারিয়া। ‘সরকার যা বেতন দেয়, ঘুষ না পেলে পেট চলে না।’

রাস্তা ভরা ছোট-বড় সব গর্ত। বাধ্য হয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে রানা। শহর পেরোতেই দেখা দিয়েছে সমতল ভেজা জমি।

যেদিকে চোখ গেল সবুজ ধান খেত, মাঝ দিয়ে সাপের মত পাকা রাস্তা। কখনও চোখে পড়ছে একটা-দুটো ভাঙাচোরা, পুরনো যানবাহন।

'নম পেন-এ কখন পৌঁছব?' জানতে চাইল মারিয়া।

'রাস্তার যা হাল, বলা মুশকিল। তবে আশা করি সন্ধ্যার দিকে।'

ভোরে হোটেল থেকে বেরোবার পর কথা প্রায় হয়ইনি ওদের ভেতর। যা বলেছে ওরা, তা বড়জোর মন্তব্যের মত।

একবার রানাকে দেখে নিয়ে নিচু স্বরে বলল মারিয়া, 'আমার বোধহয় দুঃখপ্রকাশ করা উচিত।'

'কীসের জন্যে?'

'ভোরে যা হলো।'

চট্ করে একবার মারিয়াকে দেখল রানা। 'সকালে কফি আর বিস্কিট খেয়ে গাড়িতে ব্যাগেজ তুলে রওনা হয়েছি নম পেন-এর দিকে। এতে দুঃখপ্রকাশের কিছু দেখছি না তো।'

'না, মানে... রওনা হওয়ার আগে... ভোরে...' চুপ হয়ে গেল মারিয়া।

আবারও রাস্তায় চোখ রাখল রানা। 'আমার মনে আছে, মাঝরাতে বিছানায় গেছি। উঠেছি সাড়ে পাঁচটের সময়। তখন খুব মাথা-ব্যথা ছিল।'

মৃদু হাসল মারিয়া। 'তা হলে হয়তো স্বপ্নই দেখেছি।'

'হতে পারে। কয়েক গ্লাস লাল ওয়াইন খেলে অমন হয়।'

না, ওটা ঘোর বা স্বপ্ন নয়।

মস্ত বিছানার দু'পাশে শুয়েছিল ওরা। ভোর চারটেয় ঘুম ভাঙল মারিয়ার, দেখল শুয়ে আছে রানাকে জড়িয়ে ধরে। রানার কাঁধে ওর মাথা। গভীর ঘুমে তলিয়ে ছিল রানা, শ্বাস স্বাভাবিক। দেব শিশুর মত দেখাচ্ছিল ওকে। তখন লোভ সামলাতে পারেনি

মারিয়া, হাত বুলিয়ে দিয়েছে রানার গালে ও বুকে। আর তখনই দেহমনে এল তীব্র কামনা। জীবনে প্রথমবারের মত কোনও পুরুষকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছে হলো ওর। নিজের কথা রক্ষা করেছে রানা, একবারও হাত বাড়ায়নি মারিয়ার দিকে। সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে উঠে দেখল মেয়েটার ভিন্ন রূপ। পরবর্তী পাঁচ মিনিটে কুমারিত্ব বিসর্জন দিতে উন্মাদিনী হলো মারিয়া। তখন আর বাধা দেয়নি রানা। আধঘণ্টা পর আবারও রানার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে ও।

এখন রাস্তার ভয়ানক সব ঝাঁকি খেতে খেতে চলেছে ওরা। নিজের মনের অনুভূতির হিসেব কষছে মারিয়া। মনকে জিজ্ঞেস করল: সত্যিই কি ভালবাসতে শুরু করেছি মাসুদ রানাকে? নাকি এটা ক্ষণিকের আবেগ?

বিষয়টা জোর করে মন থেকে দূর করতে চাইল মারিয়া। চোখ বোলাল চারপাশের দৃশ্যে। যত দূর দেখা যায় সবুজ সব মাঠ। মাঝে মাঝে ছোট সব কুঁড়েঘর। ডোবার ভেতর থেকে উঠে রাস্তা পার হচ্ছে ভেজা, কাদামাখা মহিষ। কোথাও কোথাও রাস্তার ধারে ফলমূল বিক্রি করছে কচি কচি বাচ্চারা। তাদের বিশ ভাগের হাত বা পা উড়ে গেছে মাইন বিস্ফোরণে। লাখ লাখ মাইন পুঁতে এ দেশের সর্বনাশ করেছে একদল অমানুষ।

আবারও মারিয়া ভাবল ভোরের কথা। চট্ করে রানাকে দেখল। গম্ভীর চেহারায় রাস্তায় চোখ রেখেছে বাঙালি গুপ্তচর। মারিয়া বুঝে গেল, ও যেন লজ্জা না পায়, সেজন্যে ব্যস্ত ভঙ্গি করছে মানুষটা। নিজের চারপাশে যেন তুলে দিয়েছে অদৃশ্য এক প্রাচীর। ও তো বলেইছে, ভাবল মারিয়া, হয়তো বিয়েই করবে না জীবনেও। এমনই এক বিষয়, জোর চলে না কারও ওপর। আর ও নিজেও তো ঠিক করেছে, উপযুক্ত কাউকে না পেলে কখনও বিয়ে করবে না। জীবন যেন বোঝা না হয়ে ওঠে। নিচু স্বরে

জিজ্ঞেস করল মারিয়া, 'আমরা খাব কখন?'

সামনের রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে হাতঘড়ি দেখল রানা। 'কপাল ভাল থাকলে একঘণ্টার ভেতর পৌঁছব মেকং নদীর তীরের নিক লাং-এ। ওখানে গিয়ে বুঝতে হবে ফেরি চলাচল আছে কি না। নদী পেরোবার পর ওদিকে পাব মার্কেট আর রেস্তোরাঁ। মিঠে পানির মাছের জন্যে ওসব রেস্তোরাঁ নামকরা। যত খুশি খাওয়া যাবে। ওখান থেকে রওনা হয়ে পৌঁছব নম পেন-এ।'

'ওখানে গিয়ে কী করতে চাও?'

বিশাল এক গর্ত এড়িয়ে জবাব দিল রানা, 'আশা করি এরই ভেতর পিটার জেনে গেছে, কী কাজ করে দায়না ট্রেড কোম্পানি। ওই দালান রেকি করে দেখার কথা পেঁচার। সম্ভব হলে আজ রাতেই ওই অফিসে ঢুকব আমরা দু'জন।'

ক'সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে বলল মারিয়া, 'কাজটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। দুই বিদেশি, গভীর রাতে গোপনে ঢুকছে নম পেন-এর এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিসে।'

'আমরা দু'জন এসব কাজে অদক্ষ নই,' বলল রানা। 'তালা খুলে ফেলা কঠিন কোনও কাজ নয়। আশা করি চোখ এড়িয়ে ওখান থেকে ঘুরে আসতে পারব। দরকারী তথ্য পেতেও পারি।'

নিক লাং-এ চালু আছে ফেরি।

ঝামেলা ছাড়াই পাঁচ কিলোমিটার চওড়া, কাদাটে, ধীর গতির নদী পেরিয়ে গেল ওরা। নিজেদের ভেতর তেমন কোনও কথা হলো না।

তেত্রিশ

লাল, ছোট জিনিসটা সুইস আর্মি নাইফের মতই, কিন্তু পেটের গেজেট বের করতেই দেখা গেল, একটাও ছুরির ফলা নয়। প্রতিটি পাত নানান ধরনের তালার চাবির মত। একপাশে আছে জানালার ছিটকিনি খুলে ফেলার যন্ত্র। এসবের কাজ কী, তা ব্যাখ্যা করে জানাল ফুলজেন্স।

'নম পেন-এ এ জিনিস পেলেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া। দ্বিতীয়বারের মত ব্রিয়াঁ ফুলজেন্সকে হাসতে দেখল।

'মার্সেইল্‌স্-এর সেরা কারিগরের তৈরি,' বলল পেঁচা। 'আরব লোক সে। নাম রহিমুল্লাহ্ বেগ। ইউরোপের সেরা সব চোরের প্রথম কাজ তার কাছ থেকে লক পিক সংগ্রহ করা। পেশাদার লোক বেগ, দুনিয়ার বড় বড় তালা বা সিন্দুকের কোম্পানিগুলো থেকে সেরা জিনিস কেনে, নইলে নিজের গোপন ব্যবসা চালু রাখতে পারত না। সিন্দুক আর তালা কিনে আগে ওগুলো খোলার যন্ত্র তৈরি করে।' হাতের যন্ত্রটা দেখাল ফুলজেন্স। 'পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন স্টিল দিয়ে তৈরি। কিনতে গিয়ে খরচ হয়েছে চার লাখ ফ্রেঞ্চ ফ্রাঁ। দূরে কোথাও গেলে মানুষ যেভাবে টুথব্রাশ আর পাসপোর্ট নেয়, সেভাবে এটা রাখি আমার কাছে।'

নিজের দক্ষতার প্রমাণ দেবে বলে বেরিয়ে গেল ফুলজেন্স। দরজার বাইরে থেকে বলল, 'ভেতর থেকে তালা লক করে দিন, মারিয়া।'

বাংলোর সদর দরজায় আছে আধুনিক মর্টিস লক। মারিয়া তালা মেরে দেয়ার বিশ সেকেণ্ড পর চওড়া হাসি নিয়ে আবারও ভেতরে ঢুকল ফুলজেন্স।

একবার মাথা দুলিয়ে লাউঞ্জে চলে এল মারিয়া।

টেবিলে কাগজ রেখে কী যেন করছে রানা ও লারসেন। রানার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল মারিয়া।

'দায়না ট্রেড কোম্পানির বর্তমান ডিরেক্টর কারা, তা বের করেছে পিটার,' মুখ তুলে বলল রানা। 'রত্নের ব্যাপারে দক্ষ ব্যবসায়িক সংগঠন। বিশেষ করে কেনা-বেচা করে থাই সীমান্তের কাছের ব্যাটামব্যাং বিভাগের নানান রঙের অসিতোপল পাথর বা নীলকান্ত মণি। এটা আমরা জানতে পেরেছি, কারণ সাইনবোর্ডে ওরা তা-ই লিখেছে।' আরেকটা কাগজ দেখাল রানা। 'আর এটা দালানের ভেতরের ডায়াগ্রাম। মেইন রোডের দিকে দরজা, আর পেছনের গলিতে আছে দালানের আরেক দরজা। কোনও অ্যালার্ম সিস্টেম নেই। আজ রাতে পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকব পেঁচা আর আমি। ডিরেক্টররা সবাই বোধহয় ভিয়েতনামিয বা ক্যামবোডিয়ান। আপাতত তাদের নাম জেনে বিশেষ লাভ হবে না।' একবার লারসেনকে দেখল রানা। 'আমাদের গোয়েন্দা মিঞা অত্যন্ত দক্ষ টিকটিকি। সামান্য খরচ করে কোম্পানির চার বছর আগের রেকর্ড বের করেছে। সে-সময় কোম্পানির প্রধান শেয়ারহোল্ডার ছিল জন বেলগুতাই।'

কয়েক সেকেণ্ড পর এর অর্থ বুঝল মারিয়া। 'ও, তার মানে হংকঙে যে লোক মারা গিয়েছিল তোমার হাতে?'

'হ্যাঁ, জন বেলগুতাই,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

ওর দেখাদেখি চেয়ার ছাড়ল লারসেন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঠিক করতে চাইল আড়ষ্ট মাংসপেশি। 'তবে একটা কথা এখনও বলিনি, রানা। পেঁচা যখন ফ্যাক্স নিয়ে যাওয়া লোকটার পেছনে

গিয়ে ওই কোম্পানির সামনে পৌঁছুল, তখন তার ভেতর কোনও দ্বিধা ছিল না। সরাসরি গিয়ে ঢুকেছে ওই কোম্পানির অফিসে।'

'দ্বিধা থাকবে কেন, গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে কেন,' বলল মারিয়া, 'সে ক্যামবোডিয়ান, নিজের দেশে নিরাপদ। হয়তো ভাবেইনি কেউ পিছু নিতে পারে।'

এ কথা শুনে বলল লারসেন, 'আমার নতুন অস্ট্রেলিয়ান বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পেরেছি, দায়না ট্রেড কোম্পানির আগে থেকেই ফ্যাক্স মেশিন আছে। সেক্ষেত্রে কেন হোটেলের ফ্যাক্স ব্যবহার করবে গোপন এসব বিষয়ে? এটা অস্বাভাবিক না?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা, চুপ।

কী যেন ভাবছে মারিয়া। কয়েক সেকেণ্ড পর দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে, 'তা হলে আজ রাতে হয়তো তোমাদের দু'জনের জন্যে ওই অফিসে অপেক্ষা করবে খুনি। পড়ে যেতে পারো ভয়ঙ্কর বিপদে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমার তা মনে হয় না। ভুল না হয়ে থাকলে ওখানে গিয়ে দেখব, ভেতরে অ্যালার্মও নেই। কোনও রত্নও থাকবে না। অফিসে থাকবে কয়েকটা ফাইলিং কেবিনেট। পৃথিবীর এদিকের রত্নকাররা অফিসে দামি কিছু রাখে না।'

'সেক্ষেত্রে ওখানে গিয়ে কী পাবে ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

লারসেনকে একবার দেখে নিয়ে বলল রানা, 'ওখানে থাকবে আমাদের জন্যে সযত্নে রাখা দরকারী কিছু কাগজ।'

চৌত্রিশ

বাড়ি ফিরে ভ্যান ট্রেং ট্রি দেখল, তার বাড়িতে দুই বনবিড়ালের মত লোককে পোষ মানিয়ে ফেলেছে ওর দুই পিচ্চি মেয়ে। লোক দু'জনের চোখ অন্তত খেপা জানোয়ারের মতই। বোঝা যায়, এরা সামাজিক প্রাণী নয়। কিন্তু তাদের একজন, যার নাম জ্যাঁ মউরোস, এই মুহূর্তে বিছানার পাশে বসে ফ্রেঞ্চ লালাবাই গুন গুন করে ঘুম পাড়াতে চাইছে ট্রির ছোট মেয়েকে। দ্বিতীয় লোকটা কিচেনে দাঁড়িয়ে চিকেন কারি রাঁধতে ব্যস্ত।

'মনে হচ্ছে না একদল খুনির হাত থেকে এরা আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে,' ক্ষোভের সুরে স্ত্রীকে বলল ট্রি।

জানালার জাল আর মেঝের টেপের লাইন দেখাল তার বউ। টেবিলে কালো ছোট ধাতব বাক্স। পাশেই দুটো পিস্তল। দুই সেকেণ্ডে ওগুলোর কাছে চলে যেতে পারবে মউরোস ও কর্নেলিস। মহিলা বলল স্বামীকে, বাড়ির ভেতর কীভাবে হাঁটতে হবে। হামলা এলে ওদের কাজ হবে মেয়েদুটোকে নিয়ে বাথরুমে চলে যাওয়া। ওখানে গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে মেঝেতে।

'ওরা ঘুমায় কোথায়?' আপত্তির সুরে বলল ভ্যান ট্রেং ট্রি।

আঙুল তাক করে সদর দরজার সামনের ম্যাট্রেস দেখিয়ে দিল তার স্ত্রী।

'দু'জনই ওখানে ঘুমায়?' জানতে চাইল ট্রি।

'একজন ঘুমায়, অন্যজন পাহারা দেয়। সত্যিকারের ভাল

মানুষ।'

কর্কশ হাসল ট্রি। 'ওরা খুনি। ওদের বসের মতই।'

মাথা নাড়ল তার স্ত্রী। 'বাচ্চাদের ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা থাকে। আমাদের দুই মেয়ে যেচে বন্ধুত্ব করেছে ওদের সঙ্গে। ওরা খারাপ হলে মিশত না।'

দুই বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়তে বড়রা খেতে বসল কর্নেলিসের কারি। ভাষা বড় বাধা, কাজেই খাওয়ার সময় আড়ষ্ট একটা পরিবেশ থাকার কথা। কিন্তু তেমন হলো না। আলাপ চলল হাতের ইশারায়। নিজের কারির ব্যাপারে অত্যন্ত গর্বিত কর্নেলিস। অনেক করে রান্না করেছে। ভেবেছিল আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত চলবে তাতে। কিন্তু আধঘণ্টার ভেতর সাবড়ে দিল সবাই মিলে। খাবার শেষ হলে দুই মার্সেনারিকে ব্র্যাণ্ডি সাধল ট্রি, কিন্তু মানা করে দিল কর্নেলিস। হাত তুলে দেখাল পিস্তল। তারপর ভঙ্গি করে বুঝিয়ে দিল ঠিকভাবে তাক করতে হবে। ট্রি বুঝল, এরা কাজের সময় ড্রিঙ্ক করবে না। হাতের ইশারায় অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বেডরুমে চলে গেল ট্রি। মেয়েদের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল ওর বউ।

করার মত কিছু নেই বলে এক পেটি তাস নিয়ে বসল কর্নেলিস ও মউরোস। একটু পর জমে গেল জিন রামি।

দোতলা ওই বাড়ি থেকে সত্তর গজ দূরে ভাড়া নেয়া ভ্যানে বসে আছে ভিটেলা রেমারিক। হাজির হয়েছে দু'ঘণ্টা আগে। থাকবে ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত।

অন্ধকার রাত।

নির্জন রাস্তা। আলো বলতে একটু দূরে টিমটিম করা একটা লণ্ঠন। তাতে তৈরি হয়েছে অসংখ্য ছায়া।

রেমারিকের চোখে ঘুম নেই। ধীরে ধীরে পেরোতে লাগল

একেকটা ঘণ্টা। এসব কাজ হাতে নিলে সবসময় প্রতি চার ঘণ্টা পর পর একটা করে ডেক্সেড্রিন ট্যাবলেট গিলে নেয়। ঘুম ভাগে, উত্তেজিত থাকে স্নায়ু। কিন্তু এই ওষুধের সমস্যা, অতিরিক্ত আগ্রহ তৈরি করে যৌন মিলনের। আরও অনেকক্ষণ পর মহাবিরক্ত হয়ে গেল রেমারিক। বারবার মনে পড়তে লাগল জেসমিনের মুখ ও রমণীয় দেহ। মনকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে রানার কথা ভাবতে লাগল রেমারিক।

এখন কী করছে ওর বন্ধু?

পৌঁছে গেছে ক্যামবোডিয়ায়। ফুলজেন্স আর পিটারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওরা বসে ঠিক করছে এরপর কী করবে।

মারিয়া মেয়েটাকে খুব মানাবে রানার পাশে। রানার দিকে তাকালে কী যেন বলে তার চোখ। সোফিয়া লোরেনের সঙ্গে মিল আছে চেহারায়।

কিন্তু রানা তো কাউকে বিয়ে করবে বলে মনে হয় না।

প্রেযো ফিসো বোর্ডিং হাউস অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্টে কী করছে ফুরেলা?

মনে হচ্ছে সময় পেরোবে না। তখনই চোখের কোণে দেখল রেমারিক, ওর ভ্যান পেরিয়ে চলে যাচ্ছে চারজন লোক। একবার হাতঘড়ি দেখল ও।

রাত তিনটে।

কয়েক সেকেণ্ড পেছন থেকে লোকগুলোকে দেখল রেমারিক, তারপর সিট থেকে তুলে নিল মোবাইল ফোন। স্পিড ডায়াল করল। চারবার রিং হতে দিল, তারপর ফোন রেখে হাতে তুলে নিল পিস্তল। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ভ্যান থেকে।

বাড়ির ভেতর অকাতরে ম্যাট্রেসে ঘুমিয়ে আছে মউরোস, মৃদু ঘড়-ঘড় শব্দ তুলছে নাক। টেবিলে তাস রেখে সলিটায়ার খেলছে

কর্নেলিস। তাসের পাশে রাখা মোবাইল ফোন বেজে উঠতেই ওর হাত খপ্ করে তুলে নিল পিস্তল। কান পেতে শুনল চারবার রিং, তারপর পিস্তল হাতে সরে গেল ম্যাট্রেসের কাছে। হালকা একটা খোঁচা খেয়ে জেগে গেল মউরোস, সম্পূর্ণ সতর্ক। কুড়িয়ে নিল নিজের পিস্তল, দেরি না করে রওনা হয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

এদিকে টেবিলের পাশে গেল কর্নেলিস, কাত করে শুইয়ে দিল টেবিল। ওটার পেছনে বসল। দোতলায় মৃদু পায়ের আওয়াজ। পরিবার নিয়ে বাথরুমে ঢুকছে ভ্যান ট্রেং ট্রি।

পেরিয়ে গেল দু'মিনিট, এরপর নিচু আওয়াজ ছাড়ল মেঝেতে রাখা কালো বাক্স। কয়েক সেকেণ্ড পর বাজল আবারও। ভেঙে দেয়া হয়েছে ফোটো-সেল বিম। আস্তে করে পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করে দিল কর্নেলিস।

হামলা এল এর আধমিনিট পর।

ঝন-ঝন করে ভেঙে পড়ল ঘরের জানালার কাঁচ, কিন্তু দরজার ওপর থেকে চোখ সরাল না কর্নেলিস। মাঝারি 'দুম্প্!' আওয়াজ উঠতেই বুঝে গেল, ওটা ক্ল্যাম্প এক্সপ্লোসিভ। কাত করে ফেলে রাখা টেবিলের পেছনে মাথা নিচু করে নিয়েছে কর্নেলিস। পরক্ষণে ঝনঝন করতে লাগল দু'কান। এবারের বিস্ফোরণ গ্রেনেডের কারণে। জানালার বাইরে পড়ে ফেটেছে। ডানদিকে সরে গেল কর্নেলিস, উঁচু করে ধরল পিস্তল।

বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে দরজা। পাঁচ সেকেণ্ড পর দৌড়ে ভেতরে ঢুকল কালো পোশাক পরা দু'জন।

'অদক্ষ,' ভাবল কর্নেলিস, 'ওদের উচিত ছিল আগে গ্রেনেড ফেলা।'

দু'জনের হাতেই পিস্তল, কিন্তু বাধা হয়ে উঠেছে পরস্পরের পথে।

বুকে দুটো গুলি নিয়ে ধুপ্ করে পড়ল মেঝেতে। পরক্ষণে

ছায়ার মত দেয়ালে পিঠ রেখে সরে গেল কর্নেলিস। পৌঁছে গেছে একটা দরজার আড়ালে। তৃতীয় লোকটা এল দৌড়ে, এক লাফে টপকে গেল দুই লাশ। রওনা হয়ে গেছে সিঁড়ির দিকে। পিঠে গুলি খেয়ে পড়ল ল্যাণ্ডিঙে। তার আগেই বুকে গুলি করেছে মউরোস।

'আরেকজন আছে,' গুলির আওয়াজের ওপর দিয়ে বলল কর্নেলিস।

বাইরে দৌড়ে যাওয়ার আওয়াজ পেল ওরা। তখনই পর পর দুটো গুলির আওয়াজ হলো। তারপর আবার চারপাশ নীরব।

'ভিটেলা ওকে নিয়েছে,' বলল মউরোস, 'চলো!'

কালো বাক্স ও মোবাইল ফোন তুলে নিয়েছে সে, এদিকে সাধের তাসের পেটি পকেটে পুরেছে কর্নেলিস। দু'জনের কাঁধের হোলস্টারে চলে গেল পিস্তল। কয়েক লাফে দোতলায় উঠল কর্নেলিস, আধমিনিট ধরে ট্রি পরিবারকে বুঝিয়ে দিল, কেটে গেছে সমস্ত বিপদ। বাচ্চাদের দিকে চেয়ে হাসল, এলোমেলো করে দিল ওদের চুল, তারপর আরেক দৌড়ে নেমে এল নিচে। দশ সেকেণ্ড পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওরা দু'জন, এক দৌড়ে গিয়ে উঠল ভ্যানে। চালুই ছিল ইঞ্জিন। নিজেদের সেফ হাউসের দিকে রওনা হয়ে গেল তিনজন।

'তোমাদের কি মনে হয়, ওরা আবারও চেষ্টা করবে?' জানতে চাইল মউরোস।

মুচকি হেসে বলল রেমারিক, 'ভুলেও না। ওরা দেখবে ওদের এ-টিমের কী হয়েছে।'

'লাশগুলোর কারণে ওদের কোনও বিপদ হবে না তো?'

'উঁহুঁ, পুলিশের ইনফর্মার সামলে নেবে সব।'

www.boighar.com

পঁয়ত্রিশ www.boighar.com

হাতে স্বচ্ছ সার্জিকাল গ্লাভ্স্, তালার গর্তে টর্চের সরু রশ্মি ফেলেছে রানা। সেই আলোয় ব্যস্ত হয়ে উঠল ফুলজেন্স। ওদের দু'জনের গায়ে কালো রেইনকোট, পেটের কাছে গভীর পকেট। কোম্পানির দালানের দরজায় আধুনিক 'চাব' লক। চুপচাপ অপেক্ষা করছে রানা, একটু পর শুনল ঘোঁৎ করে উঠল ফ্রেঞ্চ গোয়েন্দা। তালা খুলতে লেগেছে পুরো দু' মিনিট।

রেইনকোটের পকেটে যন্ত্র রেখে দরজার কবাট খুলল ফুলজেন্স, ভেতরে ফেলল টর্চের আলো।

বাইরে থাকল রানা। বারকয়েক দেখে নিল চারপাশ। হাতে ঝুলছে পিস্তল। ওখানেই তিন মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর ভেতর থেকে শুনল নিচু শিস। এবার দালানে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। ওর টর্চ খুঁজে নিল ফুলজেন্সকে। সে আছে কাঠের একটা সিঁড়ির মাঝের ল্যাণ্ডিঙে।

রানা সিঁড়ি বেয়ে উঠছে দেখে ফিসফিস করল সে, 'কোথাও অ্যালার্ম দেখছি না।' একসারি সিঁড়ির পর একটু দূরে আধখোলা এক দরজা। 'ওটা সেক্রেটারির অফিস। ওদিকে ছোট একটা মিটিং রুম। পরের ঘরে বোধহয় ম্যানেজারের অফিস।'

দোতলায় উঠে এল ওরা। মৃদু আলোয় রানা দেখল, একটা ডেস্ক, চেয়ার, দুটো ধাতব ফাইলিং কেবিনেট ও ফ্যাক্স মেশিন। ডেস্কের ওপর আধুনিক আইবিএম পিসি ও প্রিণ্টার। ফাইলিং

কেবিনেটের সামনে গিয়ে থামল রানা। সব তালা বন্ধ। খুলতে বেশিক্ষণ লাগল না ফুলজেন্সের।

ভেতরে রত্নকারের ব্যবসায়িক সব ফাইল। দশ মিনিট ব্যয় করে রানা জানল, আপাতত দায়না ট্রেড কোম্পানির আছে মাত্র তিনজন কাস্টোমার। তাদের দু'জন ফ্রান্সের লোক, একজনের ব্যবসা প্যারিসে, অন্যজনের ব্যবসা লিয়ন-এ। অন্য কোম্পানির অফিস হংকঙে। ফ্রেঞ্চ করেসপণ্ডেন্ট-এর ফাইল দ্রুত পড়ল রানা। চাইনিজ কোম্পানির তথ্য সব ইংরেজিতে লেখা, অসুবিধে হলো না বুঝতে। এসব ফাইলে কোনও দুর্নীতি হয়েছে বলে মনে হলো না ওর। পকেট থেকে বলপয়েন্ট কলম ও ছোট প্যাড বের করল, লিখে নিল কোম্পানিগুলোর নাম ও ঠিকানা।

কাজটা শেষ করে মিটিংরুমে ঢুকল ওরা। একটা টেবিল ও ছয়টি চেয়ার ছাড়া এ ঘরে কিছুই নেই। এই ঘর পেরিয়ে ঢুকল ম্যানেজারের অফিসে। বিলাসবহুল আসবাবপত্র স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান স্টাইলের। মেঝেতে ইরানি কার্পেট। ম্যানেজারের চওড়া ডেস্ক পাইন কাঠের, পেছনে চামড়া দিয়ে মোড়া চেয়ার। একপাশে কফি টেবিল ও তিনটে চেয়ার। দেয়ালে ঝুলছে বিমূর্ত সব তৈলচিত্র।

ডেস্কের চারটে ড্রয়ার। সব লক করা। তৃতীয় ড্রয়ারে ধাতব এক বাক্সের ভেতর পাওয়া গেল সরু একটা ফাইল। দ্রুত পাতা ওল্টাতে শুরু করে ফাইলের মাঝে থামল রানা। ওখানে রয়েছে আট ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চির কয়েকটা ফোটোগ্রাফ।

মনোযোগ দিয়ে প্রথম ছবি দেখল রানা। আনমনে একবার মাথা দোলাল। ডেস্কের ওপর বিছিয়ে দিল একের পর এক ফাইলের পাতা ও ছবি, ব্যবহার করল স্মার্টফোনের ক্যামেরা। ফ্ল্যাশের কল্যাণে ভাল উঠল ছবি।

চার মিনিট পর আবারও অফিসের দরজায় তালা মেরে অন্ধকার গলিতে নেমে এল ওরা।

ছত্রিশ

মোবাইল ফোনে দায়না ট্রেড কোম্পানির ম্যানেজারের কথা শুনতে শুনতে সতর্ক হয়ে উঠল দায়না বেলগুতাই। তার চেহারা খেয়াল করছে কুয়েন আন টু।

পুরো দু'মিনিট শুনল দায়না, তারপর কর্তৃত্বের সঙ্গে বলল, 'ঠিক আছে। অফিস ছেড়ে কোথাও যাবে না। একঘণ্টা পর আবার যোগাযোগ করব।'

ফোন রেখে চিন্তিত চেহারায় কুয়েন আন টুর দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে মেয়েটা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'গতকাল রাতে দুটো ঘটনা ঘটেছে। হো চি মিন সিটিতে ভ্যান ট্রং ট্রির বাড়িতে গোলাগুলিতে খুন হয়েছে আমাদের হিট টিমের চারজন। কিছুই হয়নি লোকটার পরিবারের।'

'কী বলছ!' চমকে গেল কুয়েন আন টু, 'ওদেরকে বলেছি, রানা নম পেন-এর দিকে রওনা হলে তারপর যেন হামলা করে।'

'তাই করেছে। রানা শহর ছাড়লে হামলা করে রাতে। ফন ক্যান-এর কথা অনুযায়ী, মেয়েটাকে নিয়ে বিকেলে নম পেন-এ পৌঁছেছে রানা। আমাদের হিট টিমকে সম্ভবত খুন করেছে ওই ইটালিয়ান লোকটা। অথবা, ওরা অন্য কাউকে ডেকে এনেছিল।' ভয়ঙ্কর কঠোর হয়ে গেল দায়নার মুখ। 'নিজেকে খুব চালাক মনে করে রানা! ট্রং ট্রি আগেই বলেছিল, হামলা হবে ওর পরিবারের ওপর। তথ্য পাওয়ার পর রানা কথা দিয়েছিল, নিরাপত্তা দেবে

তার পরিবারকে।'

নীরবে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে কুয়েন আন টু আর দায়না বেলগুতাই।

'ঝড়ের গতিতে কাজ করছে সে,' আপত্তির সুরে বলল কুয়েন আন টু।

'হ্যাঁ, তাই। গতরাতে দায়না ট্রেড কোম্পানির অফিসে ঢুকেছে। সার্চ করেছে পুরো অফিস।'

'তুমি পুরো নিশ্চিত?'

চোখে রাগের আগুন জ্বেলে কুয়েন আন টুকে দেখল দায়না। বড় করে দম নিয়ে বলল, 'অবশ্যই! ফন ক্যানকে ভাল করে বলে দেয়া ছিল কী করতে হবে। গত কয়েক রাতে দরজা, কেবিনেট আর ড্রয়ারের ওপরে ছিল তুলোর আঁশ। কেবিনেট ও ড্রয়ার ছিল তালাবদ্ধ। আজ সকালে দেখা গেল তুলোর আঁশ আগের জায়গায় নেই। ওই অফিসে হানা দিয়েছে মাসুদ রানা, ফিরে যাওয়ার সময় আবার তালা মেরে গেছে।'

'জরুরি কিছু হারিয়েছে?'

'অবশ্যই না! অত বোকা নয় রানা। সব ঘেঁটে দেখে আবার জায়গামত রেখে গেছে।' মেঝেতে পা ঠুকতে লাগল দায়না।

'সে যাবে, তাই তো ছিল আমাদের ইচ্ছে, তাই না?' বলল কুয়েন আন টু।

'তা ছিল, কিন্তু এত দ্রুত যাবে, তা ভাবিনি। আমার ধারণা ছিল, হো চি মিন সিটিতে কী করতে হবে, তা বুঝতে অন্তত দশ দিন লাগবে রানার। এদিকে আমি এখনও পুরোপুরি তৈরি নই। নম পেন-এ কমপক্ষে কয়েক দিন দেরি করিয়ে দিতে হবে ওকে। আজই একটু পর টাক লুইয়ের উদ্দেশে রওনা হব।' আবারও মোবাইল ফোন তুলে নিল দায়না।

সাঁইত্রিশ

সাধারণত আয়েস করার সুযোগ আসে না, কিন্তু এই মুহূর্তে হোটেলের সুইমিং পুলের পাশে সান বেড-এ শুয়ে আছে মারিয়া ওয়াকার। পাশের টেবিলে বরফঠাণ্ডা তাজা কমলার জুস। পড়ছে ম্যাথিউ রেলির নতুন বই।

আমেরিকা থেকে রওনা হওয়ার সময় সুইম স্যুট সঙ্গে আনেনি, কিন্তু তাতে আফসোস নেই এখন। হোটেলে আছে বটিকের মস্ত কালেকশন। সব এসেছে প্যারিস থেকে। এমন কী সামান্য বিকিনিও ডিযাইনার লেবেলসহ, দাম যদিও আকাশ-চুম্বী। আট শ' ডলার খরচ করে পেয়ে গেছে দরকারী সব পোশাক। যদিও দামের কথা ভেবে খচ-খচ করছে মনটা। অবশ্য আয়নায় নিজেকে দেখে ভুলে গেছে মনের কষ্ট। সুইমিং পুলে বিকিনি পরে আসতেই অন্তত বিশজন লোক ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে ওকে।

গতরাতের কাজ শেষ করে বাংলোয় ফিরে এখনও ঘুমাচ্ছে রানা ও ফুলজেন্স। নিজের কমপিউটার নিয়ে ব্যস্ত লারসেন। গতরাতে ওর পাশে বসে অপেক্ষা করেছে মারিয়া। তখন পকেট সাইযের ব্যাকগ্যামন সেট বের করেছে লারসেন, কিন্তু আটবার মারিয়া হেরে যাওয়ার পর বুদ্ধিমানের মত বাদ দিয়েছে খেলা। চুপচাপ বসে না থেকে আলাপ করেছে ওরা।

কিছুক্ষণ গল্পের পর মারিয়া নতুন করে চিনেছে এদের, ডেইন লোকটাকে ভাল বন্ধু বলে মনে হচ্ছে ওর। শুকনো রসিকতা আছে

তার। বেশিরভাগ পুরুষের মত নয়, দ্বিধা না করেই নিজেকে ছোট করে দেখাতে পারে। তবে মগজটা তার ক্ষুরের মত ধারালো। গল্প করতে গিয়ে লারসেন খুলে বলেছে, কীভাবে রানা ও ফুলজেন্সের সঙ্গে পরিচয় হলো ওর। এমনভাবে পুরো ঘটনা বলেছে, যেন মনে হবে দারুণ এক অভিযানে গিয়েছিল ওরা। মনেই হয়নি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক এক গুপ্তসংঘের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ঝুঁকি নিয়েছিল মৃত্যুর। নিজের স্ত্রীর কথাও বলল লারসেন। বাদ পড়ল না ছোট্ট মেয়ে মিশেলের কথা। তখন ওর চেহারায় অপার স্নেহ দেখেছে মারিয়া। বুঝে গেছে, এসব অভিযানে যেতে ভালবাসে লারসেন, কিন্তু একই সময়ে মন খারাপ হয় পরিবারের জন্যে। এ জাতের লোকদের পছন্দ করে মারিয়া।

রাত তিনটের সময় বাংলোয় ফিরেছে রানা ও ফুলজেন্স। ওদের আচরণ দেখে মনে হয়েছে, এইমাত্র মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কোনও জায়গা থেকে নয়, নাইট ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরল দু'বন্ধু। দেরি না করে সবাইকে ব্রিফ করেছে রানা। লারসেনের হাতে দিয়েছে মোবাইল ফোন। ওটা থেকে ইমেজ নিয়ে বড় করে নিতে হবে।

ব্রিফ করার সময় মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মারিয়া। কয়েক বছর ধরে চাকরি করছে ও মার্কিন সরকারের হারিয়ে যাওয়া সৈনিকদের খোঁজার কাজে। কিন্তু জীবনে এই প্রথমবারের মত সফলভাবে এমআইএ-র কেস সমাধার খুব কাছে পৌঁছে গেছে। কণ্ঠ শান্ত রেখে রানার কাছে জানতে চেয়েছে, 'তুমি কি শিয়োর ওই ছবি জর্জ হার্টিগানের?'

জবাবে মাথা দুলিয়ে বলেছে রানা, 'হ্যাঁ। কয়েক বছরে বয়স বেড়েছে, কিন্তু পরিষ্কার মনে আছে। হ্যাঁ, ও জর্জ হার্টিগান।'

'আর অন্য দু'জন? আমেরিকান?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছে রানা, 'অন্য দু'জন ককেশিয়ান, কিন্তু

আমেরিকান কি না জানা নেই।'

রানার চোখে ক্লান্তি দেখেছে মারিয়া। তখন ভেবেছে, গত চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর কম যায়নি মানুষটার ওপর দিয়ে। ভোরে হোটেলে প্রেম করেছে ওরা, তারপর দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে এসেছে এখানে, তারপর রাতে হানা দিয়েছে শত্রুর আস্তানায়। তাতে ঝুঁকি নিতে হয়েছে নিজের জীবনের।

'এবার তোমাদের ঘুমিয়ে নেয়া উচিত,' পরামর্শ দিয়েছে মারিয়া।

মাথা দুলিয়ে সায় দিয়েছে রানা। 'তাই করব।' লারসেনের উদ্দেশে বলেছে, 'গোপনে ডেভেলপ করতে হবে মোবাইল ফোনের ইমেজ। খেয়াল রেখো, সে-সময়ে যেন অন্য কেউ না থাকে। চাই না কেউ এসব দেখুক।'

রানার মোবাইল ফোন পকেটে রেখে দিয়েছে লারসেন। 'কাজে ভুল হবে না, নিশ্চিন্ত থাকো।'

চিন্তা ঝেড়ে ফেলে চোখের কোণে সাদা জ্যাকেট পরা ওয়েটার দেখল মারিয়া। তার কাছে চাইল তাজা ফলের সালাদ। একটু পর জিনিসটা হাজির হতে হেসে ফেলল। বড় এক গামলায় বরফ কুচি দেয়া, তার ভেতর মিটিমিটি হাসছে মাঝারি আকারের দ্বিতীয় গামলা, প্রায় উপচে পড়ছে নানান ফল দিয়ে তৈরি সালাদ। অন্তত চারটে ফল চিনতে পারল না মারিয়া। সাহস করে খেতে শুরু করে গামলার অর্ধেক খালি করেছে, এমন সময় দেখল সুইমিং পুলের উল্টো দিকে এসে থামল পেঁচা ফুলজেন্স। এই বিলাসী পরিবেশে মোটেও মানাচ্ছে না তাকে। পরনে ধূসর ব্যাগি প্যান্ট, গলা পর্যন্ত বোতাম লাগানো নীল শার্ট, তার ওপর এত গরমেও উলের কার্ডিগান। চারপাশের লোকজন ও মহিলাদের দেখছে সে।

মারিয়া বুঝল, ওকেই খুঁজছে পেঁচা। চুপ করে শুয়ে থাকল ও। সুইমিং পুলের পাড় ধরে হাঁটতে গিয়ে কিছুক্ষণ পর ওর ওপর চোখ পড়ল পেঁচার। চোখ সরে গেল পরেরজনের ওপর। চিনতে পারেনি ওকে। ফলের গামলা সরিয়ে উঠে বসল মারিয়া, নিচু স্বরে ডাক দিল: 'পেঁচা, আমি এখানে!'

পেছন থেকে ডাক শুনে চমকে গেল ফুলজেন্স। ঘুরে থমকে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল মারিয়া, 'কী হয়েছে?'

অপ্রস্তুত চেহারা করল ফুলজেন্স। 'সরি, মারিয়া। তোমাকে চিনতেই পারিনি।' হাতের ইশারা করল। 'মানে... আগে কখনও তোমাকে এই বেশে দেখিনি তো।'

'তুমি কি ভেবেছিলে আমি মেয়ে নই?' ভুরু কুঁচকে পেঁচাকে দেখল মারিয়া।

'তাই তো দেখছি,' বড় করে দম নিল ফুলজেন্স। 'সত্যি বলতে কী, মাদমোয়াযেল, তুমি আবার খুব সুন্দরী মেয়ে!'

প্রশংসাটা পেয়ে খুশি হলো মারিয়া। কাজের কথায় এল, 'বাংলোয় অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে?'

মাথা নাড়ল ফুলজেন্স। 'না। মোবাইল ফোনের ইমেজ বড় করে ফোটোগ্রাফ কাগজে প্রিন্ট নিয়ে এসেছে লারসেন। একটু আগে ঘুম ভেঙেছে রানার। পনেরো মিনিট পর মিটিঙে বসছি আমরা।'

পুলের পাশের বাথরুমে ঢুকে সানট্যান অয়েল ধুয়ে ফেলল মারিয়া, স্নান শেষ করে বাগানের ভেতর দিয়ে চলল ওদের বাংলোর উদ্দেশে।

মাঝ সকালে টেবিলে নাস্তা নিয়ে বসেছে রানা। ভেড়ার মাংস, পাউরুটি, পনির ও ফলের জুস। বাংলোয় ঢুকে মারিয়া দেখল, ঘুম থেকে উঠে তরতাজা দেখাচ্ছে রানাকে। টেবিলের আরেক প্রান্তে বসে আছে ফুলজেন্স ও লারসেন। ফোটোগ্রাফে মন দিয়েছে

ওরা। কোথাও থেকে বড় একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস এনেছে লারসেন, ওটার মাধ্যমে দেখছে ছোট সব অক্ষর।

ফোটোর দিকে ইশারা করল রানা। 'একবার দেখো, মারিয়া।'

জায়গা ছেড়ে দিল ফুলজেন্স ও লারসেন, আট ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চি ছবিতে মন দিল মারিয়া। সেগুলোর ভেতর তিনটে ফোটো থেকে তোলা হয়েছে আরও ফোটো।

একটা ছবি দেখাল লারসেন। ওটার ওপর ঝুঁকল মারিয়া। সাদা-কালো ছবি। ওখানে তিনজন লম্বা লোক। পরনে খাকি শর্ট। তাদের দু'জনের হাতে গোল কী যেন। একটু দূরে আরও কয়েকজন লোক, পরনে খেমার রুয নিফর্ম। কাঁধে রাইফেল। এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, যেন পাহারা দিচ্ছে ওই তিনজনকে। ক্যামেরার দিকে চেয়ে হাসছে। ওয়াশিংটনে জর্জ হার্টিগানের ফাইল পড়েছে মারিয়া। ছবিটা পরিষ্কার মনে পড়ল। ডানদিকে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকের সঙ্গে অনেক মিল চেহারায়। অন্য শ্বেতাঙ্গ দু'জন হাসছে না।

অন্য দুই ফোটোও ওই তিন শ্বেতাঙ্গের। পাশ থেকে তাদেরকে পাহারা দিয়ে রাখছে খেমার রুয প্রহরীরা। লারসেন দিতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে ছবি দেখল মারিয়া। জর্জ হার্টিগানের মুখে দাড়ি নেই। অন্য দু'জনের গালে চাপ দাড়ি। অনেকক্ষণ ধরে ছবিটা দেখল মারিয়া। ওর অন্তর বলে দিল, এরা আমেরিকান সৈনিক।

আবারও জর্জ হার্টিগানের ছবি দেখল। পেছনে দেখা যাচ্ছে নিচু টিলা। ওটার চূড়ায় কোনও ধরনের দালান। ম্যাগনিফাইং গ্লাস আরও কাছে নেয়ায় দেখল, ওই দালান ক্যামবোডিয়ায় ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার প্যাগোডার মতই। অন্যসব ফোটো মনোযোগ দিয়ে দেখল। সবমিলে ছয়টা। নিচে ভিয়েতনামিয

ভাষায় হাতের লেখা।

খালি প্লেট সরিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'পড়তে পারবে?'

একটা ফোটো তুলে নিয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নিচে ধরল মারিয়া। পুরো একমিনিট চেয়ে থাকার পর বলল, 'বেশিরভাগই বুঝতে পারছি।'

www.boighar.com

'গুড,' বলল রানা, 'সেক্ষেত্রে প্রথম ধাপ এগোতে পারব আমরা। পিটার, ওর হাতে প্যাড আর কলম দাও। প্রতিটা পাতা পড়া শেষ হলে তথ্য তুলে নেবে তোমার কমপিউটারে।'

টেবিলে ব্রিফকেস তুলল লারসেন, ওটা খুলে ভেতর থেকে বের করল হলদে রঙের লিগাল প্যাড ও ফেল্ট-টিপ পেন।

ওকে জিজ্ঞেস করল মারিয়া, 'এত দ্রুত কোত্থেকে ডেভেলপ করে আনলেন এসব ছবি?'

ভদ্রতার সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকাল লারসেন। 'আমি গোয়েন্দা মানুষ, মারিয়া। আর ভাল গোয়েন্দা হতে হলে মানুষের মন-মানসিকতা বুঝতে হয়। আগেই জানি, এই হোটেলের ম্যানেজারেস ফ্রেঞ্চ, আর ওর দেশের মানুষ ভালবাসে চক্রান্ত করতে। বিশেষ করে তা যদি হয় মনের বিষয় বা স্ক্যাণ্ডাল। বড় হতে হবে স্ক্যাণ্ডাল, তা-ও নয়। কাজেই দেরি না করে চলে গেছি থিয়েরি আঁরির কাছে। গত তিন বছর ধরে এখানে আছে। এ সময়ে শহরের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে। ওকে খুলে বললাম আমার আসল সমস্যা।'

'আপনার আসল সমস্যা?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। ইউনাইটেড নেশন্স-এর এক অস্ট্রেলিয়ান মেজরের সঙ্গে লটর-পটর করছে এক ডেনিশ আর্মির মহিলা অফিসার। একই মিশনে আছে তারা। এটা চোখে পড়ছে অনেকের। আর তাদের কেউ কোপেনহেগেনে ওই মহিলার স্বামীর কাছে ই-মেইল করেছে। ওই মস্ত ব্যবসায়ী, বয়স্ক লোকটি আবার বয়সে স্ত্রীর চেয়ে অন্তত বিশ বছরের বড়। এই পর্যায়ে থিয়েরি

আঁরির হাতে দিলাম আমার সত্যিকারের কার্ড। আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ। ওই ভদ্রলোক ভাড়া করেছেন আমাকে, যাতে খুঁজে বের করি কোত্থেকে এসেছে ওই ই-মেইল। গতকাল আমার সহকারী ওই কাজেই বেরিয়েছিল। কাজে সফল হয়েছে সে। পাওয়া গেছে বেশ কিছু প্রমাণ। তার ভেতর আছে ওই মহিলা আর অস্ট্রেলিয়ান মেজরের অন্তরঙ্গ ছবি। কিন্তু ডেনমার্কে ফেরার আগে আরও নিশ্চিত হতে হবে। তাই চাইছি মোবাইলের ইমেজকে বড় করে ডেভেলপ করতে। আশা করি তাতে পুরো নিশ্চিত হতে পারব।' ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে চোখ টিপল লারসেন। 'ষড়যন্ত্র খুব ভালবাসে থিয়েরি আঁরি। এখনও ইউএন-এর অনেক অফিশিয়াল রয়ে গেছে এ দেশে। তাদের ভেতর পুরুষ ও নারীদের মেলামেশা ঠেকাবে কে! আমি ওকে বললাম, আসলে ন্যায় কাজে ব্যস্ত আমরা— গোয়েন্দা আর হোটেলের ম্যানেজাররা। আমাদের প্রথম কাজ, গোপনে ক্লায়েন্টের সুবিধা করে দেয়া। এসব বলার পর ফ্রেঞ্চ এম্বাসিতে যোগাযোগ করল মহিলা। আগেই আমাকে বলেছে, ওখানে আছে ডার্ক রুম। পরের কাজ ছিল খুব সাধারণ। উড়ে চলে গেলাম ওদের ওখানে, আবার একঘণ্টার ভেতর ফিরলাম।'

রানার দিকে তাকাল মারিয়া।

রানা বলল, 'পিটারের মত প্রাইভেট ডিটেকটিভ হতে হলে মানুষের মানসিকতা বুঝে চলতে হয়, তার চেয়েও বেশি চাই এক গাদা মিথ্যা বলা।'

কেউ কিছু বলার আগেই দরজায় টোকার আওয়াজ এল।

দরজা খুলতে গেল ফুলজেন্স, আর এ সময়ে সব ছবি জড় করে ব্রিফকেসে রেখে দিল লারসেন। একমিনিট পর একটা এনভেলপ নিয়ে ফিরল ফুলজেন্স, ধরিয়ে দিল গোয়েন্দা বন্ধুর হাতে। খামের ভেতরে রয়েছে ফ্যাক্সের একটা কাগজ। দুই লাইন

পড়ল লারসেন, তারপর ওটা দিল রানার হাতে। জোরে জোরে পড়ল রানা, তারপর দিল মারিয়ার হাতে।

কাগজে লেখা:

আজ গভীর রাতে সফলভাবে শেষ হয়েছে কাজ। আমাদের ব্যবসায়ী দুই বন্ধু ফিরছে বাড়ি। দেরি না করে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছি।

জনি।

মুখ তুলে তাকাল মারিয়া। 'জনি মানে বোধহয় রেমারিক? আর ব্যবসায়ীরা জ্যাঁ মউরোস আর সিম কর্নেলিস?'

'হ্যাঁ। আজ রাতে বা কাল এখানে পৌঁছবে রেমারিক।'

আবারও টেবিলে ছবি রাখল লারসেন। জর্জ হার্টিগানের ছবি বেছে নিল রানা, দেখতে গিয়ে বলল, 'সূত্র বলতে ওই প্যাগোডা। জানতে হবে ওটা আছে কোথায়। কাজেই এবার চাই কোনও বিশেষজ্ঞ।' মুখ তুলে তাকাল। 'এ দিকে, মারিয়া, এসব লেখা অনুবাদের কাজটা করে ফেলতে হবে তোমাকে।'

আটত্রিশ

সব পাতা ও ফোটোগ্রাফের লেখা অনুবাদ করতে পুরো একঘণ্টা লাগল মারিয়ার। কাজ শেষ করে এনেছে, এমন সময় হাজির হলো ভিটেলা রেমারিক। নতুন করে আবারও অদ্ভুত আলিঙ্গন দেখল মারিয়া। রেমারিকের ঘাড়ে হাত রেখে ঠোঁটের কাছে একবার চুমু দিল রানা। এর কারণ কী, তা লারসেনের কাছে

জানতে চাইল মারিয়া। সে জানাল, একই দলের মার্সেনারিদের ভেতর দেখা হলে এটা চালু আছে বহুকাল ধরে। ঠোঁটের কাছে চুমুর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হয়, আমি জানি, তুমি কখনও মিথ্যা বলবে না আমাকে। দু'বন্ধুর আলিঙ্গনের পর ফুলজেন্স ও লারসেনকে আলিঙ্গন করল রেমারিক। ওদের দুই গালে দিল একটা করে চুমু।

গত দু'রাত আগে রানা যেমন ক্লান্ত ছিল, সেই একই অবস্থা রেমারিকের। তবে সবাই বসে পড়তে খুলে বলল হো চি মিন সিটিতে কী ঘটেছে। এরপর জানাল, ভোরে ব্যাংককের কানেকটিং ফ্লাইটে চলে এসেছে এখানে। হো চি মিন সিটিতে ওদের সেফ হাউসে কয়েক দিনের জন্যে থাকবে জ্যাঁ মউরোস ও সিম কর্নেলিস। যদি ভ্যান ট্রেং ট্রির পরিবারকে কেউ বিরক্ত না করে, তখন ফিরবে যে যার দেশে। অথবা ওদেরকে প্রয়োজন পড়লে চলে আসবে নম পেন-এ। ওর প্রতিটি কথা হাঁ করে গিলল মারিয়া, তারপর নিজের কাজে মন দিল আবার।

এ শহরে আসার পর কী ঘটেছে, সেগুলো রেমারিককে জানাল রানা। দেখাল প্রতিটি ফোটোগ্রাফ। মনোযোগ দিয়ে দেখছে রেমারিক। এ সময়ে শেষবারের মত অনুবাদে চোখ বুলিয়ে নিয়ে লারসেনের হাতে ইংরেজিতে লেখা কাগজ ধরিয়ে দিল মারিয়া। রানার উদ্দেশে বলল, 'এসব কাগজ একদল ভিয়েতনামিয মিলিশিয়া আর এক খেমার রুয অফিসারের ভেতরে লিখিত আলাপ। তাদের বেস ব্যাটামব্যাং-এ।' নিচু স্বরে বলল মারিয়া: 'ভিয়েতনামিয ড্রাগ লর্ডদের তরফ থেকে খেমার রুযের অফিসারের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে আমেরিকান সৈনিকদের প্রতিজন সৈনিকের বদলে মিলিশিয়ারা পেয়েছে আধ কেজি করে সোনা।'

'আমেরিকান সৈনিকের নাম লেখা আছে কাগজে?' জানতে

চাইল রানা।

'না। তবে ডগট্যাগের নম্বর উল্লেখ করেছে।'

কমপিউটারে শেষ পাতার তথ্য তুলে নিচ্ছে লারসেন। মুখ তুলে বলল, 'নাম লেখা নেই বিক্রেতা ও ক্রেতার। শুধু কোড ওঅর্ড ব্যবহার করেছে। ভিয়েতনামিয নেতার নাম কমাণ্ডার ম্যানন। ক্যামবোডিয়ান কমাণ্ডার ট্যানড্রাভারনাম।'

শুকনো হাসল মারিয়া। 'এসব নাম দিয়ে কিছুই জানব না।' রানার দিকে তাকাল। 'আমার আর উপায় নেই, যোগাযোগ করতে হবে অফিসে। আমার কাছে ডগট্যাগের নম্বর আছে।'

চিন্তিত চেহারায় মাথা দোলাল রানা। 'তা কোরো। কিন্তু তার আগে সামান্য সময় দাও। বড়জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা। আশা করি এরই ভেতর খুঁজে পাব ওই প্যাগোডা বা ওই এলাকা।'

আপত্তি তুলবে ভেবেছে মারিয়া, কিন্তু হাত তুলে বাধা দিল রানা। একটু কড়া সুরেই বলল, 'কোনও অন্যায় আবদার করছি না। সুযোগ করে দিয়েছি নম পেন-এ আমাদের সঙ্গে আসার। নইলে এতক্ষণে দেশের পথে থাকতে। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় চাইছি। ওই সৈনিকরা বেঁচে থাকলে, পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা হবে ওদের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়।'

কমপিউটারে কাজ শেষ করেছে লারসেন। সুইচ অফ করে যোগ দিল আলাপে। 'মারিয়া, গত কয়েক দিনে বহু পথ এগোতে পেরেছি আমরা। এ মুহূর্তে তোমার বসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে, সে ব্যস্ত করে তুলবে নম পেন-এর সরকারী কর্তকর্তাদেরকে। জানা কথা, তাদের ভেতর দুর্নীতির শেষ নেই। বড় সব জায়গায় নিজেদের লোক রেখেছে খেমার রুয দল। ওরা যদি টের পায়, সরকার জেনেছে এ দেশে আমেরিকান এমআইএ আছে, সেক্ষেত্রে দেরি না খুন করবে লোকগুলোকে। ওদের ঠাঁই হবে মাটির ছয় ফুট নিচে।'

সবাই চেয়ে আছে মারিয়ার দিকে।

অযৌক্তিকভাবে গত ক'দিনের সব স্মৃতি ভর করছে ওর চোখে। এ কারণেই সিদ্ধান্ত নিতে পারল। বড় করে শ্বাস ফেলে বলল, 'তার মানে, একজন অফিসার হিসেবে লঙ্ঘন করছি আমার কোড অভ ডিউটি। কিন্তু ঠিক আছে, আটচল্লিশ ঘণ্টা নিতে পারো, রানা।'

উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রেমারিক, 'ঘুমাব কোথায়?'

ওর হাতে চাবি ধরিয়ে দিল লারসেন। 'পরের বাংলোয় চলে যাও।'

ক্যানভাস ব্যাগ তুলে নিল রেমারিক, একবার মৃদু মাথা দুলিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

উনচল্লিশ

আঙিনায় ধুলোর মেঘ তৈরি করেছে টয়োটা ল্যাণ্ডক্রুযার জিপ। ওটার পেছনে এসে থামল দুটো কাভার্ড ট্রাক।

জিপ থেকে নেমে হনহন করে হেঁটে এল দায়না বেলগুতাই, হাতে স্যাটালাইট ফোন।

তার ব্যস্ত ভঙ্গি দেখে সতর্ক হলো অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স।

ওর সামনে থেমে উষ্ণ সুরে বলল যুবতী, 'শুনলাম ভালভাবে সব এগিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু এবার চাই ফুল স্পিডে কাজ।'

যুবতীর ব্যবহৃত মিষ্টি পারফিউম পাগল করে দিতে চাইল এহেরেন্সকে। পিছু নিয়ে দালানে ঢুকল সে।

ধমকের সুরে কার কাছে যেন কোল্ড ড্রিঙ্ক ও খাবার চাইল দায়না বেলগুতাই। মিহি ধুলোয় ঢাকা পড়েছে ওর পোশাক ও মুখ। দীর্ঘ একটা টেবিলে পাশাপাশি বসার পর এহেরেন্সর কাছে জিজ্ঞেস করল দায়না, 'অ্যাডেলবার্ট, গত ছয়মাসে কতগুলো মাইন সরাতে পেরেছেন? কতটা মুক্ত হয়েছে এ এলাকা?'

কপাল ভাল, গতরাতে এই হিসাবই কষছিল এহেরেন্স।

'আন্দাজ... বারো হাজার মাইন।'

ঘুরে চেয়ে নিজের সেরা হাসি দিল দায়না। 'চমৎকার! কিন্তু এবার আবার কয়েক হাজার মাইন পেতে দেবেন।'

হতবাক হলো এহেরেন্স।

মেয়েটা কি পাগল?

কয়েক সেকেণ্ড পর অবাক সুরে বলল সে, 'আপনি চান আবারও ওসব মাইন পুঁতে দিই?'

'না-না, পুরনোগুলো নয়,' একটু দূরের দরজা দেখাল দায়না। 'বাইরে আছে দুটো ট্রাক। ওখানে রয়েছে দু'হাজার চেক পিপি-এমআই-এসআর ফ্র্যাগমেণ্টেশন প্রেশার মাইন। এ ছাড়া আছে, পনেরো শ' পিএমএন২ সোভিয়েত ব্লাস্ট অ্যাণ্টি-ট্যাঙ্ক মাইন। আমি চাই, খুব ঘনভাবে পেতে অ্যাণ্টি-পারসোনেল মাইনফিল্ড তৈরি করবেন। আরেকটা কথা, অ্যাডেলবার্ট, আপনারা সময় পাবেন সব মিলে আগামী চারটে দিন।'

আপত্তি তোলার আগে বড় করে দম নিল এহেরেন্স, কিন্তু কিছু বলার আগেই প্যাণ্টের পকেট থেকে আবলুস কাঠের ছোট একটা কালো বাক্স বের করে ঠেলে দিল দায়না। মনে হলো বাক্সের কারুকাজ শত শত বছর আগের শিল্প।

'এটা আপনার বোনাস,' বলল দায়না। 'খুলে দেখুন।'

কলার মত আঙুল এহেরেন্সের, কিন্তু ধরতে পারে আলতো হাতে যে-কোনও পলকা জিনিসও। সাবধানে ঢাকনি খুলল সে। ভেতরে তিনটে নিখুঁত অসিতোপল, একটা সাদা, একটা হলদে, অন্যটি কুচকুচে কালো।

রত্ন সম্পর্কে বহু কিছুই জানে এহেরেন্স, একবার দেখেই বুঝে নিল, এসব দুর্মূল্যরত্ন এসেছে কার্ডামম পর্বত থেকে। একেকটা বিক্রি করলে মিলবে কমপক্ষে এক লাখ ডলার করে। পাথরগুলো তুলে নিয়ে আবারও দেখল এহেরেন্স, তারপর কর্কশ স্বরে বলল, 'আপনি কোথায় চান আপনার মাইনফিল্ড?'

চামড়ার ফোল্ডার খুলল দায়না, ওটা থেকে নিল টাক লুইয়ের পুবের অংশের বিস্তারিত ম্যাপ। কার্ডামম পর্বতের ওপরের দিকের একটা টিলা দেখা যাচ্ছে ওখানে। কিছুটা দূরেই মাইন সরাবার কাজ করেছে এহেরেন্স। ওদিকের পর্বত থেকেই এসেছে ওর হাতে ধরা এসব রত্ন।

মানচিত্রে আঙুল রাখল দায়না। 'এখানে উঁচু দেয়াল ঘেরা টেম্পল আছে। আমি চাই ওটাকে চারপাশ থেকে মাইন দিয়ে ঘিরে দেবেন। মাঝে থাকবে সরু একটা পথ। বাইরের দিকে প্রতি দুই বর্গ গজে পেতে দেবেন একটা করে মাইন। আর ভেতরের দিকে প্রতি দুই বর্গ গজ পর পর থাকবে দুটো করে মাইন।'

'যিশু,' বিড়বিড় করল এহেরেন্স। 'আপনি চান না কেউ ওই মন্দিরে ঢুকুক?'

শীতল কণ্ঠে বলল দায়না, 'চাই না কেউ ঢুকুক বা বেরিয়ে যাক।'

এক সৈনিক এসে হাতের ট্রে নামিয়ে দিল টেবিলের ওপর। বড় কয়েক বাটি ভরা ভাত, মাছ ও শুয়োরের মাংস। পাশেই শীতল দুই বোতল খনিজ পানি ও কোক। খেতে বসে মনোযোগ দিয়ে মানচিত্র দেখল এহেরেন্স, মনে মনে কষছে নানান হিসেব।

আরও কিছুক্ষণ পর বলল, 'মন্দিরের চার শ' গজ দূর পর্যন্ত যাবে মাইনের মাঠ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ব্যবহার করব পিপি-এমআই-এসআর আর পিএমএন২এস। আপনি যদি চান চার দিনের ভেতর কাজ শেষ হোক, সেক্ষেত্রে কাজ করতে হবে রাতেও। সেজন্য চাই বাতির ব্যবস্থা। বুঝতেই পারছেন, জেনারেটর লাগবে।'

'যা লাগবে বললেই ব্যবস্থা করে দেয়া হবে,' বলল দায়না।

কৌতূহল চাপতে না পেরে কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল এহেরেন্স, 'এত জায়গা থাকতে ওই মন্দির কেন?'

চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে বলল দায়না, 'ওটা সাধারণ কোনও মন্দির নয়। ওখানে একটা পাত্রে রাখা হয়েছে পবিত্র মনের এক মানুষের দেহাবশেষ বা ভস্ম। আপনার এর বেশি কিছু জানার দরকার নেই। ওই মন্দির পাহারা দেয়ার জন্যে থাকবে আমার দলের সেরা বিশজন। মনে রাখবেন, মন্দিরের দেয়ালের ওদিকে কেউ পা রাখলে, তাকে মরতে হবে ভয়ঙ্করভাবে। কথা বুঝতে পেরেছেন, এহেরেন্স?'

আবলুস কাঠের বাক্স পকেটে রেখে বলল দক্ষিণ আফ্রিকান মার্সেনারি, 'সবসময় নির্দেশ মত কাজ করি আমি।'

চল্লিশ

অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো ম্যানেজারের অফিস। চামড়া

দিয়ে মোড়া সব চেয়ার, আসবাবপত্র রোযউডের। এক দিকের দেয়ালে মস্ত অ্যাকুয়েরিয়াম, ভেতরে নানান দিকে ছুটছে রঙিন ছোট মাছ।

'ওটা দেখলে মন শান্ত হয়,' পিটার লারসেনকে বলল থিয়েরি আঁরি। 'কখনও কখনও এই রকম একটা ফালতু দেশেও বড় হোটেলের সব কাজ ম্যানেজ করা প্রায় অসম্ভব। তখন প্রচণ্ড চাপ পড়ে মনে। রসদ জোগাড় বা দক্ষ পেশাদার স্টাফ পাওয়া খুবই কঠিন। হয়তো জানেন না, খেমার রুয দেশের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েই সে-সময় হোটেলের প্রতিটি নারী-পুরুষকে মেরে ফেলেছিল। বুদ্ধিমান বা কূটনীতিকদের প্রথম সুযোগে খুন করে। পরে খেমার রুযরা বিদায় নিলে আবারও এই হোটেল নতুন করে সাজাতে গিয়ে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন আমার বাবা। তিনিই ছিলেন তখনকার ম্যানেজার। আমি তখন ছোট। তবুও বড্ড ভয় লাগত, যদি আবার ফিরে এসে আমাদেরকে মেরে ফেলে খেমার রুয গেরিলা। একা থাকলে বারবার দেখতাম এই অ্যাকুয়েরিয়াম। তখনই বুঝলাম, মাথা ঠাণ্ডা করতে দারুণ কাজ করে এই জিনিস। অভ্যেস হয়ে গেল। তারপর থেকে দুশ্চিন্তা হলে চুপ করে দেখি মাছের ছোটাছুটি।'

'অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে কাজ করছেন,' বুকের সব আবেগ ঢেলে বলল লারসেন। 'খাবার বা সার্ভিস তুলনাহীন।'

কথাটা শুনে খুশি হলো মহিলা। 'গত পনেরো বছর ধরে ম্যানেজারি করছি তৃতীয় বিশ্বের হোটেলগুলোতে। এ কাজে হয়ে উঠেছি বিশেষ দক্ষ। ছয় মাস পর এখানে শেষ হবে আমার কাজ। তখন যেতে হবে ভিয়েতনামের অন্য একটা হোটেলে।'

'আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন না?' প্রশংসার সুরে জানতে চাইল লারসেন। 'আমি হলে তো...'

মাথা নাড়ল ফ্রেঞ্চ মহিলা। 'কখনও ক্লান্ত হই না। হোটেল

ঠিকভাবে চললেই বরং বিরক্ত হয়ে যাই। তখন এমন হোটেল বেছে নিই, যেটা লস করছে। নতুন উদ্যমে লাগি ওটার পেছনে। আমাকে বলতে পারেন হোটেলের ডাক্তার। এ কারণে বড় চেইন হোটেলগুলো আমাকে ম্যানেজার করতে চায়। ধরুন, ইণ্ডিয়ার কোনও হিলটন হোটেল মুনাফা করছে না, যিম্বাবুইয়ে বা টিম্বাকটুর, তখন ডাক পড়বে আমার।' সামনে ঝুঁকে বসল মহিলা। গোপন তথ্য দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি জানেন এসব ক্ষেত্রে প্রথমেই কী করি?'

সত্যিই আগ্রহী হয়ে পড়েছে লারসেন। জিজ্ঞেস করল, 'কী করেন?'

'আমার প্রথম কাজ শেফ, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, রিসিপশন ম্যানেজার, হাউস কিপার আর রিযার্ভেশন ম্যানেজারকে বরখাস্ত করা। বেশিরভাগ সময় তাতেই কাজ হয়। ধরুন বড় হোটেলে কাজ করছে একহাজার লোক, কিন্তু বড়জোর পাঁচজনকে বের করে দিই। তারা থাকে ওপরের মহলের লোক। এদেরকে ঘাড় ধরে বিদায় করার পর প্রমোশন দিই অ্যাসিস্ট্যাণ্টদেরকে। শিখিয়ে দিই কী করতে হবে। প্রথম তিন মাসের জন্যে মুনাফার কথা ভুলে যাই। তারপর থেকে ব্যবহার করি কমপিউটার।'

মাথা দোলাল লারসেন, আগে শোনেনি এই থিয়োরি। আপাতত কমপিউটার বিষয়ে কথা হচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করল, 'কী ধরনের কাজ করেন কমপিউটারে?'

তৃপ্ত হাসি হাসল আঁরি। 'বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করি। ওই প্রোগ্রামের কারণে জানতে পারি প্রতিটি সেণ্টার, ঘর, রেস্তোরাঁ, বার, রুম সার্ভিস, লণ্ড্রি সার্ভিস ইত্যাদি থেকে আসছে কী পরিমাণ মুনাফা। এরপর শুরু করি খরচ কমাতে। তাতে বেশিরভাগ সময় দেখি জাদুর মত কাজ হচ্ছে।' হাসল মহিলা। 'আর সব রেশিয়োর সঙ্গে ভাগ দিয়ে বের করি কতক্ষণ থাকছে

গেস্ট। মিস্টার লারসেন, জানেন, কোন্ হোটেলে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি কম সময় থাকে কাস্টোমাররা? আর তাতে লাভ হয় অনেক বেশি!'

www.boighar.com

বোকার মত মাথা নাড়ল লারসেন।

'সেরা হোটেলের একেকটা রুম থেকে আসে সাড়ে ছ'গুণ মুনাফা।' চওড়া হাসি দিল মহিলা। বুঝে গেছে, কিছুই মগজে ঢোকেনি ডেইন গোয়েন্দার। এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত হাসল আঁরি। 'ওটা থাইল্যাণ্ডের ফু তে হোটেল। সহজ ভাষায় পতিতালয় বলতে পারেন। প্রতি চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর সাড়ে ছয়জন লোক ভাড়া নেয় প্রতিটা ঘর! বুঝুন মুনাফা কাকে বলে!' মাথা নাড়ল মহিলা। 'হোটেল ম্যানেজাররা স্বপ্নে দেখে এমন হবে। কিন্তু হয়ে ওঠে না। যাক গে, এবার বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি? এম্বাসিতে আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে কাজ হয়েছে?'

সোজা হয়ে বসল লারসেন। 'জী, মাদমোয়াযেল আঁরি, কিন্তু আবারও সাহায্য চাই আপনার কাছে। আপনি আপনার বান্ধবী মাটিল্ডাকে বলে দিলে উপকৃত হব। ওই ফোটোগ্রাফের ভেতর কয়েকটার অংশ আরও বড় করে দেখতে চাই।'

'ওই জায়গার ছবি আরও বড় করবেন?'

লাজুক হাসল লারসেন। 'জী, বুঝতেই পারছেন, ওটার জন্যে তালাকও হয়ে যেতে পারে। আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে গর্তে ঢুকে গেছে মিসাইল। আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন, ওই ক্যামেরা এতই ছোট ছিল যে...'

কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছাড়ল মহিলা, পায়চারি করছে ঘর জুড়ে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'কমপিউটারে ছবি বড় করলেই হবে। ওই কাজে খুব দক্ষ মাটিল্ডা।' ডেস্কের পাশে থেমে ফোন করল মাদমোয়াযেল আঁরি। তিন সেকেণ্ড পর ওদিকের

লোকটাকে বলল, 'এম্বাসিতে মাটিল্ডাকে লাইন লাগাও।' লারসেনকে দেখে নিয়ে হাসল। 'এম্বাসিতে ফোন করার সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করি না। যাক সেসব, আপনার চাই কমপিউটারে জিনিসটা আরও বড় করা।'

লারসেন বুঝে গেল, কাজ দিচ্ছে ওর মিথ্যে কথা।

একচল্লিশ

'আমরা সবাই মাঝে মাঝে ভুল করি, নইলে বিরক্তিকর হতো জীবন,' আত্মরক্ষার সুরে বলল রানা। 'আর সবসময় যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারব, তা-ও ধরে নেয়ার কোনও কারণ নেই।'

মনে হলো না ওর কথা শুনে মনোভাব পাল্টেছে রেমারিক।

ওরা বসে আছে রানার বাংলোর প্যাটিয়োতে। পাশের টেবিলে দু'জনের জন্যে হিমশীতল টাইগার বিয়ার। মৃদু তর্ক হয়ে গেছে দুই বন্ধুর ভেতর।

'ওই ডগট্যাগ স্যান ডিয়েগোয় পৌঁছে দেয়ার পর থেকেই তোমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে কেউ,' বলল রেমারিক। 'ডগট্যাগ দেখলে, যে লোক দিয়ে গেছে, তার ছবি এঁকে রাখল মিসেস হার্টিগান, চলে এলে হো চি মিন সিটিতে, খুঁজে বের করতে চাইলে কুয়েন আন টুকে, জানলে টাক লুইয়ে দেখা গেছে শ্বেতাঙ্গ বন্দি, তারপর পেলে নম পেন-এর ফ্যাক্স মেশিনের নম্বর।' এক

এক করে আঙুলের কড়া গুনছে সে। ‘তারপর দায়না ট্রেড কোম্পানিতে হানা দিয়ে দেখলে সত্যিই তাদের কাছে আছে জর্জ হার্টিগানের ছবি।’

মুখ তুলে রানাকে দেখল রেমারিক। ‘যে খেলাতে শুরু করেছে তোমাকে, সে অত্যন্ত চালাক আর সংগঠিত। তোমার ক্ষমতা তাদের জানা আছে। ধরে নিয়েছে, হো চি মিন সিটিতে অনুসরণকারীকে ধরবে তুমি। ফ্যাক্স নম্বর জেনে নেবে। নম পেন-এ তাদের অফিসে ঢুঁ দেবে। পেয়েও যাবে ওই ফাইল। এসব থেকে কী জানতে পেরেছি আমরা? এমন এক লোক এসবের পেছনে, যে মরে গেছে চার বছর আগে। ক্ষমতাশালী লোক ছিল। এ পর্যায়ে এসে আমার মনে হচ্ছে, একটা কাজই করার আছে। আগে খুঁজে বের করতে হবে তার কুকর্মের সঙ্গী আর পরিবারের লোকগুলোকে... যদি থেকে থাকে। দ্বিতীয় কাজ হবে আমেরিকান সৈনিকদেরকে খুঁজতে শুরু করা।’

বাংলোর চারপাশে স্বর্গের মত বাগান দেখাল রেমারিক।

‘বসে আছ বিপজ্জনক এক স্বর্গে। তোমাকে খেলিয়ে খেলিয়ে জালে তুলতে চাইছে খুব চতুর, অশুভ কেউ। ইচ্ছে করে তোমাকে খেলাচ্ছে সে। যদি চাইত, অনেক আগেই খুন হতে। হো চি মিন সিটি বা এখানে খুন করতে লাগত মাত্র একজন স্নাইপার।’ পঞ্চাশ গজ দূরে এক ঝাড় শুগার পাম গাছ দেখাল রেমারিক। ‘হতে পারে ওখান থেকে তোমার বুকে বা মাথায় সাইট তাক করেছে কেউ।’

‘তোমার কথা অযৌক্তিক নয়,’ বিয়ারে চুমুক দিল রানা। ‘কিন্তু এটাও আবার যৌক্তিক যে, কোনও কারণে তারা চাইছে না এখনই মরে যাই। আমার মন বলছে, খেলার শেষাংশে পৌঁছে গেছি আমরা। জন বেলগুতাইয়ের কথা ঠিকই বলেছ। ওর মত অশুভ লোক আগে কখনও দেখিনি। পরেও হয়তো দেখব না

তেমন কাউকে। এটা জানি, ভিয়েতনামের জেলখানা থেকে কুয়েন আন টুকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল জন বেলগুতাই। এবার আমাদের পরের কাজ হবে, খুঁজে বের করা কে চালাচ্ছে কুয়েন আন টুকে। পুতুল নাচের আয়োজন করেছে সে-ই। শেষ কয়েকটা দিন হংকঙে ছিল জন বেলগুতাই। সব রহস্যের গোড়া হয়তো ওখানেই। আর এ কারণেই পেঁচা আর পিটারকে ওই শহরে পাঠাব। হয়তো মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করবে নতুন কিছু। তখন হয়তো বুঝব, আমেরিকান সৈনিকদের বিষয়ে কী করা উচিত। এমনিতেই এই দেশ থেকে পিটার বেরিয়ে গেলে সেটাই ভাল। যে-কোনও সময়ে শুরু হতে পারে গোলাগুলি। সন্ত্রাসের সঙ্গে পরিচিত নয় ও, ওর স্ত্রী আর মেয়ের কথাও ভাবতে হবে।'

উঠে প্যাটিয়োতে পায়চারি আরম্ভ করল রেমারিক। কিছুক্ষণ পর বলল, 'অন্য একটা চিন্তা ঘাই দিল মগজে। আরও কয়েক দিনের জন্যে হো চি মিন সিটিতে থাকছে মউরোস আর কর্নেলিস, তারপর ফিরবে বাড়ি। আমার মনে হচ্ছে, ওদেরকে বলা উচিত তোমার, ওরা যেন ওইখানেই অপেক্ষা করে। বা বলতে পারো, যাতে চলে আসে এখানে। ব্যাক-আপ টিম হিসেবে কাজে আসবে। আরেকটা কথা, মেয়েটাকে এবার পাঠিয়ে দেয়া উচিত ওর দেশে। জানি, ভাষার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারছে, কিন্তু যে-কোনও সময়ে খুনও হয়ে যেতে পারে।'

'বোসো, ভিটেলা,' বলল রানা। 'এভাবে হাঁটলে মনে হচ্ছে, টেনিস মাঠে দৌড়ে বেড়াচ্ছ। ওই মেয়ের ব্যাপারে অন্য সমস্যা আছে।'

চেয়ারে বসে কৌতূহলী চোখে বন্ধুকে দেখল রেমারিক। 'তুমি কি বলতে চাইছ প্রেমে পড়ে গেছ?'

'না, তা নয়। যদিও প্রেমে পড়ার মতই বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী। ইউএস আর্মির ক্যাপ্টেন, কাজ করছে নিজ তাগিদে। বা বলতে

পারো, এমআইএদেরকে খুঁজতে সাহায্য করছে আমাদেরকে। ও জানে, ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে, তবে ওই কাজ নিয়েই এখানে এসেছে। এ সবই ও ভাল করে জানে।'

'সমস্যা তা হলে কোথায়?'

'সমস্যা ওর বাবা।'

'ওর বাবা মানে?' ভুরু উঁচু করল রেমারিক।

'তুমি তো জানো, ইউএস আর্মি ইন্টেলিজেন্সের কর্নেল ছিল সে। কাজ করত ভিয়েতনামে। রিপোর্ট করা হয়েছিল, খে সানের কাছে ক্র্যাশ করে হেলিকপ্টার। হারিয়ে গেছে সে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ওখানে আসলে কোনও ক্র্যাশই হয়নি।'

'তুমি এসব জানলে কী করে?'

কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল রানা, গুছিয়ে নিল মনের কথা, তারপর বলল, 'জন বেলগুতাইকে হংকঙের প্যাগোডায় পুড়িয়ে মারার আগে, তার বেশ কিছু ফাইল আমার হাতে এসেছিল। সেগুলো পড়েছি। অনেক বছর ধরে পদস্থ ইউএস অফিসারদের জালে আটকে নিয়ে ব্যবসা চালাত জন বেলগুতাই। এসব অফিসার ছিল দুর্নীতিপরায়ণ। বাধ্য হয়ে, অথবা স্বেচ্ছায়। তাদেরই একজন ছিল কর্নেল ব্রুস ওয়াকার। আর্মি ইন্টেলিজেন্সে কাজ করত, বা বলতে পারো, জড়িত ছিল জন বেলগুতাইয়ের সঙ্গে নানান স্মাগলিঙের কাজে। শেষ দিকে বিবেকের দহনে ভাল হয়ে যেতে চেয়েছিল। সেটা পছন্দ হয়নি জন বেলগুতাইয়ের। আরেক আমেরিকান আর্মি ম্যান, জেনারেল চার্লস্ ক্রামকে নির্দেশ দেয়, সে যেন খুন করে কর্নেল ব্রুস ওয়াকারকে। জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, দেখাতে হবে, যেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে লোকটা। কিছু দিন পরের মেমোতে বেলগুতাইকে জানাল জেনারেল, খে সানের জঙ্গলে ক্র্যাশ করানো হয়েছে হেলিকপ্টার। তার আগে, দশ হাজার ফুট ওপর থেকে কর্নেল ওয়াকারকে ফেলে দেয়া হয়েছিল।

পরে অন্য অফিসাররা নিরাপদে নিচে নেমে আগুন ধরিয়ে দেয় কপ্টারে।' কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'এখন কথা হচ্ছে, এসব জানাব মারিয়াকে? নাকি চেপে যাব সব? হিরোর মতই থাকুক বাবা ওর কাছে?'

চুপ করে বসে থাকল দুই বন্ধু। অন্তত দশটা ঝিঁঝিপোকা ক্রিচ-ক্রিচ আওয়াজ তুলছে ঝোপের ভেতর। আরও কিছুক্ষণ পর দৃঢ় কণ্ঠে বলল রেমারিক, 'কিছুই বলবে না। মাঝে মাঝে অনেক বেশি ক্ষতি করে সত্যি কথা। তা ছাড়া, সত্যিই হয়তো নায়কোচিত কাজই করেছিল। লোভ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। জন বেলগুতাই তাকে খুন না করলে গোলমাল শুরু হতো তার সংগঠনে। না, রানা, মারিয়াকে ওর বাবার স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে দাও।'

মৃদু হাসল রানা, সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। 'এক মেয়ে মনে কষ্ট পাবে, তাই সব চেপে যাবে তুমি। এসব হচ্ছে রোমান্স। ইটালিয়ান রক্ত তো! তবে আরেকটা সমস্যাও আছে।'

'তাই?' কাঁধ ঝাঁকাল রেমারিক। 'হতেই পারে। সুন্দরী মহিলা আর ঝামেলা হাতে হাত রেখে চলে। এবার কী?'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ থেকে বলল রানা, 'প্রেমে পড়ে গেছে ওই মেয়ে আমার।'

'এত তাড়াতাড়ি পটালে কী করে?' হাসল রেমারিক।

'পটাইনি।'

নড়েচড়ে বসল রেমারিক। 'কী করতে চাও? বিয়ে করবে? মনে হয় না। তুমি মুক্ত বিহঙ্গ। বুঝবে ওই মেয়ে?'

'এখনও জানি না, তবে প্রথম থেকেই স্পষ্ট কথা বলেছি,' বলল রানা।

'সরিয়ে দিতে চাও ওকে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, দলের একজন হয়ে গেছে। ওকে বাদ

দেয়া নিষ্ঠুর কাজ হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমরা এখনও জানি না কোথায় চলেছি। মস্ত বিপদে পড়তে পারে।' চুপ হয়ে গেল রানা।

প্যাটিয়োতে পা রেখেছে লারসেন ও ফুলজেন্স।

রানার পাশে থেমে ব্রিফকেস থেকে চারটে আট ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চি ফোটোগ্রাফ বের করে টেবিলে বিছাল লারসেন। ভাব দেখে মনে হলো জাদুকরের মায়াজাল দেখাবে। অন্যরা ঝুঁকে এল টেবিলের দিকে।

প্রতিটি ছবিতে দেখা গেল, পুরোভূমিতে এক প্যাগোডা।

'এবার খুঁজতে হবে মন্দির বিশেষজ্ঞ,' বলল লারসেন।

বিয়াল্লিশ

সাদা টেপ দিয়ে নির্দেশ করা আঁকাবাঁকা এক পথে পিছিয়ে যাচ্ছে এহেরেন্স। ছোট ধারালো কোদাল ব্যবহার করে মাটি খুঁড়ছে, মাটির গর্তে খুব সাবধানে পেতে দিচ্ছে একের পর এক মাইন। কবর দেয়ার আগে অ্যাকটিভ করছে ওটা, তারপর সরিয়ে নিচ্ছে টেপ। এহেরেন্সের পেছনে খুঁটির মত দাঁড়িয়ে আছে লম্বা এক খেমার রুয সৈনিক, হাতে উঁচু করে ধরেছে উজ্জ্বল লণ্ঠন। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে সাদা আলো।

পেরিয়ে গেছে মাঝরাত, শীতল হয়েছে পরিবেশ। কিন্তু

কাজটা এমনই ঝুঁকিপূর্ণ, দরদর করে ঘামছে এহেরেন্স। বামে দেখে নিল, তারপর ডানে। আলোর অন্যসব বন্যার ভেতর কাজ করছে ওর লোকেরা।

শেষ মাইনটা পুঁতে উঠে দাঁড়াল এহেরেন্স, আড়মোড়া ভাঙল। গলা উঁচু করে নির্দেশ দিল: 'আজ রাতের মত কাজ শেষ। আগামীকাল ভোরে নতুন করে কাজে নামব।'

রাত অনেক, কিন্তু তার মনে হলো, একবার ঘুরে আসবে কনি টুরেনের ওখান থেকে। প্রতিবার মৃত্যু-ঝুঁকি নেয়ার পর একবার হলেও ঘুরে আসতে হয় ওই মেয়ের বাড়ি থেকে। নানান গল্প ও শারীরিক মিলনের পর ফেরার সময় কেন যেন মনে হয়, সত্যি, কী ভাগ্য, নিকষ কালো রাত পেরিয়ে গেলে নতুন করে দেখবে আগামীকালকের সূর্য।

তেতাল্লিশ

দুই বাংলোর একটাতে বসে ডিনার সেরেছে রানা ও তার সঙ্গীরা। একটু আগে সব ডিশ ও প্লেট সরিয়ে নিয়ে গেছে রুমসার্ভিস। এরপর শহরে গেছে লারসেন ও ফুলজেন্স। ওদের উদ্দেশ্য নাইট ক্লাবে ফুর্তি করা বা মেয়েদের পটানো নয়, মানুষের সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে ওরা জানতে চাইবে, কোথায় আছে ওই প্যাগোডা। বাংলোর প্যাটিয়োতে বসে আছে রানা, রেমারিক ও

মারিয়াঁ। হাতে ব্র্যাণ্ডির গ্লাস।

অতীত স্মৃতি নিয়ে কথা চলছে রানা ও রেমারিকের। বড়জোর দু'চার শব্দ উচ্চারণ করাই যেন যথেষ্ট। একজনের সামান্য ইঙ্গিত বুঝে যাচ্ছে অন্যজন। অবাক হয়ে শুনছে মারিয়া দুই বন্ধুর মাঝের অদ্ভুত আলাপ।

'কালাহান?'

'ভাল।'

'এখনও ফ্রান্সে?'

'না। নতুন কাজ।'

'কই?'

'এক মেয়ের বডিগার্ড। সুইটযারল্যাণ্ড।'

'ভাল। বসে থাকা ঠিক নয়।'

'তাই।'

'কার্ল?'

'অবসর।'

'হয়তো ভাল। সম্রাটের মতই চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে।'

এসব শুনেও কেন যেন নিজেকে অবহেলিত মনে হলো না মারিয়ার। যদিও বেশিরভাগ কথার অর্থ বুঝছে না। ওর মনে হলো, ক্রমে ক্রমে ও হয়ে উঠছে এই অদ্ভুত দলের একজন। অথচ, আর্মি ট্রেনিঙের সময় বা তারপরেও কখনও কাউকে কাছের বন্ধু বলে মনে হয়নি। অবাক কাণ্ড, এরা চারজন চার দেশের মানুষ, ব্যক্তিত্ব আলাদা, অথচ কোথায় যেন তাদের মনের টান। যে কাজে নেমেছে, তাতে ডুবে আছে পুরোপরি। প্রতি ভোরে ঘুম থেকে উঠে ওরা কেউ জানে না, দিনটা কী এনে দেবে ওদের জন্যে।

মারিয়া টের পাচ্ছে, রানার দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কারণে কী করে যেন পাল্টে যাচ্ছে ও নিজে। তবে তা কোনও ভালবাসা নয়।

যদিও পরস্পরের ভেতর কাজ করছে অন্যজনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। খুশি হয়ে উঠছে মন একজন অন্যজনকে পাশে পেলে। না, রানার মত আর কাউকে কখনও দেখেনি মারিয়া। দুনিয়া থেকে যেন অনেক আলাদা কোনও জগতে বাস করে মানুষটা। অথচ পৃথিবীর প্রয়োজনীয় সব খবর রাখছে। ভুল করে না দৈনিক পত্রিকা খুঁটিয়ে দেখতে, নিয়মিত দেখে বিবিসি বা সিএনএন-এর নিউয।

রানার ভেতর একই সময়ে রক্ষণশীলতা আর উদারনীতি দেখেছে মারিয়া। ডিনারে বন্ধু ডেইন গোয়েন্দা পিটার লারসেনকে বলেছে রানা, ওর ধারণা বিশ্বের একমাত্র কমিউনিস্ট দেশ ডেনমার্ক।

তাতে আপত্তি তুলেছিল লারসেন, কিন্তু তখন রানা বলেছে, সত্যিকারের আদর্শ কমিউনিযম রাশা, চিনে বা কিউবায় ছিল না। কমিউনিযমের সত্যিকারের চিন্তা বা আদর্শ বিকশিত হয়েছে ডেনমার্কে। ওই দেশের সমাজ দেখভাল করেছে দুস্থদেরকে। মুক্ত-চিন্তা থেকে সরে যায়নি, কিন্তু দেশ বা মানুষের কল্যাণে কাজ করেছে সবাই। বড়লোক কারও আপত্তি নেই বিপুল টাকা আয়কর দিতে, আর সেসব টাকা পেয়ে সমাজ বা মানুষের উন্নয়নে দু'হাতে খরচ করছে সরকার। খুব কম বড়লোকই আছে ওই সমাজে, আবার খুবই গরীব বলে কোনও মানুষও নেই।

আবারও আপত্তি তুলবে ভেবেছিল লারসেন। তখন হাত তুলে ওকে বাধা দিয়ে বলেছে রানা, 'সারা পৃথিবী ঘুরতে হয়েছে আমাকে, পিটার। কিছুদিন আগেও তোমার বাড়িতে ছিলাম প্রায় এক সপ্তাহ। আমার মনে হয়েছে, ডেনমার্কে জীবনযাত্রার মান অন্যসব দেশের চেয়ে অনেক উন্নত। তোমার গর্ব হওয়া উচিত নিজের দেশের জন্যে।'

তর্ক করতে যায়নি লারসেন।

এরপর রেমারিককে বলল রানা, 'ময়ূরের দেশ তোমার, ভিটেলা। নতুন সার্ভেতে দেখা গেছে, ইতালিয়ানরা তাদের টাকার চল্লিশ ভাগই ব্যয় করছে পোশাকের পেছনে।' রেমারিককে দেখেছে চট্ করে। দামি আরমানি স্যুট বন্ধুর পরনে। 'আমার ধারণা, তোমার আয়ের ষাট ভাগ খরচ করো তুমি পোশাকের পেছনে।'

আপত্তি তোলেনি রেমারিক, হাসি হাসি মুখে বলেছে, 'এ থেকে বোঝা যায় ইতালিয়ানরা সভ্য, তারাই তৈরি করেছে সভ্যতা। আমরা মনে করি না অন্য কোনও জাতির স্টাইল বলে কিছু আছে। আপত্তি তুলি ট্যাক্স দিতে, পছন্দ করি দামি খাবার খেতে, আর মোটা মহিলাদেরকে দেখলে খুশি হই। বাস করি সূর্যের নিচে, আর স্বপ্ন দেখি বড় বড়। আমরা যেমনই হই, হই-চই করে জীবন পার করি ফুর্তি করে।'

আলাপে যোগ দিল ফুলজেন্স। 'সভ্যতা নিয়ে যদি কথা ওঠে, ফ্রান্স হচ্ছে হৃদয় বা বিবেকের দেশ। আমরা আবিষ্কার করেছি সেরা সব খাবার, উৎপাদন করি সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদেরকে, সেরা ওয়াইন, দুর্দান্ত সব পনির আর সবচেয়ে দ্রুতগামী রেলগাড়ি। ডেইনরা সংগঠিত আর ইতালিয়ানরা অতিরিক্ত স্টাইলিশ।' চট্ করে মারিয়াকে দেখেছে ফুলজেন্স। 'আর আমেরিকানদের আছে হলিউড। জন ওয়েনকে বাদ দিলে আর আছেটা কী ওদের?' রানাকে দেখল। 'বা বাংলাদেশের কী আছে? তা-ও তো মনে করি না ওই দেশে মাসুদ রানার মত এক হাজার পুরুষ আছে। থাকলে এত দিনে ওই দেশ পৃথিবীর সেরা দেশ হতো।'

রানা চুপচাপ মিটমিট করে হেসেছে।

ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল ফুলজেন্স। 'কী?'

'যা বললে, তাই হবে,' অন্তর থেকে বলল রানা, 'পৃথিবীর

আগামী প্রজন্ম দেখবে, পঞ্চাশ বছরের ভেতর বাংলাদেশকে পৃথিবীর সেরা দেশ হিসেবে আর সব দেশের দরবারে সিংহাসনে তুলে দেবে একদল দুর্ধর্ষ দেশপ্রেমিক, কঠোর পরিশ্রমী বাঙালি যুবক। ঠেকাতে পারবে না কেউ।'

রানার দৃঢ় কথা শুনে একটু থমকে গেল সবাই।

ফুলজেন্স ওর দেশের কথা তুলে টিটকারি মেরেছে বলে গর্বিত সুরে বলল মারিয়া, 'আমরা বিশ্বকে দিয়েছি ব্লুয আর জ্যায, লুই আর্মস্ট্রং, এলা ফিট্য্জারেল্ড, ব্রুবেক আর মিলার। পৃথিবীর বহু মিউযিক এসেছে আমার দেশ থেকে। তোমাদের ইউরোপিয়ানদের থাকতে পারে মোযার্ট, বিটোফেন বা ভার্ডি, কিন্তু আমাদের আছে নতুন সংস্কৃতি। সেজন্য আমরা গর্বিত। আমরা শুনবই না, কোথাকার কোন্ ফ্রেঞ্চ লেকচার মারবে।'

সবার ভেতর তর্ক লেগে গেছে দেখে, খুশিতে চকচক করে উঠেছে ফুলজেন্সের চোখ।

চমৎকার কেটেছে ওদের ডিনারের সময়টা।

এইমাত্র গ্লাস খালি করে উঠে দাঁড়াল রেমারিক। বলে দিল, বিছানার সঙ্গে জরুরি মিটিং আছে ওর। রেমারিক চলে যাওয়ার পর নিজের জন্যে আরও সামান্য কনিয়্যাক নিল মারিয়া। রানা নিল শেষবারের মত আধ গ্লাস লাল ওয়াইন।

'ওদেরকে বাছাই করেছ কীভাবে?' জানতে চাইল মারিয়া।

'বাছাই?' ভুরু নাচাল রানা।

'হ্যাঁ, বাছাই। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, এদের মত হাজার হাজার কঠোর লোকের সঙ্গে মিশেছ। তাদের ভেতর থেকে কীভাবে বের করলে ওদেরকে? যেমন সিম কর্নেলিস বা জ্যাঁ মউরোস? সবাই ওরা ভাল মানুষ। হয়তো ভয়ঙ্কর সব কাজ করেছে, কিন্তু ওদের কাউকে খারাপ মানুষ বলে মনে হয়নি আমার।'

মারিয়ার কথা শুনে গ্লাসের ভেতরের ওয়াইন ঘোরাতে শুরু করে সিরিয়াসলি ভাবতে লাগল রানা। কিছুক্ষণ পর লাল তরল থেকে চোখ সরিয়ে বলল, 'বাছাইয়ের ব্যাপার ছিল না, মারিয়া। কোনও কোনও সময়ে আমাদের জীবন ছিল বিপদের ভেতর, আর তখন পরস্পরকে চিনতে পেরেছি। অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে চলার পথে। তখন কখনও জোর টক্কর লেগেছে। কারও কারও সঙ্গে খুব জোরে নয়। যেমন জর্জ হার্টিগান। ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ভিয়েতনামে। স্বল্পবাক, লাজুক আর ভিতু, কিন্তু ভাবত একদিন হয়ে উঠবে সাহসী। ওকে পছন্দ করতাম। ওর বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বুঝলাম, ওকে পছন্দ করেছি কেন। সত্যিকারের ভাল মানুষ তাঁরা। আর সে কারণেই আজ এখানে আমি। বেঁচে থাকলে ঠিকই খুঁজে বের করব কোথায় আছে জর্জ, বা কী হয়েছে ওর। এটা শুধু কোনও কৌতূহল নয়। আমার মনে হয়েছে, বহু দূরের স্যান ডিয়েগোতে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছেন এক বয়স্ক দম্পতি, আর তাঁদের অধিকার আছে জানার, একমাত্র ছেলেটার কী হয়েছে। এটা আমার কোনও সেন্টিমেন্টাল ডিসিশন নয়। আমি শুধু পালন করছি নিজ দায়িত্ব। আর আমার সঙ্গে এসেছে কয়েকজন বন্ধু। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এরচে' বেশি কিছু নয়।'

'তুমি একটা ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইছ?'

'বলতে পারো। আগামীকাল সকালে ফিরে যেতে পারি নিজের দেশে। ওখানে আছে একদল ভাল বন্ধু। কিন্তু এমনও হতে পারে, আগামী রাতে ভালভাবে ঘুমাতে পারব না। চোখের সামনে ভাসবেন্ন দুই বুড়ো-বুড়ি। যাঁরা আশা নিয়ে চেয়ে আছেন আমার দিকে— ফিরিয়ে নিয়ে যাব তাঁদের ছেলেকে। কাজেই জর্জ হার্টিগান বেঁচে থাকলে তাকে উদ্ধার করব, আর মরে গিয়ে থাকলে তা জানিয়ে দেব তাঁদেরকে। এরপর যাই ঘটুক, মনে করব শেষ

করেছি নিজের কাজ।'

'তারপর কী করবে? এভাবেই পার করবে জীবন?'

'জীবনটাকে খারাপ বলে মনে হয় না আমার,' হাসল রানা।

'বা জড়িয়ে যাবে আর কোনও কাজে? যেমন ইতালিতে জড়িয়ে গিয়েছিলে লুবনা নামের ছোট্ট এক মেয়ের ভালবাসায়?'

'ভালভাবেই পড়েছ আমার ফাইল,' মন্তব্য করল রানা।

মাথা দোলাল মারিয়া। 'তবে বিস্তারিত লেখা ছিল না। বলবে আমাকে ওর কথা?'

'সিআইএর তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে একরাতে নেপলসে দেখা করি রেমারিকের সঙ্গে,' বলল রানা। একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর কণ্ঠ: 'সেদিন বদলে গেল ভাগ্যের চাকা। বডিগার্ড হিসেবে আমাকে কাজ জুটিয়ে দিল রেমারিক। লুবনা ছিল এক ইতালিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের কিশোরী মেয়ে। আমার দায়িত্ব ছিল ওকে রক্ষা করা, কিন্তু পারিনি। কিডন্যাপ হয়ে গেল। ধর্ষণ করে মেরেও ফেলল ওরা ওকে। কিন্তু তার আগে ওই নিষ্পাপ মেয়েটাকে সত্যি ভালবেসে ফেলেছিলাম। নিজের ছোট বোন থাকলে এমনই হতো আমার মনোভাব। মাত্র এগারো বছরের লুবনা। কিন্তু একেবারে পাল্টে দিয়েছিল আমার জীবন। ওকে কিডন্যাপিঙের সময় বেশ কয়েকবার গুলি খেয়ে মরতে বসি। একটু সুস্থ হলে গেলাম গোজো দ্বীপে। পরবর্তী দু'মাস নিজেকে মাফ করলাম না, দৈহিকভাবে আবারও হয়ে উঠলাম ফিট। তারপর আবারও ফিরলাম ইতালিতে। একে একে খুন করলাম ইতালিয়ান মাফিয়ার চিফগুলোকে। ওরাই দায়ী ছিল লুবনার খুনের জন্যে। টাকার জন্যে তাদেরকে শেষ করিনি। নিজের তাগিদে কাজ করেছি। তারপর একসময়ে শেষ শয়তানটাকে খুন করে হারিয়ে গেলাম ওই দেশ থেকে। তারপর আজও চলছে জীবন, আগের মতই, জানি না প্রতি দিনের দিগন্তের ওপাশে কী আছে।'

'তোমার কখনও নিজেকে একা বলে মনে হয় না?' জানতে চাইল মারিয়া।

'কখনও, হ্যাঁ। অনেক রাতে। যখন চুপ করে বসে থাকি। ভিড় করে অনেক স্মৃতি। কোনোটা কষ্টের, কোনোটা ভাল লাগার।'

'আজ রাতে কোনও স্মৃতি তোমার কাছে আসবে না,' নরম সুরে বলল মারিয়া, 'আজ আমি তোমার পাশে থাকব। সে-রাতে হোটেলে আমার মন খারাপ ছিল বলে আগলে রেখেছিলে। আজ তাই করব আমি।'

রানাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে ছিল মারিয়া, ভোরের প্রথম সোনালি আলোয় খুব শান্ত মন নিয়ে জেগে গেল। মুগ্ধ চোখে দেখল ঘুমন্ত রানাকে। গতরাতে ওকে খুব কাছে পেয়ে এখন ধন্য মনে হচ্ছে নিজেকে। যদিও জানে, কখনও ওর হবে না ওই নিঃস্বার্থ মানুষটা।

এক সেকেণ্ড পর চোখ মেলে ওকে দেখল রানা। আধ শোয়া হয়ে মারিয়ার চিবুকে চুমু দিল। 'দারুণ কাটল রাত।'

'তাই বুঝি?' হাসল মারিয়া। চোখে বিস্মিত দৃষ্টি। 'দারুণ কাটল রাত?'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রানা।

'দু'জন তো একটু গল্পও করলাম না, তার আগেই ঘুমিয়ে পড়লাম বেঘোরে,' বলল মারিয়া, 'ঠিক যেমন হোটেলে সে-রাতে ঘুমিয়ে পড়ি দু'জন।'

www.boighar.com

'তাই তো!' মেনে নিল রানা।

'এসো, আগামী ক'রাত এভাবেই ঘুমাই,' হাসল মারিয়া।

'দিনেও একটু ঘুমানো ভাল,' বলেই মারিয়াকে বুকে নিয়ে শুয়ে পড়ল রানা। পরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে গেল ওরা।

চুয়াল্লিশ

'সত্যি?' ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

'বিশ্বাস করো বা না করো, ওটাই ঠিক,' বলল লারসেন।

ভাড়া করা টয়োটার প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে রানা। ড্রাইভ করছে লারসেন। এবড়োখেবড়ো সরু এক রাস্তা ধরে মেকং নদীর পাশ দিয়ে চলেছে ওরা।

'প্রাক্তন এক অস্ট্রেলিয়ান কর্নেল?'

'হ্যাঁ।'

'এখন বুদ্ধের মঠে পুরোহিত?'

'হুঁ। শাক-সবজি ছাড়া কিছুই খান না। তাঁকেই দরকার আমাদের।'

'এখানে এলেন কী করে?'

'পঞ্চাশ বছর আগে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। পাঁচ বছর প্রচুর লেখাপড়ার পর হয়ে ওঠেন পুরোহিত। চল্লিশ বছর আগে আসেন ক্যামবোডিয়ায়। লেখাপড়া তাঁর এতই বেশি, স্থানীয়রা বুঝে গেল, সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ এসেছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি হয়ে ওঠেন দেশের সেরা তিন পুরোহিতের একজন। থাইল্যাণ্ড থেকেও তাঁর কাছে আসে শত শত ভক্ত। মানুষটার বয়স প্রায় নব্বুই। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ও তার মন্দিরগুলোর বিষয়ে তাঁর চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তবে কথা হচ্ছে, তিনি মুখ খোলেন না

বললেই চলে। রানা, তোমার সঙ্গে উনি কথা বলবেন, এমন না-ও হতে পারে। তবে চেষ্টা করতে দোষ নেই।'

'এঁর খবর পেলে কোথা থেকে?'

'গতরাতে এক আমেরিকানের সঙ্গে কথা বলছিলাম বার-এ। ওটার নাম নো প্রবলেম বার। আর্কিয়োলজির ওপর লেখাপড়া করছে যুবক। বিশেষ করে পৃথিবীর পুব দিকের এলাকার বৌদ্ধ সব দালানের বিষয়ে তথ্য জোগাড় করছে। ধর্মে সে বৌদ্ধ। হাতে বালা। চুল আর দাড়ির কারণে চেহারা দেখা যায় না। কিন্তু জানে অনেক। সে-ই জানাল ওই পুরোহিতের কথা। তিনি পরিচিত জাম পান রং নামে। তাঁকে বলা যেতে পারে বৌদ্ধ মন্দিরের ওপর এনসাইক্লোপিডিয়া। কিন্তু সমস্যা, মানুষজন তেমন পছন্দ করেন না। ভেবে দেখলাম, চেষ্টা করে দেখি, তাই তোমাকে নিয়ে চলেছি ওঁর আস্তানায়।

ছোট এক গ্রামের ভেতর দিয়ে চলেছে ওদের গাড়ি। একটা দোকানের পাশে থামল লারসেন, দোকানীকে দেখাল হাতের মানচিত্র। সে আঙুল তুলে দূরে দেখিয়ে দিল ভাঙাচোরা এক কাঠের বাড়ি। ওটা নদীর তীরে, দেখলে মনে হয়, যে-কোনও সময়ে কাত হয়ে পড়বে পানির ভেতর।

'ওটাই,' রানাকে বলল লারসেন, 'দেখা যাক বুড়োর মুখ খোলাতে পারো কি না।' গাড়ি নিয়ে বাড়ির সামনে থামল ও।

মনোযোগ দিয়ে বাড়িটা দেখল রানা, বিড়বিড় করে বলল, 'ভাত আর ফল তুমি নাও, আমার হাতে থাকুক ফোটো। একটা কথাও বলব না আমরা। তুমি দেবে ভাত আর ফল, আর তাঁর পায়ের কাছে রাখব ফোটো। অতবড় এক্সপার্ট হলে কৌতূহলী হয়ে ওঠার কথা।'

রানার কথা মত কাজ হলো।

ওরা সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ তোলা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দেখল, পদ্মাসনে বসে আছেন বৃদ্ধ। পরনে হলদে, পাতলা আলখেল্লা। মাথা জুড়ে মস্ত টাক। কপালে হাজার দশেক ভাঁজ। সাদা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে দেখা গেল না মুখ।

দরজার পাশেই বাস্কেটের ভেতর ভাত-ফল রাখল লারসেন।

রানা গিয়ে থামল বৃদ্ধের সামনে, মেঝেতে নামাল চারটে ফোটো। আবারও পিছিয়ে গিয়ে থামল দরজার কাছে।

বাস্কেট বা লারসেনকে দেখেও দেখলেন না পুরোহিত। চোখ রানার ওপর। পেরিয়ে গেল পুরো তিন মিনিট। থাকল শুধু নদীর মৃদু কুলকুল শব্দ। তারপর খুব ধীরে ধীরে ঘাড় নিচু করে ফোটোর ওপর চোখ রাখলেন জাম পান রং।

পঁয়তাল্লিশ

'সাহায্য লাগবে, তবে আমেরিকানদের কাছ থেকে বাড়তি সহায়তা চাই না।' মুখ তুলে মারিয়াকে দেখল রানা, আঙুল তাক করল ফোটোর ওপর। 'ওই প্যাগোডা খেমার রুয এলাকার ঠিক মাঝখানে।'

'পুরোহিত কি পুরো নিশ্চিত?' জানতে চাইল মারিয়া।

'হ্যাঁ। বয়স নব্বুইয়ের বেশি। কিন্তু এখনও টনটনে বুদ্ধি। এসব ফোটো দেখে নিজেও অবাক হয়েছেন। খেমার রুযরা এই দেশ দখল করে নেয়ার আগে, অন্তত তিরিশ হাজার প্যাগোডা ছিল। সেগুলোর তিনভাগের দু'ভাগ ধ্বংস করে তারা। জাম পান রং এখনও বিস্মিত যে, কেন ওটা ধ্বংস করা হয়নি।'

ফোটোর দিকে মনোযোগ দিল রেমারিক। 'তিরিশ হাজার প্যাগোডা থেকে থাকলে, সেক্ষেত্রে তো ওগুলো দেখতে ছিল প্রায় একইরকম। ওই পুরোহিত বুঝলেন কী করে, এই প্যাগোডাই খুঁজছি আমরা?'

'সত্তরের দশকে ওখানে বহুবার গেছেন প্রার্থনা করতে,' বলল রানা, 'এগারো শ' একাশি সাল থেকে এগারো শ' তিরানব্বুই সালের ভেতর তৈরি করেন সপ্তম জায়াভারমান। ওটার আর্কিটেকচারে আছে ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ। জাম পান রং পুরোপুরি নিশ্চিত।'

'বললে তিনি খুব বুড়ো, এ ছাড়া তাঁকে দেখে আর কী মনে হলো তোমার?' রানার কাছে জানতে চাইল মারিয়া।

'অবাক লেগেছে উচ্চারণ শুনে,' বলল রানা, 'মনে হলো কখনও সিডনি শহর ছেড়ে কোথাও যাননি। বিশ্বের আর সব বিষয়ে কোনও আগ্রহ নেই তাঁর। খুব শান্ত, মস্ত গাছের মত। একটু ভয়ও লাগিয়ে দেন।'

'কী কারণে ভয় লাগে?' জানতে চাইল মারিয়া।

'কথা আসলে তিনি বলেছেন পিটারের সঙ্গে, আমার সঙ্গে কথা হয়েছে খুব কম। অনেকক্ষণ আমার পায়ের দিকে চেয়ে ছিলেন। তারপর বললেন, "বাছা, তুমি আছ মস্ত বড় বিপদে। ওই বিপদ আসছে এক মেয়েমানুষের কারণে।"'

'আর কিছু বলেননি?'

'বলেছেন। আমি ধার্মিক নই বা কুসংস্কারাচ্ছন্নও নই, কিন্তু

তাঁর উপস্থিতিতে কেমন যেন লেগে উঠল। মন বলল, আমার বিষয়ে গোপন অনেক কিছুই জানেন তিনি। যা আমি মুখে বলিনি।'

'এ কারণেই কি আমেরিকান সাহায্য চাইছ?' জিজ্ঞেস করল রেমারিক।

মাথা নাড়ল রানা। 'না, সেজন্য নয়। টাক লুইয়ের দক্ষিণ-পুবে চার মাইল দূরে ওই মন্দিরে থামবে পথ চলা, আর সেখানে আছে সমাবেশ করা খেমার রুজ বাহিনী। জায়গাটা পশ্চিম ক্যামবোডিয়ায়। এমন কোনও উপায় নেই যে গাড়ি নিয়ে ঘুরে দেখব ওদিক। কাজেই ওখানে যেতে হলে সাহায্য চাই। আর তার আগে দরকার জরুরি তথ্য। আমাদের জানা দরকার ওই এলাকায় কী ঘটছে।' মারিয়ার দিকে তাকাল রানা। 'ওই এলাকায় যেহেতু আমেরিকান এমআইএ আছে, ধরে নিতে পারি আমেরিকান সরকার থেকে সহায়তা দেয়া হবে। ঠিক?'

'অবশ্যই। ফোন করব, মুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন কর্নেল জেফ গর্ডন। একটু পর এম্বাসিতে গিয়ে সিকিয়োর লাইনে কথা বলব তাঁর সঙ্গে। কী ধরনের সাহায্য দরকার?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এখনও নিশ্চিত নই। তবে প্রথমেই ব্যাটামব্যাং-এর দক্ষিণ-পুবের এলাকার ওপরে তথ্য লাগবে। বিশেষ করে জানতে চাই কার্ডামম পর্বত সম্পর্কে। বিস্তারিত মানচিত্র লাগবে, এনএসএ-র মাধ্যমে স্যাটালাইট সার্ভের রিপোর্ট পেলে ভাল হতো। সিআইএর কাছেও পাওয়া যাবে। জানতে হবে ঠিক কোথায় জড় হয়েছে খেমার রুজ বাহিনী। স্থানীয় কমাণ্ডারদের নাম জানলে সুবিধা পাব। ক্যামবোডিয়ান কোনও অফিশিয়ালের মাধ্যমে এসব তথ্য জোগাড় করতে চাই না। সেক্ষেত্রে মস্ত ঝুঁকির ভেতর পড়বে এই মিশন। তাদের অনেকে এখনও খেমার রুজের পায়ে হাত রেখে চলে।'

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল মারিয়া। কীসের যেন হিসাব কষে নিয়ে বলল, 'ওয়াশিংটনে এখন রাত আটটা। কর্নেল গর্ডন আছেন বাসায়। তাঁর সঙ্গে কথা বলব। জেনে নেব নম পেন-এ কোথায় আছে আমেরিকান এম্বাসি। ট্যাক্সি নিয়ে ঘুরে আসব ওখান থেকে।'

কমপিউটার কোলে নিয়ে বসে আছে লারসেন, কয়েকটা কি টিপে মনিটর দেখল। সহজ সুরে বলল, 'এম্বাসির অ্যাড্রেস ২৭ ইও স্ট্রিট ২৭০। অ্যাম্বাসেডারের নাম অ্যাণ্ডি হেণ্ডারসন। সিআইএ রেসিডেন্ট সম্ভবত সিনিয়র মিলিটারি অ্যাটাশে হেনরি গেট্স্। বয়স তেতাল্লিশ বছর। বিবাহিত। দুটো বাচ্চা। বলতে গেলে সারাটা দিন পার করে টেনিস খেলে।'

'তাই?' ভুরু উঁচু করল মারিয়া, 'এত তথ্য কোত্থেকে?'

হেঁয়ালি ভরা হাসি দিল লারসেন। 'আমার কাজই তো তথ্য সংগ্রহ করা।' রানার দিকে তাকাল। 'ঠিক জানা নেই কর্নেল গর্ডন যথেষ্ট সিনিয়র কি না, নইলে সিআইএর ওই লোকের কান মুচড়ে তাকে কাজে নামাতে পারবেন না।'

'অত্যন্ত সিনিয়র অফিসার কর্নেল গর্ডন,' বলল মারিয়া। 'তবুও ওই লোক ঝামেলা করতে চাইলে দেরি না করে সিনেটর ফ্রান্সিস জেফ্রির সহায়তা নেবেন। আর উনি আমেরিকার প্রায় যে-কারও কান মুচড়ে দিতে পারবেন।'

দরজায় টোকা পড়তেই থেমে গেল মারিয়া। উঠে গিয়ে কবাট খুলল ফুলজেন্স, ফিরে এল একটা এনভেলপ নিয়ে। ওটা দিল মারিয়ার হাতে। 'রিসেপশন থেকে দিয়ে গেল, তোমার জন্যে।'

খাম খুলল মারিয়া।

ভেতরে এক পাতা কাগজ। কমপিউটারের লেযার প্রিণ্টারে ছাপা। কাগজে লেখা: 'এটা খুব জরুরি, তোমার বন্ধুরা আপাতত আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতর কিছুই করবে না।'

কোনও সই নেই।

কাগজ ও খাম রানার হাতে দিল মারিয়া।

জোরে জোরে পড়ল রানা। তারপর দেখল খাম।

ওপরে লেখা: ক্যাপটেন মারিয়া ওয়াকার, ইউএস আর্মি, এমআইএ ডিপার্টমেন্ট, কেয়ার অভ ক্যামবোডিয়ানা হোটেল, বাংলো পাঁচ।

বেশ কিছুক্ষণ খামের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। যেন বুঝতে চাইছে কী তথ্য দেবে ওটা । একটু পর কাগজ ও খাম লারসেনের হাতে দিল।

ব্রিফকেস থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে মনোযোগ দিয়ে খাম দেখল লারসেন। বাদ পড়ল না চিঠি। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আধুনিক লেসার প্রিন্টার। হাই রেযোলিউশন।'

ওর ঘাড়ের কাছ থেকে বলল ফুলজেন্স, 'দায়না ট্রেড কোম্পানির অফিসে ঠিক তেমন একটা লেসার প্রিন্টার আছে। ওটা জাপানিয ওকিআই।'

আবারও খাম ও কাগজ ফেরত নিয়ে বলল রানা, 'কাগজ বোধহয় ওরাই পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময় আদায় করতে চাইছে কেন?'

কারও কাছে ওই জবাব নেই।

মারিয়াকে বলল রানা, 'তুমি বরং যোগাযোগ করো তোমার বসের সঙ্গে।' লারসেনের দিকে তাকাল। 'এদিকে পেঁচাকে নিয়ে ঘুরে এসো হংকং থেকে। জন বেলগুতাইয়ের শেষ কয়েকটা দিন সম্পর্কে তথ্য খুঁজবে। বৃহস্পতিবার বিকেলের আগে কোনও তথ্য পেলে তা কাজে আসবে।'

ফোটো তুলে ফোল্ডারে রাখল মারিয়া, ওখানে ঠাঁই পেল ওর অনুবাদ করা কাগজ। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ফিরব একঘণ্টার ভেতর। যোগাযোগ করতে চাইলে, আমাদের এম্বাসির মাধ্যমে

হংকঙের কনসুলেটরের সিকিয়োর লাইন ব্যবহার করতে পারবেন, লারসেন।'

'তা হলে তো ভালই হয়,' বলল লারসেন।

একটু আগে আসা ছাপা চিঠির কথা ভাবছে রানা, কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ওরা সময় চাইছে। আমরা বোধহয় বেশি তাড়াহুড়ো করছি ওদের তুলনায়।'

ছেচল্লিশ

বিফ ক্যাসেরোল-এর সঙ্গে স্প্রিং ভেজিটেবল রেঁধে খুশি হয়ে উঠেছেন সুসানা গর্ডন, বরাবরের মতই ডাইনিং টেবিলে এনে রাখলেন গরম হাঁড়ি। ঢাকনি খুলতেই পাওয়া গেল দুর্দান্ত সুঘ্রাণ। একটু সামনে ঝুঁকে বসে পুলকিত কণ্ঠে বললেন কর্নেল গর্ডন, 'সত্যি, ডার্লিং, তুলনা নেই তোমার। তুমি আসলে আমার জীবনের একমাত্র আলো।'

একই সংলাপ আউড়ে যাচ্ছেন তিনি গত পঁচিশ বছর ধরে, কিন্তু তাতে বিরক্ত নন তাঁর স্ত্রী। জানেন, অন্তর থেকেই ওই কথা বলেন মানুষটা। যদিও মাঝে মাঝে সুসানার বলতে ইচ্ছে করে: আমিই একমাত্র আলো? দিই তা হলে লাইটের সুইচ টিপে! পারলে আমার আলোয় বসে ডিনার খাও দেখি!

নারকেলের খোলের সমান এক চামচ ভরে খাবার তুললেন

গর্ডন, আর ঠিক তখনই বেরসিকের মত বেজে উঠল ফোন। মহাবিরক্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে স্ত্রীকে বললেন, 'একমিনিট। যেই হোক, ওকে বলে দেব পরে কল দিতে।'

তা হওয়ার নয়, জানেন সুসানা।

ঘরের একপাশে গিয়ে ল্যাণ্ড ফোনের রিসিভার তুললেন কর্নেল গর্ডন। তিন সেকেণ্ড পর বললেন, 'হ্যাঁ, মারিয়া। তুমি কোথায়?' চুপ হয়ে গেলেন। শুনতে লাগলেন ওদিকের কথা। কয়েক মিনিট পর বাম হাতে রিসিভার নিয়ে, ডান হাতে তুলে নিলেন প্যাড ও কলম। টেবিলে প্যাড রেখে লিখতে শুরু করেছেন। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও ফোটো। সবগুলো। তোমার অনুবাদ করা কাগজটাও চাই।'

স্বামীর কণ্ঠে উত্তেজনা টের পেলেন সুসানা। মানুষটা বলছে: 'বিশ মিনিটের ভেতর অফিসে পৌঁছব। অ্যাম্বাসেডারকে জানিয়ে দেয়া হবে, যাতে তোমার কাজে সহায়তা করেন। বলা হবে, যেন তোমাকে দেয়া হয় স্যাটালাইট ফোন। সেক্ষেত্রে বারবার এম্বেসিতে গিয়ে যোগাযোগ করতে হবে না।' আবারও কী যেন শুনতে লাগলেন, তারপর বললেন, 'যেহেতু হাতে পেয়ে যাচ্ছি ছবি, মনে হয় না সিনেটর ফ্রান্সিস জেফ্রির সাহায্য লাগবে। গত কয়েক বছরের ভেতর ভাল একমাত্র সংবাদ এটা। যাই হোক, সিনেটরকে জানিয়ে রাখব। তুমি চাইলে সাহায্য করতে কাউকে পাঠাতে পারি।' আবারও চুপচাপ শুনলেন, তারপর মাথা দুলিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। আগামী বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত হাত গুটিয়ে রাখব। এম্বাসিতেই অপেক্ষা করো। স্টেট-এর লোকের সঙ্গে কথা শেষ করে ফোন দেব অফিস থেকে।'

ফোন রেখে ডাইনিং টেবিলে স্ত্রীর কাছে ফিরলেন জেফ গর্ডন। 'মারিয়া ওয়াকার ফোন করেছিল। নম পেন থেকে। ওর সঙ্গে আছে কয়েকজন মার্সেনারি আর বাংলাদেশি এক গুপ্তচর। ও

পেয়েছে হারিয়ে যাওয়া আমেরিকান তিনজন সৈনিকের ছবি। বন্দি ওরা খেমার রুযের হাতে। অন্তত একজনের ব্যাপারে পুরো নিশ্চিত। অন্য দু'জনের ব্যাপারে শিয়োর হতে ডগট্যাগের নম্বর মিলিয়ে দেখব।' ক্যাসেরোলের দিকে চেয়ে স্যালিউট দিলেন তিনি। 'সরি, হানি, খাবার তুলে রাখো। পরে গরম করে নেব। আজ অফিসে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে হতে পারে।'

বিরক্ত নন সুসানা। ভাল করেই জানেন, তাঁর স্বামী যে কাজ করেন, তাতে বেশিরভাগ সময়ই বাস করতে হয় হতাশার ভেতর। আজ বহুদিন পর খুশিতে চকচক করছে তাঁর চোখ। চেয়ার ছেড়ে স্বামীর গালে চুমু দিলেন সুসানা। 'রওনা হয়ে যাও, জেফ। সময় পেলে ফোন কোরো।'

সাতচল্লিশ

অ্যাম্বাসেডার অ্যাণ্ডি হেণ্ডারসন সত্যিকারের ক্যারিয়ার অফিসার, সবসময় কাজ করেন নিয়ম অনুযায়ী। পেছনের দেয়ালে ঝুলছে তাঁর পাওয়া সম্মানজনক সব নক্ষত্র ও ফিতা। পাশেই ঠাঁই পেয়েছে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ছবি। অখুশি হয়ে বললেন তিনি, 'ক্যাপ্টেন ওয়াকার, এমআইএ-র বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ, তা ভাল করেই বুঝি। সেজন্য যে-কোনও সহায়তা দিতেও দেরি করব না। একটু আগে ফোন করেছিলেন স্টেটসের অ্যাসিস্ট্যান্ট

সেক্রেটারি। বলেছেন, যা লাগবে, যেন জোগাড় করে দিই। সেক্ষেত্রে এ বিষয়ে আরও কিছু আমার জানা উচিত নয়? আপনি খুব আবছাভাবে বলেছেন: হয়তো খেমার রুয বাহিনীর হাতে আটকা পড়েছে ক'জন আমেরিকান সৈনিক। আর সে-কারণে চলেছেন গোপন মিশনে। সম্ভব হলে উদ্ধার করবেন তাদেরকে। ব্যস, এ-ই?'

'সরি, মিস্টার অ্যাম্বাসেডার, যে পর্যায়ে আছি, আপাতত মুখ খুলতে পারব না,' বলল মারিয়া, 'কাজ করছি আন-অফিশিয়াল ক'জনের সঙ্গে। এটা খুব জরুরি যে কাজ করতে হবে গোপনে।'

'সিআইএ?'

মৃদু হাসল মারিয়া। 'তা নয়। শুধু বলব, জোরালো সূত্র পেয়ে পিছু নিয়েছি। যাদের সঙ্গে কাজ করছি, তারা অত্যন্ত যোগ্য লোক।'

'তারা কি আমেরিকান?'

মাথা নাড়ল মারিয়া। 'বলতে পারেন আন্তর্জাতিক দল। দয়া করে এর বেশি জিজ্ঞেস করবেন না। আপনি খোঁজখবর নিতে শুরু করলে বিগড়ে যাবে তারা। খুশি হতাম বিস্তারিতভাবে বলতে পারলে, কিন্তু তা এখন সম্ভব নয়। অবশ্য, আশা করি এ সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই সব বলতে পারব। আপনাকে বোধহয় জানানো হয়েছে, যেন আমাকে দেয়া হয় স্যাটালাইট ফোন আর ফ্যাক্স। আর আগামী কয়েক দিনের ভেতর দরকারী আরও কিছু জিনিস চাইতে পারি। সেক্ষেত্রে কূটনীতিক ব্যাগে করে ওগুলো এনে দেবেন নম পেন-এ।'

'কী ধরনের জিনিস?'

'এখনও জানি না, হতে পারে অস্ত্র বা কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট।'

'অস্ত্র!'

'হ্যাঁ, মিস্টার অ্যাম্বাসেডার। আমার সঙ্গীরা ঢুকে পড়বেন খেমার রুয নিয়ন্ত্রিত এলাকায়। সেক্ষেত্রে অস্ত্র লাগবে, সাদা পতাকা হাতে ওখানে গিয়ে কোনও লাভ হবে না।'

দাম্ভিক, উগ্র চেহারার দীর্ঘ লোক অ্যাণ্ডি হেণ্ডারসন, পাকা কূটনীতিক, ওই কাজ করছেন বহু বছর ধরে, এবং কখনও হারিয়ে বসেননি রসিকতাবোধ। উঠে দাঁড়িয়ে হাসলেন তিনি। 'আপনার হাতে নিজেদেরকে তুলে দিলাম, ক্যাপ্টেন। আশা করি এক বহর অ্যাব্রাম্‌স্‌ ট্যাঙ্ক বা ক্রুয মিসাইল লাগবে না?'

নিজেও পাল্টা হাসল মারিয়া। 'না, স্যর, তা লাগবে না। আমরা ছোটখাটো মানুষ, বড়জোর চাই অ্যামিউনিশন, স্মল আর্মস্‌, সিকিয়োর রেডিয়ো আর রিসিভার। আপাতত বলব: ঝটপট পাল্টে যাচ্ছে পরিস্থিতি। আশা করি সফল হব খুব দ্রুত।'

'কোথায় উঠেছেন?' জানতে চাইলেন ভদ্রলোক।

'ক্যামবোডিয়ানা হোটেলে। বলে রাখি, এম্বাসি থেকে নজর রাখলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবে আমার সিনিয়র অফিসার বা কলিগরা। সেক্ষেত্রে, মিস্টার অ্যাম্বাসেডার, সমস্ত দায় পড়বে গিয়ে আপনার ওপর। কেউ চোখ রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তা বুঝবে আমার কলিগরা।'

'তেমন কিছু করা হবে না,' বললেন হেণ্ডারসন, 'কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, ক্যাপ্টেন, এ দেশে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে কাজ করছি, সুতরাং এমন কোনও বাজে পরিস্থিতি তৈরি করবেন না, যার জন্যে বিব্রত হই।' ডেস্কে রাখা কন্সোলের বাটন টিপলেন তিনি। কয়েক সেকেণ্ড পর ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকল কমবয়সী এক যুবক। তাকে বললেন অ্যাম্বাসেডার, 'চার্লস্‌, ক্যাপ্টেন ওয়াকারকে নিয়ে যাও। তাঁর প্রয়োজনীয় সব কমিউনিকেশন ইকুইপমেণ্ট দেবে।'

হাত বাড়িয়ে অ্যাম্বাসেডারের সঙ্গে করমর্দন করল মারিয়া।

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার অ্যাম্বাসেডার।'

'ইউ আর ওয়েলকাম, ক্যাপ্টেন... খুব সাবধানে থাকবেন। চাই না আমাদের এমআইএ বাড়ুক।'

আটচল্লিশ

পাহাড়ি ঢাল থেকে মুখ তুলে ওপরের মন্দিরটা দেখছে তারা। সবার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে দায়না বেলগুতাই। বামে অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স, ডানে কুয়েন আন টু। এহেরেন্স আঙুল তাক করে দেখাচ্ছে আঁকাবাঁকা এক লাল দড়ির সরু পথ। ওটা উঠে গেছে পাহাড়ের ওপরে, মন্দিরের দেয়ালে বসানো ফটকের সামনে।

'ওই দড়ির পথ গেছে মাইনের মাঝ দিয়ে। চওড়ায় মাত্র এক গজ। বাঁক নিয়েছে তিনবার। ওই পথে যেতে হলে নির্দিষ্ট তিনটে চিহ্ন দেখে এগোতে হবে। হতে পারে দূরের কোনও গাছ, অথবা পাহাড়ের চূড়া। ওই চিহ্ন না চিনলে কোনওভাবেই মন্দির পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না কেউ।' দলের সদস্যদেরকে দেখাল এহেরেন্স। তারা আছে মন্দিরের দেয়াল থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। 'আগামীকাল সন্ধ্যায় শেষ হবে মাইনফিল্ড তৈরির কাজ। তখন আপনাকে দেখিয়ে দেব, কোন্ সব চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। আর তারপর সরিয়ে নেব দড়ির পথ।'

উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে এহেরেন্সের কাঁধ চাপড়ে দিল দায়না

বেলগুতাই। 'খুব ভাল কাজ করেছেন, এহেরেন্স। নিশ্চয়ই ওই পথ ভাল করেই চেনে আপনার দলের সবাই?'

'অবশ্যই।'

কুয়েন আন টুর দিকে ফিরে বলল দায়না, 'আমি চাই আগামীকাল রাতে ওই দলের প্রত্যেককে বাড়তি একহাজার ইউএস ডলার দেয়া হোক।'

'তাদের তরফ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ,' বলল এহেরেন্স। 'ওই টাকা ওদের মনে হবে রাজার ধন।'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাসল দায়না। 'আর সেসব উড়িয়ে দেবে মদ, জুয়া বা মেয়েমানুষের পেছনে। এদের মত লোক এভাবেই শেষ করে সব। বুড়ো হয়ে শহরে গিয়ে ভিক্ষা করে, সবাইকে বোঝাতে চায়, সারাজীবনেও কোনও অন্যায় বা দোষ করেনি। যাক গে, আপনাকে আর বেশিক্ষণ আটকে রাখব না, এহেরেন্স। আগামীকাল কুয়েন আন টুকে নিয়ে আবার ফিরছি। দেখা হবে বিকেল পাঁচটায়। আবারও বলছি, সত্যিই, জাদু দেখালেন আপনি!'

পাহাড়ি ঢাল ধরে ওপরে উঠতে লাগল এহেরেন্স, খুব সতর্ক। লাল দড়ির পথ অনুসরণ করতে ভুল হচ্ছে না। চুপচাপ কিছুক্ষণ তাকে দেখল দায়না, তারপর বলল, 'আগামীকাল শেষ মাইন পেতে দেয়ার পর আমি চাই, ওই লোকগুলোকে যেন গুলি করে মেরে ফেলা হয়।'

কোনও বিস্ময় নেই ভিয়েতনামিযের চোখে-মুখে। নিচু স্বরে বলল, 'আগেই দেব ডলার, না পরে?'

হাসল দায়না। 'সত্যি দিতে হবে কেন! মনে রাখবে, ওদেরকে মেরে ফেলার আগেই এহেরেন্সকে সরিয়ে নিতে হবে। তার কাজ এখানে শেষ। ভয় দেখিয়ে আটকে রাখবে গ্রামে। এখনও ঠিক করিনি ওকে নিয়ে কী করব।'

মাইনফিল্ডের ভেতর দিকে পৌঁছে গেছে অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স। দাঁড়িয়ে পড়ল দলের পেছনে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দেখল তাদের কাজ। ভালভাবেই ট্রেইনিং দিয়েছে এদেরকে। তবে কেউ কাজটা করতে পারে দ্রুত, কেউ খুব ধীর। এদের সেরা লোকটা প্রতি তিন মিনিটে বসাতে পারে একটা মাইন। মন্দিরের চত্বর ও বাইরের অংশ দেখল এহেরেন্স। মাইনফিল্ডের ওদিকে আন্দাজ চল্লিশ গজ দূরে প্যাগোডার গেট। হিসাব কষে নিয়ে সন্তুষ্ট হলো সে। সঠিক সময়ে তৈরি হবে মাইনফিল্ড। আজ রাতে আর ফ্লাডলাইটের আলোয় কাজ করতে হবে না। গত কয়েক রাতের কাজ ছিল খুব বিপজ্জনক। কপাল ভাল, আর ঝুঁকি নিতে হবে না। বিকেলে জিপগাড়ি নিয়ে টাক লুইয়ে যাবে, ওখান থেকে কিনবে তাজা মাছ। কনি টুরেন সত্যিই খুব ভাল রাঁধে। মনে হয়, সংসার পেলে খুব গুছিয়ে করত। হাসল। পাবে না, এমন কথাও তো বলা যায় না।

রাতে মেয়েটার সঙ্গ পাব, ভাবল এহেরেন্স। ওকে সন্তুষ্ট করার পর রাঁধতে যাবে কনি। তখন ওর ছেলেকে নিয়ে লেখাপড়া করাতে বসবে এহেরেন্স। গত ক'দিন একঘণ্টা করে বাচ্চাটাকে ইংরেজি শেখাচ্ছে সে। মাত্র তিন বছর বয়স ওর, কিন্তু মগজ ওরই মত ধারালো বলে চট্ করে শিখে নিচ্ছে অনেক কিছুই।

আনমনে হাসল এহেরেন্স। আমি... একজন শিক্ষক? বিশ্বাস করবে কোন্ শালা? আবারও আগের চিন্তা এল মনে। যথেষ্ট বয়স হয়ে গেছে। এখন আর কমবয়সী কোনও ভাল মেয়ে ওকে বিয়ে করবে না। আচ্ছা, কেমন হয় নিজের দেশে বাচ্চাটা সহ কনি টুরেনকে নিয়ে গেলে? ওরও তো সমাজ বলে কিছুই নেই। কারও সঙ্গে মিশতে হবে, এমনও নয়। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে, ওরা ওর পরিবার। ক্ষতি কী তাতে? ধর্মের লেজ ধরে মানুষ হয়নি

সে। তবুও নম পেন বা ব্যাংককের চার্চে গিয়ে কনি টুরেনকে বিয়ে করতে বাধা দেবে কে?

ক্ষতি কী?

ভাবতে হবে! আরও ভাবতে হবে!

নিজের কাজে নেমে পড়ল অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স।

ঊনপঞ্চাশ

জেটির দিকে মুখ করা নিউ ওঅর্ল্ড হোটেলে বড় একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে পিটার লারসেন ও ব্রিয়াঁ ফুলজেন্স। আগে আলাদা আলাদা সময়ে হংকং ঘুরে গেছে দু'জন। এই শহর বা বন্দরের যেখানে চোখ পড়বে, শুধু মানুষ আর মানুষ। ভিক্টোরিয়ায় স্ট্যালাগমাইটের মত আকাশে নাক তুলেছে একের পর এক বহুতল ভবন।

ব্যালকনি থেকে পরিষ্কার দেখছে লারসেন, এপার-ওপার করছে অন্তত বিশটা ফেরি। গত আধঘণ্টা ধরে এ-ই দেখছে।

ঘরে বিছানায় শুয়ে কানে ইয়ারফোন গুঁজে গান শুনছে ফুলজেন্স। কাউকে বোঝাতে পারবে না বিটোফেনের ফিফ্‌থ্ সিম্ফনি কী জিনিস।

বাইরের দৃশ্য থেকে চোখ সরিয়ে একবার হাতঘড়ি দেখল লারসেন, পরক্ষণে গলা ফাটিয়ে বলল, 'চলো! স্টার ফেরি ধরে ভিক্টোরিয়ায় যাব! কাজ আছে বিযনেস রেজিস্ট্রেশন্স অফিসে!

জানতে হবে কে চালায় দায়না ট্রেড কোম্পানি!'

চোখে আপত্তি নিয়ে বিটোফেনের মিউযিক বন্ধ করল ফুলজেন্স, উঠে দাঁড়িয়ে ঠিকঠাক করে নিল পোশাক।

এদিকে ব্রিফকেস খুলে ওটার পকেট থেকে একগাদা বিযনেস কার্ড নিল লারসেন। বেছে বের করল একটা। গম্ভীর চেহারা করে বলল, 'আজ আমি ভাইকিং ক্রেডিট অ্যাণ্ড ডেবিট রেটিং এজেন্সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর অস্কার কর্ক।'

বিশ মিনিট পর বিযনেস রেজিস্ট্রেশন্স অফিসের কাউন্টারে মাঝবয়সী এক মহিলাকে মুগ্ধ করে ফেলল লারসেন। মহিলা মনোযোগ দিয়ে দেখছে ওর কার্ড।

'আমার দরকার দায়না ট্রেড কোম্পানির রেকর্ড,' বলল লারসেন, 'কারণ ওই কোম্পানির সঙ্গে লেনদেন করতে চলেছে ডেনিশ কোম্পানি ভাইকিং ক্রেডিট অ্যাণ্ড ডেবিট রেটিং এজেন্সি।'

পেছনের এক ঘরে গিয়ে ঢুকল চাইনিজ মহিলা, পাঁচ মিনিট পর কালো রিবন দিয়ে বাঁধা সবুজ এক ফাইল হাতে ফিরে এল। লারসেনকে বলল, 'ইচ্ছে হলে ফোটোকপি নিতে পারবেন। প্রাইভেট কোম্পানি, প্রতি বছর ব্যালেন্স শিট জমা দেয় না। অবশ্য, বোর্ড অভ ডিরেক্টর বা প্রধান শেয়ারহোল্ডার বদলে গেলে নতুন করে রেকর্ড করায়।'

ফাইল হাতে পেয়ে প্রথমেই পেছনের পাতা পড়তে লাগল লারসেন। ওখানেই পেল, উনিশ শ' বাষট্টি সালে কোম্পানি চালু করেছিল মাত্র দু'জন ডিরেক্টর মিলে। তাদের একজন জন বেলগুতাই। অন্যজন টুয়েন আন টু এলডি।

লারসেন আন্দাজ করল, টুয়েন আন টু সম্ভবত কুয়েন আন টুর বাবা। এই এত বছরে কোনও পরিবর্তন আসেনি, তবে চার বছর আগে বদলে গেল এক ডিরেক্টর। জন বেলগুতাইয়ের বদলে নাম এল তার মেয়ে দায়না বেলগুতাইয়ের। অফিসের ঠিকানা দেয়া

হয়েছে ট্যাম ওঅক লাম বিল্ডিং, আইস হাউস স্ট্রিট।

ফাইল ঘুরিয়ে মহিলার দিকে রাখল লারসেন। নির্দিষ্ট জায়গায় আঙুল রেখে বলল, 'এলডি-র অর্থ কী?'

নাম দেখে নিয়ে বলল মহিলা, 'ওটার মানে টুয়েন আন টু একজন উকিল। শুধু তাই নয়, হংকঙের অত্যন্ত নামকরা উকিল। অনেক ধরনের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট দলের বড় নেতাও ছিলেন। হংকং আর ভিয়েতনামে অত্যন্ত সম্মানী মানুষ।'

'জেনে মনে শান্তি পেলাম,' ফাইল বন্ধ করে ওটা দিয়ে দিল লারসেন। 'অনেক ধন্যবাদ আপনার সাহায্যের জন্যে। না, এঁরা যখন এতই ভাল মানুষ, আর ফোটোকপি করতে হবে না।'

ব্যস্ত রাস্তায় বেরিয়ে বন্ধুর দিকে ফিরল লারসেন। 'পেঁচা, সংক্ষেপে জানতে হবে রত্ন সম্পর্কে। বিশেষ করে ইন্দো-চিন এলাকার রত্ন। চলো, খুঁজে বের করি কোনও রত্নকারকে। তারপর হয়তো গিয়ে দেখা করব মিস্টার টুয়েন আন টুর সঙ্গে। কিন্তু তার আগে কোপেনহেগেনে এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলব।' খুশি মনে হাসল লারসেন। 'সব কাজ শেষ হলে ফেরি ভ্রমণে বেরোব। তুমি কি জানো, মূল চিনের আঠারোটা জায়গায় যাওয়া যায় এসব ফেরি ধরে?'

'জানতাম না,' টিটকারির সুরে বলল পেঁচা। 'এখন বুঝতে পারছি, মস্তবড় ভুল করেছি পেটে অত বিদ্যা ভরিনি বলে।'

'তা তো বটেই,' গম্ভীর হয়ে গেল লারসেন।

জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মারগিটের জন্যে ছোট একটা নীলকান্ত মণির আংটি কিনেই ফেলল লারসেন। তাতে লাগল পাঁচ শ' ডলার। তাতে কোনও খেদও থাকল না। রত্নকারের কাছ থেকে পেয়েছে দরকারী সব তথ্য। সময় নিয়েছে লোকটার পুরো একঘণ্টা। বেচারা ভাবতেও পারেনি তার সব

পাথর দেখে, অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে বুঝে গেছে ডেইন, আসলে কত ধরনের পাথর আছে, আর সেগুলো আসে কোথা থেকে।

হোটেলে ফেরার সময় পাঁচ মিনিটের ফেরি পেরিয়ে এল ওরা। ঘরে ফিরে পুরনো এক ভাল বন্ধুর কাছে ফোন করল লারসেন। ওই লোক কাজ করে পুলিশে।

লারসেন জানতে চাইল: ডেনমার্কের সবচেয়ে খ্যাতিমান রত্ন আমদানীকারক, অথচ তাকে সন্দেহ করে পুলিশ— কে সেই লোক? এমন একজন, যে রত্ন ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে টাকা লণ্ডারিং করছে।

লারসেনের বন্ধু কথা দিল, যত দ্রুত সম্ভব তথ্যগুলো সংগ্রহ করে যোগাযোগ করবে। তাতে লাগবে বড়জোর আধঘণ্টা।

আবারও বারান্দায় এসে ফেরি গুনতে বসল লারসেন।

বিছানায় শুয়ে বিটোফেন শুনছে ফুলজেন্স।

পঞ্চাশ

আজ পর্যন্ত যত অফিসে পা রেখেছে, সেগুলো আসলে কিছুই নয়, এই অফিসে ঢুকে একেবারে চমকে গেছে লারসেন। মেঝেতে গোড়ালি দেবে যাওয়া ইরানি কার্পেট, চার দেয়ালে মেহগনি কাঠের পুরু প্যানেল, আসবাবপত্রগুলো দুনিয়ার সেরা দামি জিনিস। মস্ত ডেস্কে হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম কারুকাজ। ওই কাজ করেছে কোনও মস্ত শিল্পী। কিন্তু এত দামি ডেস্কের পেছনে যে,

তাকে দেখে মন তিক্ত হয়ে গেল লারসেনের। রীতিমত রাগ হলো স্রষ্টার ওপর। মানুষ এত সুন্দর ডেস্ক বানাতে পারে, আর তুই, ব্যাটা, এমন একটা বুড়ো ব্যাঙ বসিয়ে দিয়েছিস ওখানে!

লোকটার বয়স কমপক্ষে নব্বুই। মাথা জুড়ে মস্ত এক টাক। ঢুলু-ঢুলু চোখ, ওপরের ঠোঁট স্পর্শ করতে ঝুলে এসেছে নাক। কয়েক ভাঁজ পড়া থুতনি যেন সত্যিকারের কোনও ডাইনীর। পরনে কালো স্যুট। লারসেনের ওপর চোখ রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। হাতে কার্ড দিতেই নাকে চশমা তুলে দেখল। ওই কার্ড তৈরি করে এনেছে লারসেন একঘণ্টা আগে। তাতে লেখা: ডেনমার্কের ওয়াইসিস ইমপোর্ট কোম্পানি থেকে এসেছে জেন্স ডগলারসেন।

www.boighar.com

এতে যথেষ্ট সম্মানও পেল লারসেন। ওকে বসতে ইশারা করল বুড়ো, শুঁটকি ব্যাঙ। আর তখনই কোত্থেকে এসে জেসমিন চায়ের পট আর দুটো কাপ দিয়ে গেল এক সুন্দরী চাইনিজ মেয়ে।

নিজের ব্যবসা সম্পর্কে দু'চার কথা বলল লারসেন। তখন চায়ে চুমুক দিতে দিতে সাপের মত শীতল চোখে ওকে দেখল টুয়েন আন টু। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমার কাছে এসেছেন কেন, মিস্টার ডগলারসেন? আপনি চাইলে সরাসরি দায়না ট্রেড কোম্পানির ম্যানেজার ফন ক্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন।'

'দুটো কারণে এসেছি,' বলল লারসেন, 'প্রথম কারণ, সত্যিকারের ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ করাই ভাল, সামান্য বাঁদরের সঙ্গে নয়। আর দ্বিতীয় কারণ, আমি উকিলদের সঙ্গে আলাপ করে বেশি স্বস্তি পাই।'

মৃদু মাথা দুলিয়ে হাসল টুয়েন আন টু। 'কিন্তু আপনি জানলেন কীভাবে যে দায়না ট্রেড কোম্পানির সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে?'

‘সবসময় আগে কোম্পানির ডিরেক্টরদের বিষয়ে খোঁজ নিই। বুঝে নিই তারা উপযুক্ত কি না। সকালে গেছি বিযনেস রেজিস্ট্রেশন্স অফিসে। তখনই জানলাম আপনি দুই ডিরেক্টরের একজন। অন্যজন দায়না বেলগুতাই। কোম্পানিতে তার আছে আশি ভাগ শেয়ার। আপনার বিশ ভাগ।’

‘কথা ঠিক। জন বেলগুতাইয়ের সঙ্গে মিলে কোম্পানি শুরু করি। দায়নার বাবা মারা যাওয়ার পর ও পেয়েছে তার সব শেয়ার আর ডিরেক্টরশিপ।’

‘চার বছর আগে, তাই না?’

‘হ্যাঁ। সে-সময়ে মারা গেলেন ওর বাবা।’

‘জরুরি কথায় আসি, মিস্টার আন টু, এবার হংকঙে এসেছি বড় সংক্ষিপ্ত সময় নিয়ে। জানি, আপনি অত্যন্ত সম্মানিত মানুষ হংকঙে। কিন্তু মিস বেলগুতাই সম্পর্কে তেমন কোনও তথ্য আমার হাতে নেই। অথচ ব্যবসা করতে হলে তথ্য জরুরি। যা হোক, মূল কথা হচ্ছে, ক্যামবোডিয়ান স্যাফায়ার কিনতে আগ্রহী আমি। গত কয়েক বছর অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে ওই পাথরের সরবরাহ।’

সায় দিয়ে মাথা নাড়ল বৃদ্ধ উকিল। ‘নিশ্চয়ই এ থেকে বুঝতে পারছেন, কোথায় আমাদের কোম্পানির শক্তি? এই মন্দার ভেতরেও সরবরাহ করতে পারব। হয়তো জানেন, বেশিরভাগ স্যাফায়ার আসে কার্ডামম পর্বত থেকে। আর সে এলাকা আপাতত নিয়ন্ত্রণ করছে নতুন করে জড় হওয়া সেই খেমার রুয বাহিনী। জন বেলগুতাইয়ের স্ত্রী ছিলেন ক্যামবোডিয়ার মেয়ে, আর সেই কারণে ওই এলাকার অনেকের সঙ্গেই ভাল সম্পর্ক আছে দায়নার। আসলে সেসব লোকই দখল করে রেখেছে কার্ডামম পাহাড়ি এলাকা।’

‘আপনি বলতে চাইছেন এরা খেমার রুয?’

'না, ঠিক তা নয়,' নাক দুলিয়ে হাসল বুড়ো ব্যাঙ। 'দায়না বেশিরভাগ সময় কাটায় প্যারিস, নিউ ইয়র্ক বা ব্যাংককে, কিন্তু ওর কানেকশনের কারণে যা চায়, তা-ই পায়। ওকে ক্যামবোডিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার সম্রাজ্ঞীও বলতে পারেন। আর ওর কারণেই দায়না ট্রেড কোম্পানি নিয়মিত পেয়ে আসছে টপ কোয়ালিটির স্যাফায়ার। এ নিয়ে আর ভাবতে হয়নি আমাদেরকে। আপনাকেও ভাবতে হবে না, যোগাযোগ করুন ম্যানেজার ফন ক্যানের সঙ্গে। প্রচুর পরিমাণে পাথর দেখাতে পারবে সে। আপনি চাইলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিতে পারি।'

'এখনই নয়,' বলল লারসেন, 'প্রথমে অর্থনৈতিক দিক নিয়ে আলাপ করতে চাই আপনার সঙ্গে।'

সতর্ক হয়ে গেল বুড়ো। 'ফাইন্যানশিয়াল ম্যাটার?'

'হ্যাঁ। মিস্টার আন টু, আপনি তো জানেন, ডেনমার্কে ইমপোর্ট ডিউটির ওপর অনেক বেশি ট্যাক্স ধরা হয়। আমার কোম্পানি চাইছে, কয়েক বছর ধরে স্যাফায়ারের বড় কিছু চালান নেবে। ধরে নিতে পারি, এ ধরনের ব্যবসার ঘাই-ঘাপলা আপনি ভাল করেই জানেন।'

'তা জানি।'

'আমরা চাই আপনার কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করতে, যাতে পাথরের দাম অনেক কম বলে দেখানো হয়।'

'বুঝেছি, মিস্টার ডগলারসেন। প্রায়ই এমন করা হয়। আর কাজটা করা হংকঙে তেমন কঠিনও নয়।'

'ঠিক,' বারকয়েক মাথা দোলাল লারসেন। 'এ কথাই বলতে চাইছি। শিপমেণ্টের জন্যে আগে যা-টাকা দেব, তা সামান্য অংশ। বাকি টাকা দেয়া হবে সুইস ব্যাঙ্কের মাধ্যমে।'

'মোটেও আপত্তিকর নয়।' ঠোঁটে ষড়যন্ত্রের হাসি নিয়ে মাথা দোলাল ব্যাঙ। 'চুক্তি হলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব আমরা।

আপনি কবে দেখতে চান ফন ক্যানের কালেকশন?'

'আগামী কয়েক দিনের ভেতর নয়। মাত্র পৌঁছেছি হংকঙে। জেট ল্যাগের কারণে রীতিমত অসুস্থ লাগছে। এই মুহূর্তে কঠিন হিসাব-নিকাশ বা দরদামের জন্যে তৈরি নই। দু'চার দিন বিশ্রাম নেব, তারপর বসব ব্যবসা নিয়ে। আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল টুয়েন আন টু। খুশি মনে বলল, 'আপনি বাস্তব জগতের মানুষ, মিস্টার ডগলারসেন। বিশ্রাম নেয়া শেষ হলে আশা করি যোগাযোগ করবেন দায়না ট্রেড কোম্পানির ম্যানেজার ফন ক্যানের সঙ্গে। আর এর ভেতর তার সঙ্গে আলাপ সেরে রাখব আমি। আশা করি সামনে দীর্ঘ দিন ধরে প্রচুর মুনাফা করব আমরা দু'পক্ষ।'

'কী হবে ওই বুড়ো শালা ভাম ডেনমার্কের ওয়াইসিস ইমপোর্ট কোম্পানিতে খোঁজ নিলে?' জানতে চাইল ফুলজেন্স, চিন্তায় পড়ে গেছে।

ওরা বসে আছে ম্যাণ্ডারিন হোটেলের ক্যাপ্টেন্স বার-এ। একটু দূরের মোড়েই বৃদ্ধ উকিলের অফিস।

'অসুবিধে নেই,' বলল লারসেন, 'এরই ভেতর ওয়াইসিস ইমপোর্ট কোম্পানির ক'জনের হাত মুচড়ে রেখেছে আমার ওই পুলিশ বন্ধু। তারা যদি বুড়োর কাছ থেকে ই-মেইল বা ফ্যাক্স পায়, দেরি না করে বলে দেবে, কোম্পানির বর্তনান পার্চেযিং ডিরেক্টর জেন্স ডগলারসেন। আপাতত তিনি ব্যবসার কাজে গেছেন ফার ইস্টে।' সন্তুষ্ট হয়ে কার্লসবার্গ বিয়ারে চুমুক দিল লারসেন। ভিড়ে ভরা বার-এ চোখ বুলিয়ে বিড়বিড় করল, 'জন বেলগুতাইয়ের যুবতী মেয়ে দায়না চাইছে রানাকে ফাঁদে ফেলতে।'

একান্ন

লারসেনের কথা শুনে রানা বলল, 'দারুণ দেখালে, পিটার। আরেকটা কাজ করবে? ব্যাংককে গিয়ে খুঁড়ে দেখবে ওর ব্যাপারে আরও কোনও তথ্য পাও কি না? এদিকে আমেরিকান এম্বাসির মাধ্যমে খোঁজ নেবে মারিয়া। দেখা যাক কিছু বেরোয় কি না।'

ফোন রেখে মারিয়া ও রেমারিকের দিকে ফিরল রানা। 'এক ক্যামবোডিয়ান মহিলার গর্ভে জন বেলগুতাইয়ের মেয়ে আছে, নাম দায়না বেলগুতাই। বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ। খেমার রুযের সঙ্গে জড়িত। ব্যাংকক, নিউ ইয়র্ক আর প্যারিসে সময় কাটায়। আবার কখনও থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম ক্যামবোডিয়ায়। আজ বিকেলে ব্যাংককের উদ্দেশে রওনা হবে পিটার আর ব্রিয়াঁ। সম্ভব হলে আরও তথ্য জোগাড় করবে ওই মেয়ে সম্পর্কে। এদিকে, মারিয়া, তুমি আবারও কথা বলো অ্যাম্বাসেডারের সঙ্গে। হয়তো ওই মেয়ের ওপর ফাইল আছে সিআইএর হাতে। আর তা না থাকলেও, পাওয়া যাবে ক্যামবোডিয়ার ওদিকের স্যাটালাইট সার্ভেইল্যান্স ফোটো। ওগুলো দরকার। ওই প্যাগোডার কাছে যাওয়ার আগে বুঝে নিতে হবে চারপাশ কেমন। আমি তোমাকে মানচিত্রের গ্রিড রেফারেন্স দেব।'

ল্যাণ্ড ফোন ব্যবহার করে এম্বাসিতে কল দিল মারিয়া। ওর তাড়া দেখে ওদিক থেকে বলা হলো, বিশ মিনিট পর মিটিঙের জন্য সময় দিতে পারবেন অ্যাম্বাসেডার।

মারিয়া রওনা হয়ে যাওয়ার পর রেমারিক বলল, 'বোঝা গেল, পুরো ব্যাপারটা প্রতিশোধের। সেজন্যে অনেক সময় নিয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে জাল ফেলেছে। যেভাবেই হোক, মেয়েটা ভাল করেই জানে, তার বাবা মারা পড়েছে তোমার হাতে। সহজ কোনও পথে তোমাকে খুন করতে চাইবে না। বুদ্ধিমানের কাজ হবে এখন বিনা বাক্য ব্যয়ে লেজ তুলে ভাগা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ভাল করেই জানো, পিছিয়ে যাব না। আর তা করলেও রক্ষা ছিল না, মস্ত ফাঁদ পেতেছে ক্যামবোডিয়া থেকে শুরু করে স্যান ডিয়েগো পর্যন্ত। খরচ করেছে লাখ লাখ টাকা। ক্ষমতারও অভাব নেই। সরে যেতে চাইলেও খুঁজে বের করবে। ব্যাপারটা আসলে এমন: হয় সে বাঁচবে, নইলে আমি। খুন করতে চাইলেও মনে হয় মেরে ফেলার আগে কথা বলতে চাইবে। চোখে চোখ রেখে বুঝিয়ে দেবে, কেন খুন করা হচ্ছে আমাকে। আসলে আমার কোনও উপায় নেই, এগোতে হবে চতুর ওই মেয়ের তৈরি করা পথ ধরেই। ওই মেয়ে যদি বাপের এক শ' ভাগের এক ভাগ খারাপও হয়, ওকে খুন করতে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হবে না আমার।'

ভাল করেই রানাকে চেনে রেমারিক, আস্তে করে মাথা দোলাল। 'ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে সিম আর জ্যাকে ডেকে আনছি। যদি খেমার রুয এলাকায় যেতে হয়, ফায়ার পাওয়ার দরকার হবে তোমার। একা তুমি যথেষ্ট নও। তা ছাড়া, ওদিকের সব ইনফর্মেশন দরকার। শুধু সিআইএর স্যাটালাইট ফোটো দিয়ে কাজ হবে না। ওদের ফোটো হবে রুটিন সার্ভেইল্যান্স। অথচ, ওদিকে আছে ঘন সব জঙ্গল ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকা।' ফোনের দিকে ইঙ্গিত করল রেমারিক। 'আমার মনে হয় সিনেটর ফ্রান্সিস জেফ্রির সঙ্গেও কথা বলা উচিত। মারিয়াকে সাহায্য করবে অ্যাম্বাসেডার, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু চাই তোমার।' হঠাৎ

মুচকি হেসে ফেলল রেমারিক। 'একেবারে আগের সেই সময়ের মত, কী বলো, রানা? মনে হচ্ছে অন্তত পাঁচ বছর কমে গেছে আমার বয়স।'

বায়ান্ন

'কারণটা জানতে চেয়ো না,' কো-পাইলটকে বললেন কর্নেল এলউড ম্যাটসন। 'দেরি না করে আকাশে উঠতে হবে। নির্দেশ এসেছে অনেক ওপর থেকে। এ-ওয়ান প্রায়োরিটি। ম্যানিলা পেরিয়ে ভঙ্গি নেব চলেছি সিভিলিয়ান এয়ারক্রাফটের মত ব্যাংককে। কিন্তু তখন সামান্য সরে ক্যামবোডিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার বিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে যাব, কমপিউটারের ক্যামেরা আগেই নির্ধারিত কো-অর্ডিনেট অনুযায়ী ছবি তুলবে। তারপর থাইল্যাণ্ডের বেসে নামার আগেই ওসব ছবি পাঠাতে হবে গোপন কারও হাতে। কেন যেন দক্ষিণ-পুব এশিয়ার ওদিকে চোখ পড়েছে কারও। এসো, সব চেক সেরে নিই। ইঞ্জিন চালু করো। ট্যাক্সি ক্লিয়ারেন্স নাও।'

পাঁচ মিনিট পর ইউএস এয়ার ফোর্সের প্রশান্ত সাগরীয় দ্বীপ গুয়াম থেকে আকাশে ভেসে উঠল অ্যাওয়্যাক্স সার্ভেইল্যান্স বিমান, পিঠে কুঁজের মত মস্ত রেইডার ডোম। যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে চোদ্দজন ক্রু। বিমানের মেঝে সমতল হলো বেয়াল্লিশ হাজার ফুট ওপরে। কমপিউটারের কাছে সব বুঝিয়ে দিয়ে হেলান দিয়ে সিটে বসলেন কর্নেল এলউড ম্যাটসন আর কো-পাইলট।

আগামী পাঁচ ঘণ্টা একটু পর পর কফি পান করবেন তাঁরা। আর কোনও কাজ নেই।

'এই মিশন কীসের, বুঝলাম না, স্যর,' বলল কো-পাইলট।

'কে জানে! হয়তো অফিসের দেয়ালে সুন্দর ছবি চাইছে কোনও জেনারেল।' কমপিউটার মনিটর দেখে নিলেন কর্নেল। 'ম্যানিলা বিকন পাব একঘণ্টা পর। চুপচাপ বসে থাকবে, না ব্রিজ খেলবে?'

হাসল লেফটেন্যান্ট। সবিনয়ে বলল, 'খেলব না, স্যর।'

'কেন? তুমি তো ভাল খেল।'

'তা ঠিক, স্যর, কিন্তু কেন যেন আপনার সঙ্গে কখনও জিততে পারি না।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন কর্নেল। ধমক দিলেন, 'অ্যাই, ছেলে! তুমি কি বলতে চাও আমি চুরি করি?'

'না, স্যর। আপনি সত্যিকারের আর্টিস্ট!'

তেপ্পান্ন

মাইনফিল্ডের সব কাজ শেষ হওয়ায় গর্ব বোধ করল অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স। তার প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করছে দলের অন্যরা। কিছুক্ষণ পর মাইনফিল্ড বা মৃত্যু-ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। একটু দূরে অপেক্ষা করছে ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা ট্রাক। ওটার দিকে চলেছে তারা। ট্রাকের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এক খেমার রুয অফিসার। এহেরেন্সদের দিকে আঙুল তাক করে চিৎকার

করল সে। অর্থ বুঝল না এহেরেন্স। তবে তার দলের অন্যরা অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল লাইনে। এবার একপাশে সরে গেল খেমার রুয অফিসার, হাতের ইশারা করে কাছে ডাকল এহেরেন্সকে।

লোকটার মুখোমুখি হলো এহেরেন্স, বিস্মিত। তার মনে হলো, এবার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেবে অফিসার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মস্ত ঝুঁকির ভেতর দিয়ে গেছে ওরা। যে-কোনও সময়ে মরতে পারত। আগে কখনও এত ঘনভাবে মাইন পেতে ফাঁদ তৈরি করেনি কেউ।

ঘুরে চেয়ে চিৎকার করল লোকটা। ঝপাৎ করে খসে পড়ল ট্রাকের পেছনের ক্যানভাস। ওখানে দেখা গেল মেশিন্‌গানের নল। আর তখনই ওই নল থেকে ছিটকে বেরোল কমলা আগুন। চারপাশ ভরে উঠল গুলির আওয়াজে। হতবাক এহেরেন্স দেখল, কচুকাটা হচ্ছে ওর দলের লোকগুলো! পাথরের মূর্তি হয়ে গেল সে। চোখের সামনে দেখল, করুণ চিৎকার তুলে দু'টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ছে দলের লোকগুলো! তাদের একজন মাটিতে পড়ে গিয়েও হামাগুড়ি দিয়ে সরে যেতে চাইল। কিন্তু চলেছে ভুল দিকে। মাইনফিল্ডের বাইরের দিকের একটা মাইন আকাশে ছুঁড়ে দিল তার ছিন্নভিন্ন দেহ।

ঘুরেই খেমার রুয অফিসারের গলা টিপে ধরতে চাইল এহেরেন্স। কিন্তু অফিসারের হাতে পিস্তল। ওটা তাক করেছে সে এহেরেন্সের কপালে। সহজ সুরে বলল, 'এটা জরুরি ছিল।'

চুয়ান্ন

সুদর্শন যুবক, তার কাজে দক্ষ। মারিয়ার সঙ্গে আমেরিকান এম্বাসি থেকে রানার বাংলোয় এসেছে দশ মিনিট আগে। টেবিলে বিছিয়ে দিয়েছে ছবি। পরনে তার কালো স্যুট, সাধারণ টাই ও গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা শার্ট। নীরবে বুঝিয়ে দিচ্ছে, কাজ করে সিআইএতে।

'আপনাদের কমপক্ষে এক ব্যাটালিয়ন সোলজার লাগবে,' নিশ্চিত ভঙ্গিতে মন্তব্য করল। 'সঙ্গে ট্যাঙ্ক ও ভারী আর্টিলারি।' একটা ছবি দেখাল সে। 'ওই এলাকায় আছে কমপক্ষে পাঁচ শ' খেমার রুয সৈনিক। প্যাগোডার বিশ মাইলের ভেতর রয়েছে কমপক্ষে এক হাজার সৈনিক। সরকারী বাহিনী এখনও ঠিক করেনি কবে হামলা করবে।' আরেকটা ছবি দেখাল। 'ওটা টাক লুইয়ে শহর। ছোট। এলাকার খেমার রুয হেডকোয়ার্টার ওখানেই।'

চুপচাপ শুনছে রানা, কিন্তু পুরো মনোযোগ যুবকের প্রতি নেই। রেমারিক আর ও দেখছে ছবি। এসব ছবির কিছু দু'মাস আগের। অন্যগুলো কয়েক ঘণ্টা আগে তোলা হয়েছে অ্যাওয়্যাক্স বিমান থেকে। ছবির মান অত্যন্ত ভাল। তার ওপর সিআইএর যুবক সঙ্গে এনেছে অদ্ভুত একটা ডিভাইস। ওটার মাধ্যমে যে-কোনও ছবিকে তৃতীয়-মাত্রায় দেখা যাচ্ছে। চট্ করে বোঝা যাচ্ছে দালান, ভেহিকেল বা মানুষ।

প্যাগোডা দৈর্ঘ্যে নব্বুই ফুট, প্রস্থে চুয়ান্ন ফুট। এখনও চকচক

করছে নতুনের মত। চারদিক দিয়ে ওটাকে ঘিরে রেখেছে উঁচু দেয়াল। ফটক মাত্র একটা। দেয়ালের ভেতরের দিকে পাহারা দিচ্ছে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী। কিছু ছবি তোলা হয়েছে হিট-ইমেজিং ফিল্ম ব্যবহার করে। সেখানে অন্য রঙের কেলাইডোস্কোপ।

সিআইএ এজেন্ট বলল, 'আলাদা গাছ বা ঝোপ দেখাচ্ছে। কখনও আলাদা ধরনের মাটি বা খনিজ পদার্থ।' একটা ছবির দিকে আঙুল তাক করল। 'ওই এলাকার ছবি তোলা হয়েছে দু'মাস আগে স্যাটালাইটের মাধ্যমে। গাঢ় লালচে রং দেখাচ্ছে জঙ্গল। হালকা লাল ঘাসজমি। ফ্যাকাসে লাল হচ্ছে ধান খেত। এখানে আরেকটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার।' ছবিটা তুলে রানার সামনে রাখল সে। 'আজ এই ছবি তোলা হয়েছে অ্যাওয়্যাক্স বিমান থেকে। দেরি না করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ওয়াশিংটনে আমাদের এক্সপার্টের কাছে। তিনি অ্যানালাইয করেছেন।' ছবির ওপর টোকা দিল। 'এটা আপনার প্যাগোডা।' আরেকটা ছবি রাখল পাশে। 'আর দু'মাস আগে স্যাটালাইট থেকে তোলা ছবি এটা। এবার পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন?'

দুই ছবির ভেতর অমিল আছে। অ্যাওয়্যাক্স বিমান থেকে তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, প্যাগোডার চারপাশের এলাকা ধূসর। আগের ছবিতে এমন ছিল না।

'রং বদলে গেল কেন?' জানতে চাইল রানা।

মনে হলো এই মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছিল সিআইএর লোকটা। নাটকীয়ভাবে কিছুক্ষণ বিরতি নিল সে, তারপর বলল, 'আমাদের ল্যাংলির এক্সপার্ট বলেছেন, ওটা মাইনফিল্ড। শুধু তাই নয়, অত্যন্ত ব্যতিক্রমী মাইনফিল্ড। ক্যামবোডিয়ায় হাজার হাজার মাইনফিল্ড তৈরি করেছিল খেমার রুয, আন্দাজ করা হয় এসব মাইন সংখ্যায় পঞ্চাশ লাখ। এসব মাইনফিল্ড কখনও স্যাটালাইটের ছবির মাধ্যমে বা এরিয়াল ফোটোতে দেখা যায়নি।

কিন্তু বিশেষ এই মাইনফিল্ড এতই ঘনভাবে আর দক্ষতার সঙ্গে পুঁতে দেয়া হয়েছে, এমন কখনও দেখা যায়নি।'

'হয়তো আমাদের এমআইএদের ব্যবহার করেই...' চুপ হয়ে গেল মারিয়া।

'অসম্ভব নয়,' বলল রানা, 'জর্জ হার্টিগান অর্ডিন্যান্স স্পেশালিস্ট ছিল। খুব দক্ষ নয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে হয়তো শিখতে বাধ্য হয়েছে কাজ।'

'হতে পারে,' বলল রেমারিক, 'তবে একটা কথা বারবার ঘুরে ঘুরে আসছে মনে। ভ্যান ট্রং ট্রি বলেছিল, ওই শ্বেতাঙ্গ লোকটাকে ডাচম্যান বলে ডাকছিল তারা। সত্যি যদি ডাচ লোক হয়, কী করছে সে খেমার রুয বাহিনীর ভেতর?'

'হয়তো মার্সেনারি,' বলল রানা। 'গত কয়েক বছর ধরে মার্সেনারির কাজ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ...ডাচম্যান...' বিড়বিড় করল ও। পরক্ষণে ঝট করে মুখ তুলে রেমারিককে দেখল। 'ডাচম্যান! ওই লোক হয়তো আফ্রিকানার, ডাচম্যান নামে ডেকেছে সবাই। নেদারল্যাণ্ডে মার্সেনারি নেই বললেই চলে। কিন্তু নামকরা বেশ কয়েকজন আফ্রিকানার মার্সেনারি আছে।'

মাথা দোলাল রেমারিক। আঙুলের কড়া গুনছে। 'রেনে বোক, জোয়ে ডি বিয়ার, পিয়েট জেফারফেল্ড, অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স। যা শুনেছি, ওরা এখনও কাজ করছে।'

রানার দিকে তাকাল মারিয়া। 'তোমার ব্যাপারে তথ্য পাওয়ার জন্যে আমার বস্ যা করেছেন, তা করলে কেমন হয়? আমরা যোগাযোগ করব প্যারিসে ইন্টারপোলে। সক্রিয় মার্সেনারিদের ওপর ফাইল রেখেছে তারা। এ থেকে কিছু বেরিয়েও আসতে পারে।' রেমারিকের দিকে ফিরল মারিয়া। 'ভিটেলা, আপনি ডাচ বা আফ্রিকানার মার্সেনারিদের নাম লিখে ফেলুন। ওই একই কাজ করুক রানা।' সিআইএ এজেন্টকে বলল

মারিয়া, 'এরপর এম্বাসি থেকে সিআইএ রেসিডেন্ট সিনিয়র মিলিটারি অ্যাটাশে মিস্টার হেনরি গেট্স্ ফ্যাক্স করতে পারবেন ইন্টারপোলে। এমআইএ ডিপার্টমেন্টের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, ওরা জবাব পাঠাবে চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর।'

রেমারিকের দিকে চেয়ে মাথা দোলাল রানা।

কাগজে নাম লিখতে শুরু করেছে ইতালিয়ান মার্সেনারি। আবারও মাইনফিল্ডের ছবির দিকে তাকাল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'হতে পারে, ওই মেয়ে আশা করছে প্যাগোডায় হামলা করব আমি। তাই পেতে রেখেছে মাইন।' সিআইএ এজেন্টের দিকে তাকাল। 'ওই এলাকায় আপনাদের কোনও এজেন্ট আছে?'

'না।'

'ক্যামবোডিয়ান আর্মির চর আছে?'

'থেকে থাকলেও আমাদের জানাবে না। আর তাদের তথ্য ঠিক হবে, এমন সম্ভাবনাও খুব কম। ওই প্যাগোডা থেকে দেড় শ' মাইল দূরে ব্যাটামব্যাং-এ একজন এজেন্ট আছে আমাদের। এক থাই ব্যবসায়ী। তবে কোনও কাজে আসবে বলে মনে হয় না। প্রতিমাসে চেকের টাকা তুলে নিচ্ছে, বদলে আমরা পাচ্ছি স্থানীয় খবরের কাগজের সাধারণ সব তথ্য। ওই লোক বোধহয় খেমার রুযের কাছ থেকেও পয়সা খায়।'

টেবিল থেকে সরে গিয়ে কাপে কফি ঢালল মারিয়া। কাঁধের ওপর দিয়ে বলল, 'মিস্টার গেট্স্ কতজন এজেন্ট জড় করতে পারবেন?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল সিআইএ এজেন্ট। 'দুঃখিত, মিস ওয়াকার। ওই প্রশ্নের জবাব দেব না, ক্লাসিফায়েড ইনফর্মেশন।'

এসে যুবকের হাতে কফির কাপ দিল মারিয়া। ঠোঁটে মিষ্টি হাসি। 'মিস্টার চার্লস মাইল্স্, আমি ওয়াশিংটনে ফোন করলেই আনক্লাসিফায়েড হবে ওই তথ্য। মনে রাখবেন, ওই এলাকায়

থাকতে পারে তিনজন এমআইএ। আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন সব সহায়তা দেন। এখন যদি আমাকে ফোন করতে হয় ওয়াশিংটনে, আলাপের ভেতর বাধ্য হয়েই জানাতে হবে, মিস্টার মাইল্‌স্‌ যথেষ্ট সহায়তা করছেন না।' রানা ও রেমারিককে দেখাল মারিয়া। 'গত কয়েক দিন ধরে এঁরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন আমাদের ডিপার্টমেণ্টকে সাহায্য করতে। বা বলতে পারেন, তাঁরা খুঁজে বের করতে চাইছেন এমআইএকে। আপনি থাকবেন আপনার আরামদায়ক অফিসে, আয়েস করে নিতম্ব রাখবেন গদিমোড়া চেয়ারে, আর এদিকে আগামী দু'এক দিনের ভেতর জীবনের ঝুঁকি আবারও নেবেন তাঁরা, বোঝাতে পেরেছি?'

সিআইএ এজেন্টের চোখে নিষ্পলক চোখ রেখে কথাগুলো বলেছে মারিয়া। এবার খুব শীতল সুরে জিজ্ঞেস করল, 'বলুন, এ দেশে কতজন সিআইএ এজেন্ট আছে?'

এবার দেরি না করে আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল চার্লস মাইল্‌স্‌, 'আমাকে নিয়ে চার আমেরিকান, অন্য ছয়জন ক্যামবোডিয়ান।'

পিছিয়ে গেল মারিয়া, রানার দিকে চেয়ে বলল, 'চাইলে অথোরাইযেশন জোগাড় করে এদেরকে ব্যবহার করতে পারবে আমার ডিপার্টমেণ্ট। মিস্টার মাইল্‌স্‌ সহ।'

রেমারিকের দিকে চেয়ে মৃদু হাসল রানা, রেমারিকও হাসছে। সিআইএ এজেন্টকে বলল রানা, 'কিছু মনে করবেন না, মিস্টার মাইল্‌স্‌, আপনারা যদি এক কোম্পানি রেঞ্জার দিতেন, সেক্ষেত্রেও তাদেরকে সঙ্গে নিতাম না। আপনাদের সৈনিক সঙ্গে নিয়ে যাওয়া মানে আরেকটা মোগাদিশু দৃশ্য তৈরি করা।'

আবার কফি টেবিলের কাছে গেল মারিয়া, রানা ও রেমারিকের জন্যে ট্রেতে করে নিয়ে এল কফির কাপ। মাইল্‌স্‌কে বলল, 'ওরা অন্য কৌশলে কাজ করে, মিস্টার মাইল্‌স্‌। মূল বিষয়, এখানে ফায়ার পাওয়ার নয়। ওরা যে ধরনের অপারেশনে

অভ্যস্ত, তা আমার জানা নেই। আর মুখে বললেও বুঝব না। আসলে আপনার জন্যে ওদের কৌশল ক্লাসিফায়েড।'

বিরক্ত-বিব্রত বোধ করছে যুবক এজেন্ট। রানার দিকে তাকাল সে। 'তার মানে আমি সামান্য বার্তাবাহক, মিস্টার রানা? গত এগারো মাস ধরে এ দেশে আছি, কিন্তু আপনি এসেছেন বড়জোর এক সপ্তাহ আগে। তা-ও ধারণা করছেন আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন। আপনার যথেষ্ট শ্রদ্ধাও নেই আমেরিকান ফোর্স সম্বন্ধে। আপনি আসলে অপমান করছেন আমাদেরকে। অথচ, আমরা চেষ্টা করছি আপনাদেরকে সহায়তা দিতে।'

'কাজটা কিন্তু আপনাদের, আমার বা আমার বন্ধুদের নয়,' সহজ সুরে বলল রানা। 'হ্যাঁ, সাহায্য করতে চাইছেন। আর তা কেন, তা-ও বুঝতে পারছি। কিছু মনে করবেন না, আপনাদের সেনাবাহিনীর বড় সমস্যা হচ্ছে, ওরা অনেক বেশি ঝুঁকে গেছে টেকনোলজির দিকে। নিজের জান বাঁচাতে আকাশ থেকে বোমা মেরে সাধারণ মানুষকে পিঁপড়ের মত খুন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলাফল কখনও ভাল হবে না। যাক, আপনাদের ফোর্স নিয়ে ওই প্যাগোডায় হামলা করলে উল্টে মরব আমরা। ...আপনি কখনও যুদ্ধে গেছেন, মাইল্স্?'

'না।'

'কখনও মানুষ খুন করেছেন?'

'না।'

'আপনার বয়স কত?'

'আগামীকাল সাতাশ হবে।'

'হ্যাপি বার্থডে, মাইল্স্! আমি যে ছেলেকে খুঁজছি, তার বয়স পঁচিশ। হারিয়ে গিয়েছিল ভিয়েতনাম আর ক্যামবোডিয়ার সীমান্তের জঙ্গলে। ভাল সৈনিক। দেশপ্রেমিক। কিন্তু ওর উচিত ছিল অন্য কোনও পেশায় যাওয়া। হয়তো এখনও বেঁচে আছে।

ক্রীতদাস হিসেবে আটকে রাখা হয়েছে। আর তাকে ছুটিয়ে আনতে আপনারা সাহায্য করছেন আমাদেরকে।' ছবির দিক দেখাল রানা। 'আপনাদের টেকনোলজি সাহায্য করছে। কিন্তু চাইব না আপনি বা আমেরিকান ফোর্স এই অপারেশনে যোগ দিন। এ কাজ করব আমি আমার চেনা বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে। সেজন্য আমাদের লাগবে নকল পাসপোর্ট আর অন্যান্য কাগজপত্র। দরকার পড়বে অস্ত্র। আগামী বাহাত্তর ঘণ্টার ভেতর ওই এলাকায় ঢুকব আমরা। আপনার কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি লিয়াসোঁ রাখবেন মারিয়া আর আমাদের ভেতর। আপনার কাজ বেস কমাণ্ডারের মত। আর এ কারণে মস্ত বিপদে পড়তে পারেন। যদিও কাজ করবেন এম্বাসিতে বসে কূটনৈতিক নিরাপত্তার ভেতর।' এবার একটু কঠোর হলো রানার কণ্ঠ: 'কূটনীতিক হলেও মগজে বুলেট ঢুকলে নিরাপদে থাকা যায় না। আপনি কি সশস্ত্র?'

'না, স্যর।'

'তো এম্বাসিতে গিয়ে অস্ত্র জোগাড় করুন। এই অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অস্ত্র ছাড়া কোথাও যাবেন না। আশা করি স্মল আর্মস্-এর ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন?'

'জী।'

'আপনার দায়িত্ব হবে মারিয়াকে নিরাপত্তা দেয়া।'

'বেশ।'

'এটা কি জরুরি?' জানতে চাইল মারিয়া।

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'হ্যাঁ, জরুরি। এ শহরে নিজ লোক রেখেছে দায়না বেলগুতাই। আমি যখন আক্রমণ করব, উল্টো হামলা করতে পারে তোমাদের ওপর।' আবারও প্যাগোডার ছবি দেখল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর তাকাল রেমারিকের দিকে। 'আমার একটা প্যারাশ্যুট দরকার।'

নড করল রেমারিক। 'দু'জনের দুটো লাগবে।'

'না,' বলল রানা। 'আমি একা যাব। পরে দরকার পড়লে অন্যদের নিয়ে আসবে তুমি।'

www.boighar.com

পঞ্চান্ন

'আরও বাড়তি কিছু চাই?' আদরের সুরে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'যেমন?' জানতে চাইল লারসেন।

খিলখিল করে হাসল মেয়েটা। 'আমি নানানভাবে তোমাকে খুশি করতে পারি। তবে সেজন্য চাই বাড়তি দু' শ' ডলার।'

কোপেনহেগেনের ছোট্ট বাড়িটা মনে পড়ল লারসেনের, ওখানে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে মারগিট ও মিশেল। গত একঘণ্টা ধরে ব্যাংককের ডুসিট থানি হোটেলের ডাবল বেড-এ শুয়ে ম্যাসাজ নিচ্ছে লারসেন। সংক্ষিপ্ত পোশাক পরা তরুণী মেয়েটা টিপে দিয়েছে সারাশরীর। হংকং থেকে বিমানে করে আসার ফলে আড়ষ্ট হয়ে ছিল মাংসপেশি, তা শিথিল হয়েছে। পাশের ঘরে ম্যাসাজ করিয়ে নিচ্ছে পেঁচা।

'বললে বলে ধন্যবাদ,' বলল লারসেন, 'কিন্তু আমি বিবাহিত লোক।'

ওর কাঁধের মাংসে আঙুল দাবিয়ে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, 'তাতে কী?'

'ভালবাসি আমার বউকে। যা খুশি করে বেড়াই না।'

'তুমি তো অদ্ভুত লোক!' লারসেনের নিতম্বে চাপড় মেরে

মেয়েটা বুঝিয়ে দিল ম্যাসাজ শেষ।

তরুণী বিদায় নিলে বাথরুমে ঢুকল লারসেন, অনেকক্ষণ ধরে ভিজল শীতল পানিতে।

বিশ মিনিট পর ওর দরজায় টোকা দিল পেঁচা।

দরজা খুলে লারসেন দেখল, খুব প্রশান্তিময় চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফুলজেন্স।

খুশি-খুশি স্বরে বলল পেঁচা, 'এই শহরকে ভালবাসি আমি।'

'তাতে সন্দেহ কী,' বলেই তাড়া দিল লারসেন, 'তবে এবার কাজে নামতে হবে। যোগাযোগ করেছি এক ডেইন বন্ধুর সঙ্গে। দেখা করতে হবে আধঘণ্টার ভেতর। সে আমাকে শিখিয়ে দেবে কীভাবে ঘুষ দিতে হবে থাই সিনিয়র পুলিশ অফিসারকে।'

চেহারায় দ্বিধা ফুলজেন্সের।

ব্যাখ্যা দিল লারসেন, 'আমার বন্ধু আসলে আমার বন্ধু নয়। সে এক বন্ধুর বন্ধু। বিদেশে আমরা ডেইনরা পরস্পরের খোঁজ রাখি। দরকার পড়লে সাহায্য করি। বেহেরেণ্ড নিসেন নাম এই লোকের। মস্ত বড় এক ডেনিশ ট্রেডিং কোম্পানির ম্যানেজার। গত বারো বছর ধরে এ দেশে আছে। ঘাই-ঘাপলা সবই জানে। এ দেশে বাস করে এমন সব বিদেশিরা কে কী কাজ করে, কী করে না, তার ওপর ফাইল আছে পুলিশের কাছে। ধরে নিতে পারি, দায়না বেলগুতাইয়ের ওপরেও ফাইল রেখেছে। কিন্তু ওই ফাইল দেখতে চাইলে লাগবে মোটা অঙ্কের ঘুষ। কাজেই চলো, রওনা হয়ে যাই।'

প্যাট পং রোডের অন্ধকার এক বার-এ হলো মিটিং। লারসেন ও বেহেরেণ্ড নিসেনের একটা কথাও বুঝল না ফুলজেন্স। ডেনিশ ভাষা বলার সুযোগ পান না ওই লোক, স্ন্যাপ্স্-এ চুমুক দেয়ার আগে টোস্ট করলেন: 'স্কাল!' অবশ্য কয়েক মিনিট পর ফুলজেন্সের সুবিধার জন্যে ইংরেজি ভাষায় শুরু হলো আলাপ।

নিসেন খুলে বললেন কীভাবে দিতে হবে ঘুষ। লারসেনের দিকে কার্ড বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ওই লোকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে তার অফিসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন। তখন বলবেন, আপনি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। কাজ করেন ডিভোর্স কেস-এ।'

'তাতে সমস্যা নেই,' বলল লারসেন।

'বুঝিয়ে দেবেন নিজের কাজে আপনি দক্ষ। মহিলার নাম দেবেন তাকে। পুলিশ অফিসারের কাছে জিজ্ঞেস করবেন, ওই মহিলার ওপর তাদের কাছে ফাইল আছে কি না। ওই লোক যেহেতু ওভারসিস রেসিডেন্টের ফাইল রাখার ডিপার্টমেন্টের হেড, দেরি না করেই খোঁজ নেবে সে তার কমপিউটারে। বলেও দেবে, হ্যাঁ, তার কাছে ওই মহিলার ফাইল আছে। কিন্তু দেখাতে পারবে না আপনাকে, নিয়ম নেই। তখন বাধ্য হয়ে উঠে পড়বেন আপনি, আর এমন সময় থপ্ করে আপনার ওয়ালেট পড়বে মেঝেতে। বলবেন, ''যাহ্! মেঝেতে পড়ে গেল ওয়ালেট। ওটার ভেতর দু'হাজার ডলার!'''

'দু'হাজার ডলার!' আঁৎকে উঠল লারসেন।

'আপাতত ওটাই রেট। থাই শালারা আর আগের মত নেই। মাত্র দশটা বছর আগে এক শ' ডলার ফেললে খুশি হয়ে উঠত। শহরটা বড় হচ্ছে। চারপাশে উড়ছে টাকা। এদিকে খুব কম বেতন দেয়া হয় থাই পুলিশকে। তাদের আশি ভাগ পয়সা আসে মেঝেতে পড়া ওয়ালেট থেকে। ওই টাকার কমে মেঝেতে ওয়ালেট ফেলবেন না। কয়েক সপ্তাহ আগে এক মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম ইমপোর্টের পারমিট সমস্যার জন্যে। তখন ওয়ালেট ফেলে দিয়ে বললাম, "যাহ্, দশ হাজার ডলার সহ পড়ে গেল ওয়ালেট!" মন্ত্রী হেসে বলল, "না, মিস্টার নিসেন, আপনি ওয়ালেট ফেলে দিয়েছেন বিশ হাজার ডলার সহ!" ফলে আবারও ফিরে এসে আরও মোটা ওয়ালেট নিয়ে যেতে হলো। আপনি ওই ফাইল

দেখতে চাইলে, ওই রেট অনুযায়ী দু'হাজার ডলার না দিয়ে উপায় নেই। অবশ্য, আমার কথা ভুলেও তাকে বলবেন না। যাবেন একা। ভদ্রতা বলে কথা আছে না? এ ধরনের লেনদেনের সময় কাউকে রাখতে হয় না।' বোতল তুলে নিয়ে তিন গ্লাসে আরও তিন পেগ ড্রিঙ্ক ঢাললেন তিনি। করুণ সুরে বললেন, 'বলুন তো, কী হয়ে গেল আমাদের সেই ফুটবল টিমের?'

ছাপ্পান্ন

সুইমিং পুলের পাশে ছাউনিতে বসে আছে রানা ও রেমারিক। পরনে সুইম স্যুট, হাতে বিয়ার। আলাপ চলছে ওদের দু'জনের ভেতর।

একটু আগে সিআইএ এজেন্ট চার্লস মাইলসের সঙ্গে আমেরিকান এম্বাসিতে গেছে মারিয়া। নিশ্চিত হবে, ওর ফ্যাক্স পেয়ে পরিষ্কারভাবে বিষয়টা ইণ্টারপোল বুঝতে পেরেছে কি না।

বেশ জোর দিয়ে কথা বলছে রেমারিক। 'যৌক্তিকভাবে চিন্তা করো, রানা। তোমার যোগ্যতার ব্যাপারে সবই জানে দায়না বেলগুতাই। ভাল করেই জানত তুমি হো চি মিন সিটিতে হাজির হবে। চিনেও ফেলবে ফলোয়ারকে। তাকে ধরে জোগাড় করবে তথ্য, তাও জানা কথা। আর ওই তথ্য তার মগজে দিয়েছে ওই মেয়েই। জানত, খুঁজে বের করবে ওই ফ্যাক্স মেশিনের নম্বর। তার অফিসে হানা দেবে। পাবে ফাইলের ভেতর জর্জ হার্টিগানের ছবি। আর তারপর খুঁজে বের করবে মন্দির বিশেষজ্ঞ। বোধহয়

জানে, তুমি দক্ষ প্যারাট্রুপার। হয়তো এটাও জানে, কয়েক বছর আগে রাতের আঁধারে গিয়ে নেমেছিলে কঠোরভাবে পাহারা দেয়া এক মাফিয়া কাপোর বাড়ির কমপাউণ্ডে। খুন করেছিলে ওর দলের সবাইকে। আর এবার এই মিশনের শুরু থেকেই সব মেপে দেখে তোমাকে পথ দেখিয়ে চলেছে ওই মেয়ে। যেভাবেই হোক, তোমার মগজ ভেজে খেয়েছে সে। আর এজন্যেই দুশ্চিন্তা হচ্ছে।' সামনে ঝুঁকে বলল রেমারিক, 'ওই মেয়ে মন্দির থেকে তোমাকে দূরে রাখতে মাইনফিল্ড তৈরি করায়নি। ওটা করেছে তোমার বেরিয়ে যাওয়া ঠেকাতে। ভাল করেই জানে, যে-কোনও রাতে ওর আঙিনায় পা রাখবে তুমি আকাশ থেকে। সেজন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে প্যাগোডার ভেতর।'

কোনও জবাব দিল না রানা। বিয়ার শেষ করে ডাইভ দিল সুইমিং পুলে। জিমনেশিয়ামে গিয়ে ব্যায়াম করছে না বলে ঠিক করেছে, অন্তত এক শ'বার এদিক ওদিক করবে অলিম্পিক-সাইজ সুইমিং পুলে।

ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করল রেমারিক। ভাল করেই জানে, ওর বন্ধু সাঁতার কাটতে গিয়ে মাথা খাটাবে। আর তার পরেও যদি ঠিক করে প্যারাশ্যুট নিয়ে নামবে, সেক্ষেত্রে প্রবল আপত্তি তুলে ওকে বাধা দেবে রেমারিক। অন্তত একা ওকে নামতে দেবে না ওই প্যাগোডায়।

একঘণ্টা পর পুল থেকে উঠে এল রানা, ভেজা পায়ে এসে থামল টেবিলের পাশে। তোয়ালে তুলে নিয়ে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। আমার মনে অস্বস্তি তৈরি করেছে ওই মেয়ে। হয়তো তোমার কথা মত মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল।'

'তাই?' হাসল রেমারিক। 'আমি তো জানি, তুমি ফিরবে না। মাসুদ রানা কাজ শেষ না করে ফিরে যাওয়ার লোক নয়। পেটে কোনও গোপন বুদ্ধি আছে। বলে ফেলো এবার। আমি শুধু একটা

কথাই বলব, কোনওভাবেই তোমাকে ওই প্যাগোডায় প্যারাশ্যুট নিয়ে একা নামতে দেব না। আজ রাতে পৌঁছে যাবে সিম আর জ্যাঁ। হয়তো এরই ভেতর নতুন খবর পাবে পেঁচা আর পিটার, তারপর চলে আসবে এখানে।'

'পিটারকে সঙ্গে নিয়ে এই মিশনে যাব না,' বলল রানা। 'ও সৈনিক নয়, তা ছাড়া ভাবতে হবে ওর বউ-বাচ্চার কথা। কর্নেলিসেরও যাওয়া উচিত নয়। তবে মানবে না। মোট কথা, আমাদের সেনাবাহিনী হবে পাঁচজনের। তবে পিটারের কাছ থেকে খবর না পাওয়া পর্যন্ত কোনও প্ল্যান করে লাভ হবে না। ততক্ষণে ইন্টারপোল থেকেও খবর পেয়ে যাবে মারিয়া।'

'দুর্দান্ত এক মেয়ে,' বলল রেমারিক, 'যে বিয়ে করবে, তার সত্যিই কপাল ভাল। যেভাবে সিআইএ এজেন্ট মাইলসকে ডেঁটে দিল! ব্যাটার মনে হয়েছে আগুনে পা দিয়েছে।'

মুখ খুলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল রানা। এইমাত্র টেবিলের সামনে এসে থেমেছে মারিয়া। হাসিমুখে বলল, 'তোমাদের জন্যে ফলের সালাদ দিতে বলেছি। আমার জন্যে কোক।' রানার দিকে তাকাল। 'কী নিয়ে কথা হচ্ছিল?'

'তোমাকে নিয়েই,' মুচকি হাসল রানা। 'আমরা সিদ্ধান্তে এলাম, তুমি একেবারে কাজের মেয়ে নও, তা হয়তো ঠিক নয়।'

'তাই?' ভুরু উঁচু করল মারিয়া। 'শুনে খুশি হলাম। বোধহয় ঠিকই ভেবেছ। কারণ সত্যিই সামান্য খবর নিয়ে তোমাদের দরবারে হাজির হয়েছি।' মস্ত ব্যাগ খুলে রোল করা ফ্যাক্স পেপার রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'একঘণ্টার ভেতর হাজির হয়েছে।' হাসল মারিয়া। 'আমাদের মিস্টার মাইল্স্ মাইলকে মাইল দৌড়াতে পারে।'

দু'মিনিট পর কাগজ থেকে মুখ তুলে রেমারিককে দেখল রানা। 'অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স। চারজনের একজন। ব্যাংককের

এক কোম্পানি ভাড়া করেছে তাকে। ছয় মাস আগের কথা। ওই কোম্পানিকে সামনে রেখে মার্সেনারি জোগাড় করেছে খেমার রুয বাহিনী।'

'অ্যাডেলবার্ট এহে...' বিড়বিড় করল রেমারিক। 'দুনিয়ার বদ ওই শালা! মাইন পাতার ব্যাপারে সেরা লোক। অন্য তিনজন কারা?'

আরেকবার কাগজ দেখল রানা। 'ফেণ্ডারফেল্ড, ব্র্যাট রোর আর শ্যাগনিয়ার।'

'সবাইকে চেনো তোমরা?' জানতে চাইল মারিয়া।

'হ্যাঁ। ফেণ্ডারফেল্ড আর ব্র্যাট রোর ব্রিট। কাজ করেছে কঙ্গোতে শ্যন হোরের সঙ্গে। শ্যাগনিয়ার ফ্রেঞ্চ লোক, কাজ করত ডেটার্ডের পাশে। মার্সেনারি দলের ভেতর সবচেয়ে খারাপ লোক এরা। তবে তাদের ভেতর নিকৃষ্টতম ওই অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স। আফ্রিকানার। কাজ করত দক্ষিণ আফ্রিকান আর্মির হয়ে। তারপর ওরাও ওকে রাখতে পারল না। আর্মি পোঁদে লাথ দিতে সে যোগ দিল "বস" দলে। ওটা সাউথ আফ্রিকান সিকিউরিটি সার্ভিস। তাদের হয়ে কয়েকটা খুন করল দক্ষিণ আফ্রিকা ও মোযামবিকে।' তিক্ত হাসল রেমারিক। 'এসব করতে গিয়ে মেরে দিল ওই সংগঠনের অনেক টাকা। তারা কান ধরে বের করে দিল। তখন আবারও মার্সেনারির কাজ খুঁজে নিল। ইউরোপে আস্তানা গাড়ল। সেসময়েই রানার সঙ্গে টক্কর লাগল তার। এক হাইজ্যাকারের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে গোলাগুলি করছে, এমন সময় একটু দূরের এক মহিলার কোলে গুলি খেল তার এক বছরের শিশু। অথচ একটু সতর্ক হলেই খুন হতো না ছেলেটা। প্যারিস থেকে পালিয়ে গেল এহেরেন্স। তার কিছু দিন পর লণ্ডনের এক বার-এ ওর সঙ্গে দেখা হলো রানার। কথায় কথায় এহেরেন্স বলেছিল, কে মরল আর কে বাঁচল, তা নিয়ে কোনও ভাবনা নেই তার। ওই

শিশু বাঁচলে এক দিন হয়তো ডাকাত হতো। এ পর্যায়ে ওকে বেধড়ক পিট্টি দিল রানা। ভেঙে দিয়েছিল দুই বাহু। ঘাড় ধরে মেঝে থেকে তুলে বলেছিল, আবারও দেখা হলে তখন হাত-পা ভাঙবে না, পেটে গুলি করবে, যাতে কষ্ট পেয়ে ধীরে ধীরে মরে।'

রেমারিক চুপ হয়ে গেলে তিক্ত স্বরে বলল রানা, 'আপাতত প্যাগোডার চারপাশে মাইনফিল্ড তৈরি করার কাজে ব্যস্ত।'

'ইন্টারপোলের তথ্য অনুযায়ী ওই কুকুরটা আছে কোথায়?' জানতে চাইল রেমারিক।

'এগারো মাস আগে হারিয়ে গেছে ব্যাংকক থেকে। রেকর্ড অনুযায়ী সে এখনও ওই দেশের সীমান্ত পেরিয়ে অন্য কোনও দেশে পা রাখেনি। কিন্তু আমরা জানি, ও আছে টাক লুইয়ে শহরের কাছে।'

'একটা কথা বুঝলাম,' বলল রেমারিক, 'ও জানে না তুমি ওদিকে যাবে।'

'শিয়োর হলেন কী করে?' রেমারিকের দিকে তাকাল মারিয়া।

'কারণ, রানা বলেছিল, আবার দেখা হলে খুন করবে। আর কথাটা অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছিল সে। ব্যাপারটা সকালে পুব থেকে সূর্য ওঠে আর পশ্চিমে নামে— এমন।'

মারিয়ার অর্ডার করা কোক ও ফলের সালাদ এনেছে ওয়েটার, ট্রে নামিয়ে দিয়ে গেল টেবিলে।

'এবার আমরা কী করব?' জানতে চাইল মারিয়া।

'অপেক্ষা করব,' বলল রানা, 'দেখি আগামীকাল কোনও তথ্য জোগাড় করতে পারে কি না পিটার।'

'পারে কি না, মানে?' ভুরু উঁচু করল মারিয়া। 'তুমি ভাবছ কোনও তথ্য না-ও পেতে পারে?'

'সম্ভাবনা আছে, কিছুই পাবে না। ওই মেয়ের শিডিউলের আগে চলে এসেছি আমরা। এখনও তৈরি নয় সে। তবুও অপেক্ষা

করব। আর এ সময়ে স্থির করব, কীভাবে টাক লুইয়ে যাব, বা তারপর কী করব।'

সাতান্ন

'আপনি আইবিএম কমপিউটার ব্যবহার করেন?'

'জী,' বলল লারসেন। ব্রিফকেস তুলে বের করে নিল আইবিএম প্যাড।

ডেস্কের পেছন থেকে উঠে দাঁড়াল পুলিশ অফিসার। 'ঠিক আছে, মিস্টার লারসেন, আমাকে টয়লেটে যেতে হবে। আর তারপর ক্যান্টিনে যাব কফি খেতে। পনেরো মিনিটের ভেতর ফিরছি না। এর ভেতর আপনাকে বিরক্ত করা হবে না।' ডেস্ক পেরিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল সিনিয়র পুলিশ অফিসার। তার আগে বলে গেল, 'ওই ফাইলের নাম: বেলগুতাই/খেমার, নম্বর সাতাশ। আশা করি আপনার কাছে মোবাইল হার্ডডিস্ক আছে। মেঝেতে রেখে যাবেন ওয়ালেট। পনেরো মিনিট। আর এর ভেতর কিছু লাগলে কল দেবেন আমার মোবাইল ফোনে। আমি সবসময় তৈরি থাকি।'

'কথাটা মনে থাকবে,' বলল লারসেন।

মিস্টার বেহেরেণ্ড যা বলেছে, সেভাবেই ঘটেছে সব।

কম পয়সার প্লাস্টিকের একটা ওয়ালেট কিনে তার ভেতর দু'হাজার ইউএস ডলার রেখে ওটা পুলিশের ডেস্কের পাশে ফেলে দিয়েছে লারসেন।

অফিসার চলে যেতেই ডেস্কের ওদিকে গিয়ে কমপিউটার মনিটর দেখল, লোকটা খুলে রেখে গেছে দায়না বেলগুতাইয়ের ফাইল।

সব মিলে এক শ' পঞ্চাশ পৃষ্ঠার ফাইল।

পরের দশ মিনিট চোখ বোলাল লারসেন প্রথম পনেরো পৃষ্ঠার ওপর। তারপর মোবাইল ডিস্কে তুলে নিল ফাইল। চোদ্দ মিনিট পেরোবার আগেই বেরিয়ে এল অফিস থেকে। তার আগে একবার দেখল, কালো, চকচকে প্লাস্টিকের ওয়ালেট অবহেলায় পড়ে আছে পুলিশ অফিসারের চেয়ারের পাশে।

দু'হাজার ডলার ওটার ভেতর। কিন্তু তার চেয়ে অনেক দামি তথ্য পেয়ে গেছে লারসেন।

হোটেলে ফিরে দেখল, ওর জন্যে রিসেপশনে অপেক্ষা করছে মেসেজ। ওটা রেখে গেছে পেঁচা। বলেছে, ফিরলেই যেন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে।

টোকা দিতেই দরজা খুলল ফুলজেন্স, সরিয়ে ফেলল কান থেকে ইয়ারফোন। দরজা ছেড়ে বলল, 'কী পেলে?'

'বহুত কিছু, ওয়ালেট মেঝেতে ফেলে পেলাম কমপিউটার।' ব্রিফকেসে টোকা দিল লারসেন। 'মোবাইল হার্ড ডিস্কে এখন এক শ' পঞ্চাশ পৃষ্ঠার ফাইল। থাই পুলিশ ভাল করেই চেনে দায়না বেলগুতাইকে। অত্যন্ত বিপজ্জনক চরিত্র। এসব তথ্য পাঠাতে হবে রানার কাছে।'

মিনিবার-এ গিয়ে দু' বোতল টাইগার বিয়ার নিয়ে একটা লারসেনের দিকে বাড়িয়ে দিল পেঁচা। 'সরি, কার্লসবার্গ নেই।' নিজের বোতলের মাথা খুলল। 'রানা ফোন করেছিল। আজ বিকেলে এখানে পৌঁছবে কর্নেলিস আর মউরোস। কর্নেলিসের জন্যে এরেওয়ান হোটেলে রিযার্ভেশন দিয়েছি। শেরাটনে উঠবে মউরোস। আলাদা হোটেলে ওঠাই ভাল। এয়ারপোর্টে ওদের

জন্যে মেসেজ রেখে এসেছি। এদিকে রানা বলেছে, ওই মেয়ের ব্যাপারে আরও তথ্য পেয়েছে। তাতে আরও জটিল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। আপাতত ব্যাংককে থাকতে হবে আমাদেরকে। পরে যোগাযোগ করবে রানা। জানতে চাইল, নতুন কিছু জানতে পেরেছ কি না। বলেছি, ফিরলেই ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবে তুমি। নম পেন-এ আমেরিকান এম্বাসির এক লোকের নাম আর ফোন নম্বর দিয়েছে। আমাদের ভেতর বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করবে ওই লোক।'

'গুড,' বলল লারসেন। 'ওই লোককে ফোন দাও।'

অর্ধেক বিয়ার শেষ করে দু'মিনিট পর মিস্টার মাইলসের সঙ্গে কথা বলতে পারল লারসেন। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর বলল, 'সামনে কমপিউটার আছে? ...গুড। মাইক্রোসফট ওঅর্ড ব্যবহার করেন? ...গুড। কমপিউটারের অ্যাকসেস কোড দিন। আমার মডেমের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেব ফাইল। পরে কল করে কনফার্ম করবেন ফাইল পেয়েছেন কি না। দুটো প্রিন্ট বের করবেন, তারপর যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছে দেবেন রানার হাতে।' ফোন নম্বর জানিয়ে দিয়ে ক্রেডলে রিসিভার রাখল লারসেন। ব্যস্ত হয়ে উঠল কাজে।

প্রশংসার দৃষ্টিতে ওকে দেখল ফুলজেন্স।

কমপিউটার জিনিসটাকে কখনও সহজ বলে মনে হয়নি ওর কাছে। মাত্র একমিনিটের ভেতর কেমন সব গুছিয়ে নিয়ে বসে পড়েছে লারসেন।

'পৃথিবী বড়ই জটিল,' মন্তব্য করল পেঁচা, 'এমনও দিন ছিল, যখন মার্সেইলসের একমাথা থেকে আরেক মাথায় ফোন করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হতো।'

'তাতে কখনও অবাক হইনি,' চওড়া হাসি দিল লারসেন। 'ফ্রেঞ্চরা শুধু শিখেছে কীভাবে বানাতে হয় বিয়ার্নেইস সস আর

কীভাবে চালাতে হয় সাইকেল।’

‘গাধা শালা বলে কী!’ গম্ভীর চেহারা করে বিয়ারের বোতল হাতে গিয়ে খাটে বসল ফুলজেন্স। কানে গুঁজে নিল ইয়ারফোন।

আটান্ন

পিটার লারসেনের পাঠানো ফাইলের দুটো কপি রানা ও রেমারিকের হাতে তুলে দিয়েছে সিআইএ এজেন্ট চার্লস মাইল্‌স্‌। চুপ করে বসে আছে এখন। খুব দ্রুত পড়ছে রানা ও রেমারিক। মাঝে মাঝে মারিয়া, রেমারিক ও মাইলসকে দেখছে রানা। আধ ঘণ্টা পর টেবিলে রেখে দিল কাগজগুলো।

‘আপনি তো পুরো পড়লেনও না,’ বলল মাইল্‌স্‌।

কোনও জবাব না দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর সামনে চলে গেল রানা। ওদিকে মস্ত বড় বাগান। দশ মিনিট পর রানার পাশে এসে দাঁড়াল রেমারিক।

‘যেমন বাপ, তেমন মেয়ে,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। ‘হাড়ে হাড়ে শয়তান। ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে উঠেছে, কারণ বুদ্ধির অভাব নেই তার। নইলে সরবোন ইউনিভার্সিটি থেকে ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি পেত না।’

মাথা দুলিয়ে সায় দিল রেমারিক। ‘অশুভ, বুদ্ধিমতী আর সুন্দরী। তিনটে মিশে গেছে বলে আরও বিপজ্জনক। আমি অবাক হয়েছি অন্য কারণে। কমপ্লিট ফাইল তৈরি করেছে থাই পুলিশ।’

‘অবাক হওয়ার কিছু নেই,’ বলল রানা। ‘প্রথম থেকেই

খেমার রুযের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক ছিল থাই ব্যবসায়ীদের। তাদের কাছ থেকে, আর খেমার রুয গুপ্তচরদের কাছ থেকে বহু তথ্যই পেয়েছে থাই পুলিশ। কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে কাঠ, রত্ন আর আর্মস্ কেনা-বিক্রির সময়। ওই টাকার বড় একটা অংশ গেছে থাই জেনারেল আর রাজনৈতিক নেতাদের পকেটে। ফাইল অনুযায়ী, কার্ডামম পাহাড়ে খেমার রুয কমাণ্ডার হিসেবে কাজ করছে দায়না বেলগুতাই। অধীনে আছে কমপক্ষে দু'হাজার খেমার রুয সৈনিক। গত দু'বছর ধরে ওই এলাকা থেকে মাইন সরিয়ে নিচ্ছে তারা। পাহাড়ি এলাকায় অবস্থান নিচ্ছে খেমার রুয বাহিনী। কারণটা কী, এখনও জানা নেই।'

আলাপে যোগ দিল মারিয়া ও মাইল্স্। মারিয়া বলল, 'ওই ফাইল পড়ার পরেও যাবে ওখানে?'

'হ্যাঁ, যাব,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল রানা। 'এখন প্রশ্ন হচ্ছে: ওখানে পৌঁছব কীভাবে।'

সিআইএ এজেন্ট মাইল্স্ বলল, 'ওই ফাইল দেখালে কাজ হবে। আমরা হয়তো ক্যামবোডিয়ান সরকারকে চাপ দিতে পারব। সেক্ষেত্রে তারা হয়তো আকাশ থেকে হামলা করবে ওই পাহাড়ি এলাকায়। খেমার রুয বাহিনীর ভেতর নামবে সরকারী বাহিনী।'

'সেই ট্রেনিং বা রিসোর্স ওদের নেই,' নাকচ করল রানা। 'এ দেশে এক ব্যাটালিয়ন এয়ারবোর্ন সৈনিক পাবেন না। তবে চাইলে হেলিকপ্টারে করে কয়েক শ' সৈনিক পাঠাতে পারে। কিন্তু ওই ছোট বাহিনী সফল হতে পারবে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল মাইল্স্। 'অথচ ভাবছেন আপনি আর আপনার কয়েকজন বন্ধু সফল হবেন?'

'আমরা রাতের আঁধারে ওদের এলাকায় ঢুকব, আবার বেরিয়ে আসব ভোরের আগেই,' বলল রানা, 'একে অপরকে ভাল

করেই চিনি। বহুবার লড়াই করেছি নানান মিশনে। খেমার রুয বাহিনী তৈরি হয়েছে স্থানীয় চাষাদেরকে নিয়ে। তাদের যথেষ্ট ট্রেনিং বা ইকুইপমেণ্ট নেই।' ঘুরে দাঁড়িয়ে টেবিলের সামনে থামল রানা। মানচিত্র বিছিয়ে দিল টেবিলের ওপর। নির্দিষ্ট এলাকা দেখাল। 'ওই এলাকা ব্যাংকক থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দক্ষিণে।' মাইলসের দিকে তাকাল। 'দায়না বেলগুতাই আমার মন পড়তে শুরু করেছিল, আর এ কারণেই পাল্টে নিয়েছি আগের প্ল্যান। আমরা প্যাগোডার আঙিনায় প্যারাশ্যুট নিয়ে রাতে নামব না। ব্যাংককে তার কোম্পানিতে আছে শতখানেক কর্মচারী, তাদের মাধ্যমে বা অন্য কোনওভাবে দায়নাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, ও যা ভাবছে, ঠিক তাই করব আমি। আর এ কাজ করতে আপনি সাহায্য করবেন, মাইল্স্।' www.boighar.com

'আপনার আসলে কী লাগবে?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল চার্লস মাইল্স্।

'প্রথম কথা, চাই বেশ কিছু তথ্য। ব্যাংককে কয়েকটা ফ্লাইং প্রাইভেট ক্লাব আছে। জানতে হবে তাদের কাছে কী ধরনের ইকুইপমেণ্ট আছে। তারা ভাড়া দেবে কি না তাদের এয়ারক্রাফট। দ্বিতীয় কথা, জানতে হবে ব্যাংককে স্পোর্টস্ প্যারাশ্যুট বিক্রি হয় কি না। ওগুলো হতে হবে পাখির ডানার মত। যেগুলো ব্যবহার করে প্যারাশ্যুট ক্লাব।'

'ব্যাংককের দোকানে না পেলে আনিয়ে দেব আমেরিকা থেকে,' বলল মাইল্স্।

মাথা নাড়ল রানা। 'তাতে হবে না, কিনতে হবে দোকান থেকেই। আগামীকাল ব্যাংককে যাব রেমারিক আর আমি। ওখানে থাকবে দলের অন্যরা। প্রথম থেকেই রেমারিক আর আমার পিছু নেবে দায়নার দলের লোক। হোটেলের ফোনে কান পাতবে। কিছুই বুঝতে পারিনি এমন ভঙ্গি করে রাতের জন্যে

চার্টার করব বিমান। প্যারাশ্যুটও কিনব। কিন্তু তারা জানবে না, গোপনে জোগাড় করব দুটো ল্যাণ্ড রোভার বা জাপানি কোনও জিপ। ততক্ষণে দলের লোক দায়নাকে জানিয়ে দেবে, বিমান থেকে নামব প্যাগোডায়।' ম্যাপ দেখাল রানা। 'আঁধার রাতে চোখ রাখবে আকাশে। কিন্তু সে-সময়ে থাই সীমান্ত পেরোব আমরা জিপ নিয়ে।'

'আর মারিয়াকে যে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছে, তার কী হবে?' জানতে চাইল রেমারিক।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আর মেসেজ পাঠাবে না। সময় আদায় করছে দায়না বেলগুতাই।'

উনষাট

'আমরা একটা চুক্তি করব,' বলল দায়না বেলগুতাই।

'কী ধরনের চুক্তি?' জানতে চাইল এহেরেন্স।

পাথুরে মেঝেতে বসে আছে সে। বাম কবজিতে হ্যাণ্ডকাফ। ওটার অন্য অংশ গেছে দেয়ালের আংটায়।

টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে আছে দায়না। পরনে জিন্স ও ঘি রঙের সিল্কের ব্লাউজ। হাতে সাদা ওয়াইনের শীতল গ্লাস। ওর পেছনে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে কালো পোশাক পরা দুই মহিলা, কোমরের হোলস্টারে টোকারেভ পিস্তল।

ওয়াইনে চুমুক দিল দায়না। 'বাঁচতে দেব তোমাকে। বদলে আমাকে পরামর্শ দেবে।'

রসহীন হাসি হাসল এহেরেন্স। 'দারুণ প্রস্তাব তো! তোমাকে পরামর্শ দেব, বদলে খুন হব।'

মাথা নাড়ল দায়না। 'না। কয়েক মিনিটের ভেতর তোমাকে ছেড়ে দেব। যেতে পারো কনি টুরেনের কাছে। শুনেছি ওর ছেলেটাকে খুব পছন্দ করো। লেখাপড়া করাচ্ছ। আর সবাইকে শাসিয়ে দিয়েছ, কেউ যেন না যায় কনি টুরেনের কাছে। চাইলে চলে যেতে পারবে ওদেরকে নিয়ে। কিন্তু তার আগে কয়েক দিন থাকতে হবে এখানে। পরে আমার লোক তোমাদেরকে পৌঁছে দেবে থাইল্যাণ্ডে। আগেই ফেরত পাবে তোমার স্যাফায়ার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল এহেরেন্স। বুঝে গেল, আসলে কিছুই করার নেই ওর। বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ধরনের পরামর্শ চাই তোমার?'

'এক লোককে চরম ঘৃণা করি, তার ব্যাপারে পরামর্শ। ওই লোকের নাম মাসুদ রানা।'

ঝাঁকি খেয়ে মাথা তুলল এহেরেন্স। 'রানা?!'

'হ্যাঁ। আগামী দু'এক দিনের ভেতর আসবে সে।' হেসে ফেলল দায়না। পরিষ্কার ভয় দেখেছে এহেরেন্সের চোখে। নিচু স্বরে বলল যুবতী, 'ভয় পেয়ো না, ডাচম্যান। ও জানে না তুমি এখানে আছ। আকাশপথে আসবে, সঙ্গে সম্ভবত ওর বন্ধু ভিটেলো রেমারিক।'

নিজেকে সামলে নিতে চাইল এহেরেন্স। 'আকাশপথে আসবে? কিন্তু এদিকে তো কোনও রানওয়ে নেই।'

'রানওয়ে লাগবে না তার। রাতে এসে প্যাগোডা এলাকায় নামবে প্যারাশ্যুট ব্যবহার করে। ওখান থেকে আর বেরোতে পারবে না। ওই আঙিনায় ওর জন্যে অপেক্ষা করব আমি আমার লোকসহ।'

'কেন এখানে আসবে রানা?' জানতে চাইল এহেরেন্স।

'আসবে জর্জ হার্টিগান নামের এক আমেরিকান সৈনিককে ছুটিয়ে নিতে। ওই সৈনিকের দুই সঙ্গী মারা গেছে বেশ কিছু দিন আগে। সেটা জানে না রানা। ওর ধারণা, ওই তিনজনকে পাবে প্যাগোডার ভেতর।' তিক্ত হাসল দায়না। 'আর ওখানেই ওই জর্জ হার্টিগানের সঙ্গে পুড়ে ছাই হবে। রক্ষা পাবে না তার বন্ধুও। তুমি তো তার বন্ধু না, এহেরেন্স, নাকি?'

মাথা নাড়ল অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স। 'না। ও যদি আমাকে সামনে পায়, খুন করবে।'

লোকটার বাহুতে হাত বোলাল দায়না। 'না, তোমাকে খুন করবে না সে, এহেরেন্স। সে আমার শত্রু, আর তাই ওকে খুন করব আমি।'

বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করল মার্সেনারি, 'কেন সে তোমার শত্রু?'

'কারণ সে খুন করেছে আমার বাবাকে। ওকে শেষ করার জন্যে পুরো চার বছর অপেক্ষা করেছি। ওর খোঁজ বের করতে গিয়ে খরচ করেছি লাখ লাখ ডলার। প্রতি রাতে আর ভোরে নতুন করে শপথ করেছি, খুন করব কুকুরটাকে। চোখের সামনে দেখি, আমার বাবার মাথায় গুলি করছে সে। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে তার প্যাগোডা। আমার বাবা যেন সামান্য কুকুর বা বিড়াল, মেরে ফেললেই হলো! বহু দিন ধরে মনের ভেতর পুষেছি শপথ, একদিন গুলি করে তাকে ফেলব আগুনের ভেতর— ঠিক যেভাবে খুন করেছে আমার বাবাকে। আর এখন সব তৈরি। আসুক সে। দ্বিধা নিয়ে আসবে। ভাববে, কেউ জানবে না সে এসেছে। কিন্তু ভুল চিন্তা। ভাল করেই জানি, সে আর তার বন্ধু প্যারাট্রুপার। ঝামেলাপূর্ণ জায়গায় হামলা করতে হলে প্যারাশ্যুট ব্যবহার করে রানা। এবারও নামবে। কিন্তু বেরোতে পারবে না ওই আঙিনা থেকে।'

‘কী ধরনের পরামর্শ চাও আমার কাছ থেকে?’ জানতে চাইল এহেরেন্স।

‘তুমি মার্সেনারি,’ বলল দায়না। ‘আগেও রানার সঙ্গে একই দলে কাজ করেছ। কী ধরনের অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে আসবে সে?’

কিছুক্ষণ ভেবে বলল এহেরেন্স, ‘সব ধরনের অস্ত্রের জন্যে তৈরি থেকো। ওর সঙ্গে থাকবে উযি সাবমেশিন-গান। গ্রেনেড। অনেকগুলো। সেসবের ভেতর থাকবে ফ্র্যাগমেন্টেশন আর ফসফোরাস গ্রেনেড। পিস্তল আর ছোরা থাকবে। আরও একটা জিনিস... ওটা আরও বিপজ্জনক।’

‘সেটা কী?’

স্মৃতির ছায়া পড়ল মার্সেনারির চোখে। ‘ওর হিংস্রতা হবে সিংহের চেয়েও বেশি। ও যখন লড়াই করবে, যা করা উচিত তাই করবে যন্ত্রের মত, মাথায় থাকবে না বাড়তি কোনও চিন্তা। কখনও ওর মত কাউকে দেখিনি। ছোটবেলায় একবার দক্ষিণ আফ্রিকায় আটকে ফেলি একটা সিভেট ক্যাট। আমার বাবার খামারের মুরগি শেষ করছিল। আমরা যেটাকে ভিআইপি ফাঁদ বলি, ব্যবহার করি ওই জিনিস। কোনও গাছের সরু কাণ্ড বা ডাল বাঁকা করে তৈরি করতে হয়। ওটাকে মাটির সঙ্গে আটকে রাখে তার। পাশেই থাকে গোল ফাঁসের দড়ি বা তার। কাণ্ড বা ডালে বিড়াল পা রাখলেই ওটা ট্রিগার করে ফাঁদ। ফাঁস আটকে যায় বিড়ালের পায়ে। ঝটকা দিয়ে ওপরে উঠে যায় কাণ্ড বা ডাল। যাই হোক, ধরা পড়ল ওই সিভেট ক্যাট, ঝুলতে শুরু করে উন্মাদের মত ঝটকা দিচ্ছিল। চোদ্দ বছর বয়স, আমার হাতে ছিল শটগান। আগেও জানতাম আফ্রিকার সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী ওই বিড়াল। মিথ্যা বলব না, ওটার মত আর কোনও জন্তু কখনও দেখিনি। ওটার পা আটকা পড়েছে, মাথা ঝুলছে মাটির দিকে। তার পরেও ছয়বার গুলি করার পর প্রথমবারের মত গায়ে গুলি

লাগাতে পারলাম। ওটাকে শেষ করতে লেগেছিল পরের চারটা গুলি। এখনও মনে আছে ওটার চোখ। জ্বলজ্বল করছিল হলদে চোখ। দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর ঘৃণা। ওটাকে নামালাম ফাঁদ খুলে। বুকের ভেতর বুঝে গেলাম, আগে কখনও এমন হিংস্র কিছু দেখিনি। অনেক বছর পর আবারও ওই ঘৃণা ও হিংস্রতা দেখলাম লণ্ডনের এক বার-এ। সেদিন বাধ্য হয়ে লড়তে হয়েছিল মাসুদ রানার বিরুদ্ধে। আমার সমস্যা ছিল, সেই রাতে আমার কাছে শটগান ছিল না। আর ঝুলছিল না ও। দায়না, তুমি যতজন লোক নিয়েই ওই প্যাগোডায় অপেক্ষা করো, যতই অস্ত্র থাকুক, জান বাঁচাতে হলে খুব সতর্ক হতে হবে তোমাকে।'

হাসছে দায়না বেলগুতাই। মৃদু মৃদু দুলছে শরীর। মন চলে গেছে বহু দূরে কোথাও। ঘুরে তাকাল এহেরেন্সের দিকে। আর ওই দৃষ্টি দেখে শিরশির করে উঠল মার্সেনারির বুক। হ্যাঁ, সে চেয়ে আছে আরেকটা সিভেট ক্যাটের দিকেই। এমন একটা বিড়াল, যেটা ছেড়ে দেয়নি তার শিকারকে।

ষাট

সিআইএ এজেন্ট মিস্টার মাইল্‌স্‌ যেন আশ্রয়হীন এক বাচ্চা কুকুর, এইমাত্র তাকে জায়গা দেয়া হয়েছে বাড়িতে— আর তাই খুশিতে বারবার নড়ছে লেজ। পুরো পটে গেছে সে। লেজ থাকলে মারিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার নাড়ত। প্রতিটা কথায় সায় দিচ্ছে।

এইমাত্র ফোন করতে গেছে মাইল্‌স্‌, এ সুযোগে বলল রানা, 'কীভাবে খাঁচায় পুরলে, মারিয়া?'

'আমার যে ভাল লাগছে, তা নয়,' একটু বিরক্তি নিয়ে বলল মারিয়া।

'আপাতত মেনে নাও,' বলল রানা। 'চাইলেই যে-কোনও সিআইএ এজেন্টকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারবে না। এনজয় করো। তুমি একবার বললেই লাফিয়ে উঠবে, ডাকাতি করে এ দেশের জাতীয় ব্যাংক খালি করে সব এনে ঢেলে দেবে তোমার পায়ের কাছে।'

'আমি চাইছি নাকি ওর কাছে! যে-কোনও সময়ে জড়িয়ে ধরে মোটা গলা করে বলবে, "তোমাকে ভালবাসি, মারিয়া!"'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তাতে সমস্যা নেই। একবার সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের অভিযোগ তুললেই ভেজা ছুঁচো হয়ে যাবে। ওই দুই শব্দ শুনলে আঁৎকে ওঠে আমেরিকান পুরুষ। নারী স্বাধীনতার সঙ্গে এসেছে ওই জাদুকরী দুই শব্দ।' চেহারা গম্ভীর করল রানা। 'কিন্তু মিশন শেষ হওয়ার আগে ভেঙে দিয়ো না ওর পাঁজর। বহু কাজে আসছে মাইল্‌স্‌। বুদ্ধিও কম নয়। ও-ই তো ভেবে বের করেছে বিশ্বাসঘাতক খেমার রুয সৈনিক কাজে আসবে। গত কিছু দিনের ভেতর সরকারী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, বা চর হয়ে গেছে কেউ কেউ। মাইল্‌স্‌ তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে তাদের কয়েকজনকে। আর তাদের ভেতর থেকে বেছে নেবে তুমি সেরা লোকটাকে।'

বাংলোর প্যাটিয়োতে বসে আছে ওরা। রেমারিক গেছে বিযনেস সেন্টারে ফ্যাক্স পাঠাতে। নেপলসে ওর হোটেল-রেস্তোরাঁর কী হাল করেছে ফুরেলা, তা জানা দরকার। কে জানে, সে হয়তো ওর বাড়িটা পতিতালয় বানিয়ে ছেড়েছে!

ফোন শেষ করে আবারও ফিরল চার্লস মাইল্‌স্‌। চেয়ার টেনে

বসে মারিয়াকে বলল, 'সব ঠিক হলো। ক্যামবোডিয়ান আর্মি হেডকোয়ার্টারে আমার হয়ে লিয়াসোঁ করা লোকটা বেছে নিয়েছে পাঁচজন প্রাক্তন খেমার রুয স্যনিক। তিন সপ্তাহের ভেতর ওই এলাকা থেকে পালিয়ে এসেছে তারা। আধঘণ্টা পর আপনার সঙ্গে ওদের মিটিং। আপাতত আছে তারা ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে। আমি নিজে নিয়ে যাব আপনাকে। তবে মনে রাখবেন, ক্যামবোডিয়ান আর্মি অফিসারের সামনে এই মিশনের ব্যাপারে কিছুই বলবেন না।' রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনি চাইলে ইউএস আর্মি বা ইউএন-এর এয়ারক্রাফট ধার দিতে পারি। সেক্ষেত্রে কেউ জানবে না নম পেন ছেড়ে কখন পৌঁছে গেছেন ব্যাংককে।'

www.boighar.com

মাথা নাড়ল রানা। 'ধন্যবাদ, মাইল্স্। কিন্তু সিভিলিয়ন এয়ারক্রাফটে যাব। দায়না বেলগুতাই জানুক, আমরা নম পেন ত্যাগ করেছি। যাচ্ছি ব্যাংককে। আপাতত ওকে কিছু তথ্য দেব। অবশ্য মারিয়া আর প্রাক্তন খেমার রুয সৈনিককে গোপনে ব্যাংককে পৌঁছে দিলে ভাল হয়।'

'নিজে যাব মারিয়ার সঙ্গে!' জোর দিয়ে বলল মাইল্স্।

'আপনি?'

'অবশ্যই! ওই ফাইলের কারণে আমরা জানি, ব্যাংককে বড়সড় সংগঠন আছে দায়না বেলগুতাইয়ের। যখন তখন হামলা করবে। শহরে কে দেবে ওকে নিরাপত্তা? আপনারা তো থাই সীমান্ত পেরিয়ে চলেছেন ক্যামবোডিয়ায়।' ডান হাতে বাম বগলে টোকা দিল সে। 'আমার সঙ্গে গ্লক পিস্তল আছে। মারিয়া এ এলাকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দিনরাত পাহারা দেব।'

চট্ করে মারিয়াকে দেখল রানা।

মারিয়া লুকাতে চাইছে হাসি।

'ঠিক, তা হলে তো খুবই ভাল হয়,' বলল রানা। 'আমরা

জানব, মারিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে দেয়া হয়েছে উপযুক্ত লোকের হাতেই। আরেকটা কথা, আপনি জোগাড় করবেন আমাদের দরকারী অস্ত্র এবং দুটো ফোর-হুইল-ড্রাইভ ভেহিকেল।'

'সব আছে পাইপলাইনে,' বলল মাইল্স্, 'আগামীকাল দুপুর নাগাদ সব তৈরি পাবেন।' হাতঘড়ি দেখে দিয়ে মারিয়াকে বলল সে, 'এবার যেতে হয়। ওই লোকগুলো অপেক্ষা করছে।'

সবাই উঠে পড়তেই মারিয়াকে বলল রানা, 'সবসময় বড় বিষয় হয়ে ওঠে না পয়সা; কাজেই এমন একজনকে বেছে নেবে, যার আছে খেমার রুয বাহিনীর ওপর রাগ ও ঘৃণা।'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব,' কথা দিল মারিয়া। 'আরেকটা কথা, তাকে কত টাকা সাধব?'

'পাঁচ শ' ডলার।'

'এত কম?'

'তাতেই হবে। বাড়তি দিতে চাইলে, ভাববে, আমরা ওকে নিয়ে যাচ্ছি সুইসাইড মিশনে দরজার দিকে তাকাল রানা। 'আর কাজটা আসলে তা-ই। যদি ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারি, তখন তাকে বোনাস দেব।'

একষট্টি

ক্যামবোডিয়ার স্বাভাবিক লোকের তুলনায় সে দীর্ঘ, সুদর্শন। চোখে বুদ্ধির ঝিলিক। অন্য চারজনের সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ভাল লোক বলে মনে হয়নি মারিয়ার। কিন্তু এই লোক যেন

অন্যরকম। বয়স পঞ্চাশ মত। সতর্ক একটা ভঙ্গি আছে তার ভেতর। চেয়ারে বসে শুভেচ্ছা বিনিময় করল সে। তারপর মনোযোগ দিল মারিয়ার কথা শুনতে।

দু'চার কথা সেরে লোকটার ফাইলে মন দিল মারিয়া।

তার নাম ফল মল। এক সপ্তাহ আগে আত্মসমর্পণ করেছে ক্যামবোডিয়ান আর্মির কাছে। মারিয়ার পাশের চেয়ারে, একটু পেছনে বসে আছে মিস্টার মাইল্‌স্‌। কিছুক্ষণ বুঝতে চাইল স্থানীয় ভাষা, তারপর হাল ছেড়ে দিল। যা খুশি বলুক মারিয়া আর লোকটা।

'কী কারণে আত্মসমর্পণ করলেন?' ক্যামবোডিয়ান ভাষায় জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

'পারিবারিক সমস্যার কারণে।'

'কী ধরনের সমস্যা?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফল মল। 'আপনি ক্যামবোডিয়ার খেমার রুয ইতিহাস জানেন?'

'খুব ভালভাবে নয়,' বলল মারিয়া, 'মোটামুটি জানা আছে।'

'ওরা শুরু করেছিল বুকে কমিউনিযম নিয়ে। তখন আমার মত অনেকেই যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। তাতে ভেঙে গিয়েছিল অনেক পরিবারের বন্ধন। তারপর একসময় সাধারণ নিরীহ মানুষ খুন করতে করতে নরপশু হয়ে গেল খেমার রুয বাহিনী বা পার্টি। পতন হলো তাদের। কিন্তু পরে রাজনৈতিক দলের অর্থনৈতিক ব্যর্থতার কারণে আবারও নানান দিকে জড় হচ্ছে তারা নতুন করে। আবারও চাইছে দেশের ক্ষমতা। আগের মতই আবারও তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে আমার মত শিক্ষিত কেউ কেউ। কিন্তু কিছু দিনের ভেতর বুঝে যাচ্ছে, শিক্ষিত মানুষকে খুন করার ভ্রান্ত নীতি থেকে সরে আসেনি তারা। কিছু দিন আগে খেমার রুয এক জেলখানায় দেখলাম আমার ভাইকে, বন্দি। ওর সঙ্গে কথা বলার

সুযোগ ছিল না। বড্ড দেরি হয়ে গেছে তখন। হতবাক হয়ে দেখলাম, এক মহিলা অফিসার নির্দেশ দিতেই আমার ভাই আর কয়েকজন শিক্ষিত বন্দির ওপর গুলি চালাল অশিক্ষিত সৈনিকরা। একজনকেও বাঁচতে দেয়নি তারা। এরপর খেমার রুয বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব বলে মনে করিনি।'

এসব শুনে চমকে গেছে মারিয়া। পাশে তাকাল। নির্বিকার চেহারায় বসে আছে মাইল্স্। কিছুই বুঝতে পারেনি। নিচু স্বরে বলছে ক্যামবোডিয়ান। মনে হলো, কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণ করতে কষ্ট হচ্ছে তার।

'এমন রয়েছে কমপক্ষে আরও একহাজার শিক্ষিত বন্দি। তাদেরকে দিয়ে মাইন পরিষ্কার করাচ্ছে তারা। বিস্ফোরিত হচ্ছে মাইন, মরছে ওরা। বা গুলি করে মারা হচ্ছে। আমার ভাইকে মরতে দেখেছি নিজ চোখে। গুলি করে মেরেছে কুকুরগুলো ওকে।'

'বাধা দেয়ার চেষ্টা করেননি?' জানতে চাইল মারিয়া।

মাথা নাড়ল লোকটা। 'কিছুই করার ছিল না। আমার ভাই কাজ করত ক্যামবোডিয়ান আর্মিতে। তারা যদি জানত আমি কে, দেরি না করে আমাকেও মেরে ফেলত।'

'খুনের ওই নির্দেশ দিয়েছিল এক মহিলা?'

'হ্যাঁ, স্থানীয় কমাণ্ডার সে। ওই এলাকার ভাষা অনুযায়ী, তার ডাকনাম: টালিয়ান। অর্থাৎ, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সাপ। বিদেশিরা ওই সাপকে বলে গোক্ষুর। আরেকটা নাম আছে। বর্ণসংকর সে। অর্ধেক খেমার, অর্ধেক মোঙ্গল-আমেরিকান।'

'নাম কী তার?'

'নাম দায়না বেলগুতাই।'

শিরশির করে উঠল মারিয়ার মেরুদণ্ড। হয়ে উঠেছে সতর্ক। কী যেন বলতে গেল মাইল্স্, কিন্তু হাত তুলে তাকে বাধা দিল

মারিয়া। ক্যামবোডিয়ানকে বলল, ‘তা হলে সে-ই খুন করতে বলেছে আপনার ভাইকে?’

‘জী। আরও অনেককে মেরে ফেলেছে। তার কাছে মানুষ খুন করা গাছের পাতা ছেঁড়ার মত। টালিয়ানের চেয়ে বড় অশুভ কাউকে কখনও দেখিনি।’

আবারও ফাইল দেখল মারিয়া। ‘আপনি এসেছেন পুরসাত শহর থেকে?’

‘জী।’

‘ভাল করেই চেনেন কার্ডামম এলাকা?’

‘জী।’

‘টাক লুইয়ে শহর চেনেন?’

‘জী। গত কয়েক মাস ছিলাম ওখানে।’

বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলল মারিয়াঃ ‘আপনি যদি দেখেন টালিয়ান বা দায়না বেলগুতাইকে খুন করা হচ্ছে, বা বন্দি করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কী করবেন?’

সামনে ঝুঁকে জবাব দিল ক্যামবোডিয়ান, ‘সেজন্য নিজের জীবন দিতেও আপত্তি নেই আমার!’

মাইলসের দিকে চেয়ে বলল মারিয়া, ‘ঠিক আছে, আমার মনে হচ্ছে এই লোকের সি.ভি. যথেষ্ট ভাল। আশা করি একে দিয়ে কাজ হবে।’

বাষট্টি

'আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি,' আবারও বলল মারিয়া।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিরক্তি দূর করতে চাইল রানা। একই কথা আবারও তুলেছে মারিয়া। ঝুঁকির দিকটা মোটেও দেখছে না। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'তোমাকে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

'কারণ আমি একজন মেয়ে, তাই না?' তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল মারিয়া। উঠে বসে পিঠে বালিশ ঠেস দিল, গম্ভীর হয়ে গেছে মুখ।

রানার বেডরুমে শুয়ে ছিল প্রেমিকের বুকে মাথা রেখে। একটু আগে স্বর্গ থেকে ঘুরে এসেছে দু'জন, সম্পূর্ণ তৃপ্ত।

'তুমি মেয়ে সেজন্যে মানা করছি না,' বলল রানা, 'যে কাজে যাব, তাতে ট্রেনিং নেই তোমার। ওখানে মস্ত বিপদ হতে পারে। হয়তো তোমার কারণে বিপদে পড়বে দলের আর সবাই। আগামীকাল ব্যাংককে এই একই তর্কে জড়াতে হবে। মানতে চাইবে না পিটার। তখনও এই একই জবাব দেব। আমরা যারা যাব, সবাই বহুবার লড়াই করেছি পরস্পরের পাশে দাঁড়িয়ে। বেঁচে আছি কারণ, কী করতে হবে আর কী করা চলবে না, তা আমরা সবাই জানি। আমাদের ভেতর ব্যাপারটা অনেকটা টেলিপ্যাথির মত। প্রায় কোনও নির্দেশই দিতে হবে না আমাকে। কী করব, তা ওরা ভাল করেই জানে। তুমি বা পিটার সঙ্গে এলে

তোমাদের ওপর চোখ রাখতে হবে আমাদের দু'জনকে। অথচ প্রত্যেকের যার যার কাজ আছে, নইলে সবাই মিলে মস্ত বিপদে পড়ব।'

'মাইল্‌স্ যেতে পারে আমার ওপর চোখ রাখার জন্যে।' অভিমানের কারণে ঢোক গিলল মারিয়া।

মৃদু হাসল রানা। 'সেক্ষেত্রে তোমাদের তিনজনের ওপর চোখ রাখতে গিয়ে থাকবে আমার দলের তিনজন। অথচ, সঙ্গে সেনাবাহিনী নেই। আমরা মাত্র চারজন। বহুবার পাশাপাশি লড়েছি, বুঝতে পারি পরস্পরের মুভ।' মারিয়ার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বলল রানা, 'প্রথম থেকেই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ছিলে। এ দেশের বা ভিয়েতনামের ভাষা জানা বন্ধু তুমি, তোমার কারণে বহু সুবিধা পেয়েছি। কাজে এসেছে তোমার কানেকশন। তোমাকে ছাড়া এত দূর এগোতেই পারতাম না। আর ব্যাংককে যাওয়ার পরেও তোমার সাহায্য লাগবে। কিন্তু একবার সীমান্ত পেরিয়ে ওই গ্রাম বা প্যাগোডার দিকে গেলে, সম্পূর্ণ এক আলাদা জগতে পা রাখতে হবে আমাদের। কখনও বসে থাকতে হবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লড়তে হবে দরকার হলে। কখনও ঝড়ের গতি তুলে এগোতে হবে। পিটার বা তোমার জন্যে এসব সহজ হবে না। কাজটা শেষ করতে হবে মাত্র একরাতের ভেতর। ওই এলাকা থেকে বেরোতে হবে ভোর হওয়ার আগেই। সীমান্তে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে তুমি, পিটার আর মাইল্‌স্। তোমাকে ছোট করে দেখছি না। প্রথম থেকেই জরুরি ভূমিকা রেখেছ। বিশেষ করে ফল মলকে খুঁজে বের করা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর ওপর নির্ভর করছে আমরা সফল হব, না অসফল। ...ভাল কথা, টাকা নিতে রাজি হয়েছে সে?'

'হ্যাঁ। বলেছে, টাকাটা কাজে আসবে। এখনও বেঁচে আছে তার বাবা ও দুই বোন। ওই টাকা পেলে একবছর চলে যাবে

তাদের। মন্দার ভেতর ক্যামবোডিয়ার কারও অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়।'

মাথা দোলাল রানা। 'আরও বহু দিন এই মন্দা চলবে। আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে এলে দেখব, ফল মলের পরিবারকে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা দেয়া যায় কি না। সেক্ষেত্রে কয়েক বছর চলবে তাদের।'

'ভাষার ব্যাপারটার কী হবে? ওই এলাকায় গিয়ে...'

'সমস্যা হবে না। তুমি তো বলেছ ফল মল খানিকটা ফ্রেঞ্চ ভাষা জানে।'

'হ্যাঁ, জানে, কিন্তু যথেষ্ট নয়।'

'তাতেই চলবে,' বলল রানা। 'দলের সবাই আমরা ফ্রেঞ্চ ভাষা জানি।' মারিয়ার গালে ঠোঁট ঘষল ও। 'আমরা একটু আগে কিছুই করিনি, তাই না?'

'একটু আগে?' বুঝে গেছে মারিয়া।

'হ্যাঁ, আধঘণ্টা আগের কথা।'

'না, কিছুই তো মনে পড়ছে না।'

'আমারও না,' মারিয়াকে বুকে নিয়ে শুয়ে পড়ল রানা। আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল দু'জন।

তেষট্টি

কখনও এই শহরটাকে পছন্দ হয়নি রানার।

অদ্ভুত এক শহর। নিজ দেশে যেসব বুড়ো, মোটা ও কদর্য

জার্মান, ইংরেজ বা ফ্রেঞ্চ লোকলজ্জার কারণে নারীদেহ থেকে বঞ্চিত, তারাই আসে এ শহরে। পয়সার বদলে কিনে নেয় তরুণী দেহ। জাম্বো জেট বিমান থেকে নেমে নিজেকে ভাবে, সে হয়ে উঠেছে নায়ক টম ক্রুয।

'আসলেই পতিতার শহর,' সায় দিল রেমারিক।

'এমন হয়েছে, কারণ সপ্তাহের ছুটির দুটো দিন আমেরিকান জিআইরা আসছে পকেট ভরা টাকা নিয়ে। সেই সঙ্গে আছে বুমিং ট্যুরিযম।'

মাথা দোলাল রেমারিক। 'তাই আসলে। একরাতের জন্যে হামবুর্গ বা লণ্ডনের উঁচু মহলের কোনও পতিতালয়ে যেতে হলে বহু টাকা দিতে হবে জার্মান বা ইংরেজকে। কিন্তু ওই একই খরচে এ দেশে কাটাতে পারবে দু'সপ্তাহ। পিডেফাইলরা আসছে ছুটি কাটাতে, এরচেয়ে ফুর্তির জায়গা আর নেই।'

'তবে নারী বা পুরুষকে দোষ দেব না,' বলল রানা। 'দোষ দিতে হলে দেব সরকারের পেটমোটা অফিসারগুলোকে। বেশিরভাগ ম্যাসাজ পার্লার বা পতিতালয়ের মালিক বড় বড় সব জেনারেল বা সরকারী কর্মকর্তা। তাদের কাছ থেকে টাকার ভাগ পাচ্ছে রাজনৈতিক নেতারা। অবাক করা এক দেশ। যা আয় করে তার তিনভাগের একভাগ আসে সেক্স ট্যুরিযম থেকে।'

কয়েক সারি গাড়ি ও ট্রাকের পেছনে আটকা পড়েছে রানা ও রেমারিকের ট্যাক্সি। অনেকক্ষণ ধরে শামুকের গতি তুলে সামনে বাড়ছে। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল ওরা। তারপর নতুন প্রসঙ্গে বলল রানা, 'কপাল ভাল যে ওই প্রাক্তন খেমার রুয সৈনিকের সঙ্গে আলাপ করেছে মারিয়া। ফল মল আমাদের জন্যে হয়ে উঠতে পারে খাঁটি রত্ন। অন্য কেউ হয়তো সামান্য টাকার লোভে ফেলে দিত ফাঁদে। খেমার রুয পার্টি বা আর্মির ওপর আছে ওর রাগ ও ঘৃণা। ঠিক লোক বাছাই করেছে মারিয়া।'

চুপ থাকল রেমারিক, চেয়ে আছে ভিড় ভরা ফুটপাথের দিকে। কিছুক্ষণ পর মুখ ঘুরিয়ে রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ওর প্রেমে পড়েছ?'

গাড়ি এগিয়ে গেল কয়েক ফুট। কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে বলল রানা, 'তা নয়। খুব সুন্দরী কিন্তু বুদ্ধিমতী। বুঝে গেছে, আমরা পরস্পরকে পছন্দ করলেও দু'জনের চলার পথ আলাদা।'

'কাছাকাছি হয়েছ?'

'যতটা নিরাপদ মনে হয়েছে,' হাসল রানা।

'অর্থাৎ অনেক কাছে। খুব ভাল মেয়ে। ঠকবে না তুমি।'

'মারিয়া তো ঠকে যেতে পারে, সেদিকটা ভাবছ না?'

'না। তোমাকে চিনি। সব না জানিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়ার লোক তুমি নও।'

'মাইলসের মত কাউকে বিয়ে করলে অসুখী হবে না,' মন্তব্য করল রানা।

'নিরাপদ পেশা নয়,' মাথা নাড়ল রেমারিক, 'হাজার হোক সিআইএ এজেন্ট।'

দ্বিমত পোষণ করল রানা। 'সিআইএর হাউস এজেন্ট। ওর চেয়ে অনেক বিপদে থাকে ব্যাংকের ম্যানেজার। মারিয়ার জন্যে প্রাণ দিতেও আপত্তি নেই মাইলসের।'

'ওটাই ওর সমস্যা,' বলল রেমারিক, 'দেখিয়ে ফেলেছে বেশি আগ্রহ। চুপচাপ, কঠোর মানুষ পছন্দ করে মেয়েরা।'

ওদের ট্যাক্সি ঢুকে পড়ল ডুসিট থানি হোটেলের এণ্ট্র্যান্স দিয়ে। গাড়ি থেমে যেতেই হালকা দুটো ব্যাগ হাতে নেমে এল রানা-রেমারিক। আগেই ওদের জন্যে বুক করা হয়েছে পাশাপাশি দুটো রুম।

রানা বসে আছে সোফায়, হাতে টাইগার বিয়ার। দরজায় টোকা

পড়তেই চলে গেল কবাটের পাশে। আস্তে করে খুলে দিল দরজা। বিপদের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

ঘরে পা রেখেই বলল মারিয়া, 'এইমাত্র এলাম এম্বাসি থেকে।'

'নতুন কোনও ডেভেলপমেন্ট?' দরজা বন্ধ করে দিল রানা। হাতের ইশারা করল সোফায় বসতে। নিজেও বসল মুখোমুখি সোফায়।

'চার্লস মাইল্স্ সবই জোগাড় করেছে,' বলল মারিয়া, 'দুটো মিটসুবিশি শোগান। এদিকে ওয়াশিংটনে বসের সঙ্গে কথা বলেছি। সমস্ত খরচ বহন করবে আমাদের ডিপার্টমেন্ট। হোটেলের বিল বা স্থানীয় সব খরচ। আজ রাতে জাপানে ইউএস বেসে পৌঁছবে তোমাদের আর্মস্ আর ইকুইপমেন্ট।'

'উযি ম্যানেজ করা গেছে?' জানতে চাইল রানা। 'বিশেষ করে দরকার রেমারিকের জন্যে।'

'না, পাওয়া যায়নি,' স্কার্টের পকেট থেকে সরু লিস্ট বের করল মারিয়া, 'ওরা পাঠাচ্ছে পাঁচটা কোল্ট এক্সএম১৭৭ইযেড সাবমেশিন-গান। ওগুলো গ্রেনেডও লঞ্চ করে।'

মাথা দোলাল রানা। 'ভাল অস্ত্র। নাইট ভিশন?'

'সবই আসছে। তোমাদের প্রস্তুতি?'

'ওই বিষয়ে কাজ করছে রেমারিক, আগামীকাল রাতের জন্যে প্যাটনোং ক্লাব থেকে ভাড়া করেছে সেসনা। ওরাই পাইলট দেবে। রেমারিক এখন গেছে স্পোর্টস্ শপ থেকে প্যারাশ্যুট কিনতে। ওখানকার কাজ শেষ হলে যাবে এক দর্জির দোকানে। আমাদের গাইড ফল মলের জন্যে লাগবে খেমার রুয ইউনিফর্ম। কোথাও থামানো হলে বলবে, আমরা মার্সেনারি। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে দায়না বেলগুতাই। এহেরেন্সের মতই আমাদের কাজ মাইন সরিয়ে দেয়া। আগামীকাল মাঝরাতে রওনা হব ট্র্যাট

গ্রাম থেকে। কয়েক মাইল গেলেই সীমান্ত। মাঝরাতের আগেই লোকজন নিয়ে আকাশে চোখ রাখবে দায়না বেলগুতাই। ওই প্যাগোডার এক মাইল দূর দিয়ে যাবে সেসনা। তাতে দায়নার মনে হবে, পৌঁছে গেছি আমরা।'

চৌষট্টি

সন্ধ্যা ছয়টায় কির-কির আওয়াজ তুলে বেজে উঠল দায়না বেলগুতাইয়ের স্যাটালাইট ফোন। রিসিভ করে পুরো দু'মিনিট কথা শুনল সে, তারপর বিজয়িনীর দৃষ্টিতে কুয়েন আন টুর দিকে চেয়ে বলল, 'গোটা ব্যাপারটা দাবা খেলা। চেক দেয়ার জন্যে ঘুঁটি সরিয়ে নিয়েছে রানা।'

'তা হলে সে এখন ব্যাংককে?'

'হ্যাঁ, ডুসিট থানি হোটেলে। ওখানেই বসে ছিল সারাদিন। কিন্তু তার বন্ধু ভিটেলা রেমারিক ছিল ব্যস্ত। ভাড়া করেছে হালকা এয়ারক্রাফট। আগামীকাল মাঝরাতে রওনা হবে। শুধু তাই নয়, দুটো প্যারাশ্যুটও কিনেছে।' আকাশের দিকে তাকাল দায়না।

'আবহাওয়া ভাল থাকবে,' বলল কুয়েন আন টু, 'চাঁদ থাকবে সারারাত। আমরা অপেক্ষা করব ওদের জন্যে।'

প্যাগোডার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা দু'জন। বাইরের দিকে আট ফুট উঁচু দেয়াল। প্রাচীন পাথর দিয়ে কারুকাজ করা মন্দির। আগে এমন ছিল না। এসব কারুকাজ পরে আনা হয়েছে বিখ্যাত প্যাগোডা আংকর ওয়াট থেকে। প্যাগোডার ভেতর পা রাখল

দায়না। কয়েক সেকেণ্ড পর ওর পিছু নিয়ে ঢুকল কুয়েন আন টু।

মন্দিরের ভেতর ফাঁকা। আছে শুধু মেঝে থেকে পাঁচ ফুট উঁচু মার্বেলের এক বেদি। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে আট ফুট। ওটার ওপর স্তূপ করে রাখা হয়েছে শুকনো কাঠ। জীবনে প্রথমবারের মত এই প্যাগোডার ভেতর পা রেখেছে কুয়েন আন টু। কালো মার্বেলের মেঝে ও বেদি দেখল। বেদির দু'পাশে দায়নার সেই কালো পোশাকধারী দুই সশস্ত্র মহিলা। কোমরের হোলস্টারের পিস্তল ছাড়াও কাঁধের স্লিং-এ ঝুলছে একে-৪৭ রাইফেল।

বেদির সামনে থেমে বলল দায়না, 'এই প্যাগোডায় রাখা আছে আমার বাবার পবিত্র ছাই। গতবছর সরিয়ে এনেছি হংকং থেকে। তখন থেকে এখানেই ঘুমাচ্ছেন বাবা।'

চুপ করে থাকল কুয়েন আন টু। তার মনে পড়ল, জন বেলগুতাইয়ের কারণেই প্রাণে বাঁচতে পেরেছিল। কয়েক সেকেণ্ড থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকল সে, তারপর বাউ করল মার্বেলের বেদির উদ্দেশে। মাথা উঁচু করে দেখল দায়নাকে। খুব শান্ত দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। ইশারা করল সে কাঠের চিতার দিকে। বেদির ওপর ওটার উচ্চতা দু' ফুট।

'এখানেই পুড়বে মাসুদ রানা,' বলল দায়না। 'যে যুবককে উদ্ধার করতে আসছে, সে-ও। চিতার পাশে বেঁধে রাখব আগামীকাল সন্ধ্যায়। ওরা দু'জন পুড়ে মরবে আমার বাবা যেমন পুড়েছিল। ওদেরও হতে হবে ছাই। তবে মরবে খুব ধীরে ধীরে। ভাল করেই জানবে রানা, কেন মরছে। এরপর এই প্যাগোডায় আসার সব পথ মাইন দিয়ে বুজে দেবে এহেরেন্স। কাজটা শেষ হলে মেরে ফেলব ওকেও। চিরকালের জন্যে প্রশান্তি নিয়ে বিশ্রাম নেবে বাবার আত্মা।'

মার্বেলের বেদিতে রাখা উঁচু কাঠের চিতার দিকে তাকাল কুয়েন আন টু। মনের চোখে দেখল, ওখানে বেঁধে রাখা হয়েছে

রানাকে, কথা শেষ করে মশালের কাঠে আগুন দেবে দায়না। দাউ-দাউ শিখার আঁচ লাগতেই তীব্র ব্যথায় ছিটকে সরে যেতে চাইবে রানা। কী দারুণই না হবে! কুয়েন আন টু টের পেল, শিরার ভেতর দৌড়াচ্ছে অ্যাড্রেনালিন। খুশি চেপে জিজ্ঞেস করল সে, 'এখানে কতজন সৈনিক রাখবে?'

দুই বডিগার্ডকে দেখাল দায়না। 'শুধু ওরা দু'জন। এ ছাড়া তুমি আর আমি।'

www.boighar.com

এতই অবাক হয়েছে যে কথা বলতে গিয়ে স্বর ভেঙে গেল কুয়েন আন টুর। প্রায় হাউমাউ করে উঠল। 'শুধু আমরা চারজন? দায়না! তুমি তো জানো ওরা দু'জন কী ধরনের... আমাদের দরকার ছোটখাটো একটা সেনাবাহিনী।'

কুয়েন আন টুর দিকে চেয়ে হাসল দায়না।

ওই দৃষ্টি দেখে বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল কুয়েন আন টুর।

'আমাদের সঙ্গে থাকবে মাত্র আরেকজন সৈনিক,' বলল দায়না, 'খুব দক্ষ সৈনিক সে। তার কথা ভুলেও ভাববে না রানা বা রেমারিক। তার সঙ্গে লড়তে পারবে না ওরা। এসো, কুয়েন আন টু।'

আবারও আঙিনায় বেরিয়ে এল ওরা। লোহার প্রকাণ্ড দরজা দেখিয়ে বলল দায়না, 'বোধহয় দেখোনি, এই গেট এমনভাবে তৈরি, একবার বন্ধ হলে সামান্য ফুটোও থাকে না।' গেটের দু'পাশের দেয়াল দেখাল। 'এটাও দেখো, কত সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে প্লাস্টারের প্রলেপ।'

নতুন করে প্যাগোডার ভেতর ঢুকল দায়না। পেছন পেছন প্রভুভক্ত কুকুরের মত হাঁটছে কুয়েন আন টু। মন্দিরের পাথুরে দেয়ালের ভেতর রয়েছে বেশ কিছু ধাতব গর্ত। আগে খেয়াল করেনি কুয়েন আন টু। প্যাগোডার প্রবেশদ্বারের সামনে গেল দায়না। একপাশে বড় এক ধাতব বাক্স। পকেট থেকে চাবি নিয়ে

বাক্সের তালা খুলে ডালা উঁচু করল। ভেতরে দুটো হাতল। একটা লাল রঙের, অন্যটা সবুজ। লাল হাতলে টোকা দিল দায়না। 'আমি এটা টান দিলে কিছু পাইপের ভেতর দিয়ে বেরোবে এক ধরনের নার্ভ গ্যাস। ওটার নাম অ্যামিটন। ওই জিনিসের সিলিণ্ডার আছে প্যাগোডার নিচে। উনিশ শ' বায়ান্ন সালে ওই জিনিস তৈরি করেছে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা। যদি সঠিক সময়ে অ্যান্টিডোট না দেয়া হয়, মরতে হবে মাত্র কয়েক মিনিটের ভেতর। এই গ্যাস অক্সিজেনের চেয়ে ভারী। চাদরের মত ঝুলবে মেঝের কাছে। দেয়াল টপকে ওদিকে যাবে না। বলতে পারো, তৈরি করব গ্যাসের পুকুর। রানা-রেমারিক নেমে এলেই মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে জ্ঞান হারাবে।'

প্যাগোডার ভেতর পা রাখল দায়না। দূরের দেয়ালে দেখাল এক টেবিল। তার ওপর ছোট বেশ কয়েকটা সিলিণ্ডার। মুখের কাছে রাবারের পাইপ এবং শেষমাথায় মুখোশ। 'ওখানে আছে অ্যান্টিডোট। রানা আর রেমারিক আঙিনায় নেমে এলে কয়েক সেকেণ্ডে জ্ঞান হারাবে। তাদেরকে বেঁধে ফেলার পর দেব অ্যান্টিডোট। জ্ঞান ফিরবে আধঘণ্টা পর। তখন মাসুদ রানাকে মনে করিয়ে দেব, কী কারণে মরছে সে।'

'আমাদের কী হবে?' গলা কেঁপে গেল কুয়েন আন টুর।

তার কাঁধে মৃদু টোকা দিল দায়না। 'ভেবো না। আমাদের পরনে থাকবে প্রোটেকটিভ পোশাক, মুখে গ্যাস মাস্ক।' একটু দূরে পড়ে থাকা কয়েকটা উজ্জ্বল হলদে প্লাস্টিকের ওভারঅল দেখাল। 'আমাদের কিছুই হবে না।' তৃপ্তির শ্বাস ফেলে বলল, 'এহেরেন্স বলেছে, রানা আর রেমারিক পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক। কিন্তু কখনও পারবে না অ্যামিটন নামের এই যোদ্ধার সঙ্গে।'

পঁয়ষট্টি

ব্যস্ত দুই তরুণের কাজ দেখছে সিআইএ এজেন্ট চার্লস মাইল্‌স্‌। তারা নিজেদের কাজে অত্যন্ত দক্ষ। পরীক্ষা করছে সফিসটিকেটেড সব ইলেকট্রোনিক ইকুইপমেন্ট। পনেরো মিনিট ধরে সব পরখ করে দেখার পর চলে এল খুদে কনফারেন্স রুমে। দেখা হলো সিলিং, মেঝে বা আসবাবপত্রের ভেতর ছারপোকা আছে কি না। গজ মনিটর দেখে বুঝল, ওই জিনিস ঘরে নেই। কাজ তাতে শেষ হয়নি। ফোন খুলে প্রতিটি যন্ত্রাংশ দেখল। আবারও ওটা ঠিকঠাক করে রেখে মাইল্‌স্‌কে বলল, 'জায়গা পরিষ্কার। গুবরে পোকা বা কোনও বাড়তি শব্দ নেই।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল মাইল্‌স্‌। 'গুড। তা হলে ওদেরকে জানিয়ে দাও, এখানে যেন কফি পাঠিয়ে দেয়। ওরা বিস্কিট ও কফি দেয়ার পর দরজার বাইরে পাহারা দেবে তোমরা। কেউ যেন ঢুকতে না পারে। আগামীকাল রাত দুটোর সময় আরেকটা কাজ আছে তোমাদের। বিপজ্জনক নয়। হালকা একটা বিমানে চেপে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ঘুরে আসবে। ওই কাজ শেষ হলে ফিরবে সোজা আমেরিকায়।'

ইকুইপমেন্ট গুছিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে ঘর ছাড়ল দুই তরুণ। রাবারের সোলের কারণে কোনও আওয়াজ হলো না। এবার টেবিলের ওপর ভারী ও মোটা ব্রিফকেস রাখল মাইল্‌স্‌। ওটা খুলে বের করল দরকারী বেশ কিছু কাগজ, ফোটো ও মানচিত্র।

নিজের কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। দক্ষিণ-পুব এশিয়ায় আসার পর প্রথমবারের মত পেয়েছে গুরুত্বপূর্ণ মিশন। ভাবেনি ডুসিট থানি হোটেলের ছোট্ট কনফারেন্স রুমে গুবরে পোকা থাকবে। সামনের মিটিঙের জন্যে কেউ রেখে যাবে, তা নয়, থাকতে পারত কারণ ঘণ্টাখানেক আগে এখানে ব্যবসায়ীরা মিটিং করে গেছে। আধুনিক কালে দেখা যাচ্ছে, গুপ্তচরের কাজ করে বেশিরভাগ বড় ব্যবসায়ী। তাদের হাত থেকে এমন কী রক্ষা পায় না সিআইএ-ও। ক'দিন আগে এয়ারবাসের চেয়ারম্যানের অফিসে পাওয়া গেছে গুবরে পোকা। ওটা রেখেছিল বোয়িং করপোরেশনের কর্তৃপক্ষ। ধরা পড়ে এখন মাথা হেঁট হয়ে গেছে তাদের।

এ ঘরে আর সবার আগে হাজির হলো মাসুদ রানা ও ভিটেলা রেমারিক। উষ্ণভাবে করমর্দন করল তিনজন। কিন্তু মাইল্স্ টের পেয়ে গেল, ঘরে ঢুকতেই সব নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নিয়েছে মাসুদ রানা। মুখে যে কিছু বলেছে, তা নয়, আসলে তার উপস্থিতিই যথেষ্ট।

এরপর এল মারিয়া ওয়াকার। পাশে প্রাক্তন খেমার রুয সৈনিক ফল মল। তার পরনে নতুন স্যুট, সাদা শার্ট ও বাদামি টাই। তার সঙ্গে রানা-রেমারিককে পরিচয় করিয়ে দিল মারিয়া। ফ্রেঞ্চ শব্দ ব্যবহার করে দু'চারটা কথা বলল রানা। মাত্র পাঁচ মিনিট আগে ক্যামবোডিয়ান লোকটার হাতে পাঁচ শ' ডলার দিয়েছে মারিয়া। রানার কথা শেষ হওয়ার পর অবাক হতে হলো ওকে। শার্টের পকেট থেকে নোট বের করে ওর হাতে দিয়ে দিল লোকটা।

এর কারণ কী, তা ক্যামবোডিয়ান ভাষায় জানতে চাইল মারিয়া। জবাবে ফল মল বলল, 'এই ভদ্রলোক বলেছেন, আগামীকাল রাতে খুনও হতে পারি। আর সত্যিই যদি খুন হয়ে যাই, উনি কথা দিয়েছেন, এই টাকা ব্যাটামব্যাং-এ আমার

পরিবারের হাতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করেছি। আপনাকেও বিশ্বাস করি।'

টাকা পার্সে রেখে দিল মারিয়া।

রানা মন্তব্য করল, 'যা ভেবেছি, তার চেয়ে অনেক ভাল ফ্রেঞ্চ বলতে পারে।'

কিছুক্ষণের ভেতর পৌঁছল লারসেন ও ফুলজেন্স। ওদের সঙ্গে ঘরে ঢুকল এক সিকিউরিটির লোক। হাতের ট্রেতে কফির পট, কাপ ও বিস্কিট। দশ সেকেণ্ড পর এল সিম কর্নেলিস ও জ্যাঁ মউরোস। কেউ কিছু বলার আগেই ওদেরকে বলল রানা, 'তোমরা শিয়োর তো, পিছু নেয়া হয়নি?'

'নেগেটিভ,' বলল কর্নেলিস, 'এয়ারপোর্টে নামার পর থেকেই চোখ খোলা রেখেছি।'

নিশ্চিন্ত হলো রানা। দুনিয়ার অন্যতম সেরা ট্র্যাকার সিম কর্নেলিস। কেউ পিছু নিলেই টের পেত।

চেয়ার টেনে আয়তাকার টেবিল ঘিরে বসল সবাই। নিজের সামনে কমপিউটার রেখে ওটা চালু করল লারসেন। একটা কাগজ রানার সামনে ঠেলে দিল মাইল্স্।

কাগজটা পড়ে একবার মাথা দোলাল রানা। 'আরপিজি-৭ জোগাড় করে দেয়ায় ধন্যবাদ, মাইল্স্।'

'আরপিজি-৭ কী?' জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

জবাবটা দিল রেমারিক: 'রাশার তৈরি অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক উইপন। এক সময়ে সেরা ছিল।'

'এর চেয়ে ভাল কিছু বেরিয়েছে পরে?' জানতে চাইল মারিয়া।

'হ্যাঁ। অনেক সফিসটিকেটেড জিনিস আছে আমেরিকার হাতে,' বলল রানা, 'সেসব আমাদেরকে দেয়া হয়নি। আশাও করিনি। নিজেদের সেরা জিনিস হাতছাড়া করবে কেন?'

কথাটা শুনে মুখ লালচে হয়ে গেল মারিয়ার। চট্ করে দেখল মাইলসের দিকে। সে মুখ সরিয়ে অন্যদিকে তাকাল।

আড়ষ্ট পরিবেশ কাটাতে বলল রানা, 'মারিয়া, তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো, আমরা কেন সঙ্গে নেব আরপিজি-৭-এর মত জিনিস। আমরা কি ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে লড়তে চলেছি?'

'আসলে ওই জিনিস ওদের কাছে নেই,' বলল রেমারিক। 'কিন্তু আরপিজি-৭ দিয়ে অন্য কাজও করা যায়। উড়িয়ে দিতে পারব ভারী ধাতব দরজা, বড় গেট বা গাড়ি।' চট্ করে রানার দিকে তাকাল রেমারিক। 'রকেট কতগুলো?'

'চারটে, যথেষ্ট।' মাইল্‌স্‌কে দেখল রানা। 'সময় নষ্ট ঠেকাতে চাইলে সংক্ষেপে কর্নেলিস আর মউরোসকে ব্রিফ করুন। ফোটোগুলোও দেখাবেন।'

মাথা দোলাল মাইল্‌স্‌, সামনে বিছিয়ে নিল ফোটো। চেয়ার ছেড়ে তার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখল কর্নেলিস ও মউরোস।

ইকুইপমেন্টের তালিকায় টোকা দিয়ে লারসেনের দিকে তাকাল রানা। 'টাক লুইয়ে থেকে আটচল্লিশ মাইল দূরে ট্র্যাট গ্রাম। এই দূরত্বে ঠিকই কাজ করবে ভিএইচএফ ইকুইপমেন্ট। পরিষ্কার শুনবে রেডিয়োতে কথা। বেস সিকিয়োর করে প্যাগোডার দিকে যাব রেমারিক আর আমি। বাধ্য না হলে যোগাযোগ করব না। আমার মনে হয় না খেমার রুয সৈনিকদের কাছে লিসেনিং ইকুইপমেন্ট আছে। আমি নির্দেশ দেয়ার পর ব্যাংকক থেকে রওনা হবে বিমান।' মাইলসের কথার ভেতর বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'মাইল্‌স্‌, রেমারিক আর আমার বদলে ওই বিমানে উঠবে দু'জন। তাদেরকে জোগাড় করা হয়েছে?'

'জী। আমাদের দু'জন জুনিয়র এজেন্ট। এখন আছে দরজার ওদিকে। পাহারা দিচ্ছে। মিস্টার রেমারিক আর আপনার সঙ্গে মিল আছে ওদের দৈহিক আকারের। রওনা করিয়ে দেয়ার আগে

ভালভাবে ব্রিফ করে দেব।'

কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থাকল রানা মাইলসের দিকে, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। এদিকে ট্র্যাট গ্রামে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে দুটো জিপ আর ইকুইপমেন্ট?'

'জী। আঙিনা সহ সেফ হাউস ভাড়া করা হয়েছে, ওখানে আগে থেকেই তৈরি থাকবে সব।'

'গুড। সবাই জড় হবে এমন একটা সেফ হাউস লাগবে ব্যাংককেও। ওখান থেকে ট্র্যাটের দিকে রওনা হব আমরা।'

সন্তুষ্টি নিয়ে মাথা দোলাল মাইল্স্। 'সেসব আগেই ঠিক করে রেখেছি। জানেনই তো, মিস্টার রানা, এসব কাজে ভুল করে না আমাদের অর্গানাইযেশন।'

মাথা দুলিয়ে চট্ করে রেমারিককে দেখল রানা।

'ছোট যে-কোনও দেশের চেয়েও অনেক বেশি বাজেট হাতে পেলে যা খুশি করা যায়,' মন্তব্য করল রেমারিক।

গম্ভীর হয়ে গেল মাইল্স্ ও মারিয়া।

'মিশনের বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ করা যাক,' বলল রানা।

পরবর্তী দু'ঘণ্টা প্রতিটি দিক খুঁটিয়ে দেখল ওরা। এত সূক্ষ্ম সব বিষয় এল, হতবাক হয়ে গেল মারিয়া। আগে ওর ধারণা ছিল, একদল লোক অস্ত্র হাতে হামলা করবে, তাতে অত ভাবার কী আছে! আজ চোখ খুলে গেল ওর। কর্নেলিস, মউরোস ও ফুলজেন্স কখনও কখনও পরামর্শ দিল রানাকে। দলের নেতা রানা, কিন্তু প্রয়োজন পড়লে তর্ক করতে দ্বিধা করল না অন্যরা। কারও কথা উড়িয়ে দেয়া হলো না। রানা বুঝিয়ে বলল, কী কারণে কী করতে হবে। এক পর্যায়ে মউরোস বলল, উচিত হবে দু'জন না গিয়ে তিনজন প্যাগোডায় হামলা করলে। তাতে মাথা নাড়ল কর্নেলিস। জানাল, সবসময় পাশাপাশি লড়াই করেছে রানা ও রেমারিক। তৃতীয় কেউ ওদের সঙ্গে গেলে সুবিধার বদলে

ঝামেলাই বাড়বে। কর্নেলিস বলল, 'যে কাজ করতে পারে তিনজন, ওই কাজ রানা-রেমারিক অনায়াসেই সামলে নেবে।'

মাঝে মাঝে ফল মলকে আলোচনায় টেনে আনলে দেখা গেল, সমান গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে তাকে। মস্তবড় এক মানচিত্র ও এরিয়াল ফোটোর ওপর ঝুঁকে নানান দিক দেখল ওরা। ক্যামবোডিয়ান ফল মল পরামর্শ দিল, কোন্ পথে গেলে বিপদ কম হবে।

মিটিং শেষ হবে, এমন সময় নিচু স্বরে ফ্রেঞ্চ ভাষায় রানাকে কী যেন বলল ফল মল। তারপর তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল আমেরিকান এম্বাসি থেকে আসা সিকিউরিটির এক লোক।

'কী বলল সে?' জানতে চাইল মারিয়া।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা, 'জিজ্ঞেস করেছে, প্যাগোডা থেকে ওর জন্যে এনে দিতে পারব কি না দায়না বেলগুতাইয়ের মাথাটা। ...ভাল লোকই বাছাই করেছ, মারিয়া।'

বাথরুমের দিকে পা বাড়াতেই ক্রিং-ক্রিং শব্দে বেজে উঠল ফোন। ফিরে এসে রিসিভার তুলল মারিয়া।

কল করেছে রানা। সরাসরি কাজের কথায় এল। 'আজ আমার সঙ্গে ডিনার করতে হবে।'

'এটা কি অর্ডার, না অনুরোধ?' একটু রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করল মারিয়া।

'অর্ডার,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা, 'তোমার সঙ্গে আলাপ আছে আগামীকালের অপারেশনের ব্যাপারে।'

'ওটাই না করা হলো দু'ঘণ্টা আগে?'

'হ্যাঁ, তবে এবার আলাপ করব তিরিশ সেকেণ্ডের জন্যে।'

'তারপর কী করব আমরা?'

'ডিনারের পর আমরা যা করি না, সেসব করব না।'

লাল হয়ে গেল মারিয়ার গাল। 'ঠিক আছে। কখন আর কোথায় ডিনার?'

'চলে এসো আটটার সময় বার-এ।'

'ঠিক আছে।'

ফোন রেখে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল মারিয়া। দরজার কাছে চলে গেছে, এমন সময় আবারও বেজে উঠল ফোন। ফিরে এসে রিসিভার তুলল মারিয়া।

এবারের কল মাইলসের। মধু-মিষ্টি কণ্ঠে বলল সে, 'ভাবছিলাম, আপনার যদি অন্য কোনও কাজ না থাকে, আমার সঙ্গে যাবেন ডিনারে?'

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে এক সেকেণ্ড ভাবল মারিয়া, তারপর নরম সুরে বলল, 'মাইল্‌স্‌, খুশি হতাম আপনার সঙ্গে ডিনারে যেতে পারলে। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না। আগামীকাল রাতের অপারেশনের বিষয়ে আলাপ করবেন মিস্টার রানা। একটু আগে যোগাযোগ করেছিলেন তিনি।'

'সব কথা না ঠিকঠাক হয়ে গেল?' হতাশ সুরে বলল মাইল্‌স্‌।

চট্‌ করে জবাব দিল মারিয়া, 'প্রায় সবই ঠিক, কিন্তু আরও কিছু বিষয়ে আলাপ করবেন। ওই দলের কারও কিছু হলে তার পরিবারের কাছে কী বলতে হবে, সেসব জানাবেন। বুঝতেই তো পারছেন, মাইল্‌স্‌, ছয়জন লোক চলেছে খেমার রুয এলাকায়। জান নিয়ে না-ও ফিরতে পারে। রানা চাইছেন, কারও কিছু হলে যেন তার পরিবারকে সব গুছিয়ে বলা হয়। তাদের ক্ষতিপূরণের কথাও আসবে আলাপের ভেতর।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মাইল্‌স্‌, তারপর মেনে নেয়ার সুরে বলল, 'হ্যাঁ, তা উনি চাইতেই পারেন, দয়ালু মানুষ মিস্টার রানা।'

'ওই ডিনার রেইন-চেক থাকুক,' পুরো হতাশ করল না মারিয়া।

'সত্যি বলছেন?' প্রায় গলে গেল মাইল্স্।

'নিশ্চয়ই! সকালে দেখা হবে আপনার সঙ্গে।' ফোন রেখে বাথরুমে এসে শাওয়ার ছাড়ল মারিয়া।

www.boighar.com

ছেষট্টি

ভোরে ব্যাংকক শহর পেছনে ফেলল ওরা। মিনিবাসে চেপে চলেছে দক্ষিণ দিকে। পুরো তিনঘণ্টা চলার পর থামল স্যাট্টাহিপ শহরের'বাইরে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হোটেল থেকে আনা স্যাণ্ডউইচ ও গরম কফি খেয়ে নিল ওরা। ছয়জন, সঠিক সময়ে পেরিয়ে যাবে ক্যামবোডিয়ান সীমান্ত। মিনিবাসের ভেতর বসে থাকল মারিয়া, মাইল্স্ ও এম্বাসি থেকে আসা ড্রাইভার।

'একবারও মনে হচ্ছে না এরা কেউ উত্তেজিত,' মন্তব্য করল মাইল্স্। 'অথচ তেমনই হওয়ার কথা। এমন কী ফল মলকেও মনে হচ্ছে শান্ত। ভাল করেই জানে, কোথায় যাচ্ছে, আর কী হতে পারে। ওকে যদি ধরতে পারে খেমার রুষ বাহিনী, খুব কষ্ট দিয়ে মারবে।'

ক্যামবোডিয়ানের দিকে তাকাল মারিয়া। রেমারিকের কথা শুনে হাসছে ফল মল।

'ওরা আলাপ করছে কীভাবে, ভাষাই তো জানে না,' বলল মাইল্স্।

‘ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলছে। ওই ভাষা ভালভাবেই জানে মিস্টার রেমারিক।’

গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, হাতে কফির মগ।

‘আলাপ করে শক্ত জোট বাঁধছে,’ বলল মারিয়া। ‘নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে ফল মলকে। নিজেকে অন্যদের সমানই ভাবছে লোকটা। দলের যে-কারও বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আচ্ছা, তা হলে এভাবে দল তৈরি করে রানা। ও দলের নেতা, কিন্তু খেয়াল না করলে বোঝার উপায় নেই। সবার অধিকার সমান। একজন আরেকজনের ওপর নির্ভর করছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে, তাই মনে কোনও দ্বিধা নেই। যেন বারো বছরের একদল ছেলে। বাড়বে না ওদের বয়স। যা করবে, একইসঙ্গে।’

হাসল মাইল্‌স্‌। ‘কিন্তু ওরা যাচ্ছে যুদ্ধে! অবশ্য ঠিকই বুঝেছেন, মারিয়া, ওরা দলের কাউকে বিপদে ফেলে লেজ তুলে পালাবার লোক নয়।’

কফি শেষ করে আবারও মিনিবাসে উঠল সবাই। উপকূল সড়ক ধরে পুবে চলল ড্রাইভার। ডানদিকে দেখা গেল থাই উপসাগরের সুনীল জল।

অনেকক্ষণ পর থামল ওরা কলাগাছ দিয়ে ঘেরা এক সেফ হাউসে। বাইরে ও ভিতরে নানান বড় গাছ। বাড়ি ঘিরে রেখেছে উঁচু দেয়াল। পেছনের দিকে রাখা হয়েছে দুটো শোগান জিপ, কুচকুচে কালো রঙের। পাশে মিনিবাস থামতেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বয়স্ক এক দম্পতি, মুখে হাসি।

‘এঁরা কারা?’ মাইলসের কাছে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘সিআইএর হয়ে কাজ করেন,’ বলল মাইল্‌স্‌। ‘নিজেদের নাম বলবেন না, তবে তিরিশ বছর ধরে ভদ্রলোক আমাদের কভার্ট এজেন্ট। চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।’

মস্তবড় এক ঘরে ঢুকল ওরা। ছাতে ঝুলছে একটা মাত্র ফ্যান,

ঘুরছে। ওটার নিচে দীর্ঘ টেবিল। ওদিকে চেয়ে বিব্রত বোধ করল মারিয়া। টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখা হয়েছে নানান অস্ত্র। সাবমেশিন-গান, পিস্তল, বাড়তি ম্যাগাযিন, ছোরা, গ্রেনেড, কালো ইউনিফর্ম, ওয়েবিং ও ফ্ল্যাক জ্যাকেট। টেবিলের একমাথায় কালো রকেট লঞ্চার ও চোখা চেহারার রকেট। মারিয়ার মনে পড়ল, অনেকক্ষণ আগে মাইল্‌স্‌কে বলা ওর কথা। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে, এই দলের লোকেরা বারো বছরের বালক নয়। ওরা চলেছে যুদ্ধে। এটাই কঠোর বাস্তব।

মনে হচ্ছে না রানার দলের কেউ বিন্দুমাত্র চিন্তিত। টেবিল ঘিরে নেড়েচেড়ে দেখছে অস্ত্র। দু'চার কথায় মন্তব্য করছে অস্ত্রের ব্যাপারে। একটা সাবমেশিন-গান তুলে নিল রানা, ফ্রেঞ্চ ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করল ফল মলকে। জবাবে মাথা নাড়ল প্রাক্তন খেমার রুয সৈনিক।

তার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে রেমারিককে বলল রানা, 'ফল মল শুধু একে-৪৭ চালাতে পারে। ওকে দেখিয়ে দাও কীভাবে গুলি করতে হবে, বা সরাতে হবে ম্যাগাযিন।' মউরোস ও কর্নেলিসের দিকে তাকাল রানা। 'এই জিনিস ব্যবহার করেছ?'

মাথা দোলাল ওরা দু'জন। পেঁচার দিকে তাকাল কর্নেলিস। মাথা নাড়ল ফুলজেন্স। 'ওই জিনিস ব্যবহার করিনি। লাগবে না। ব্যবহার করব শুধু এমএবি পিস্তল।'

রকেট লঞ্চার তুলে নিয়ে মাথা দোলাল রানা। টিউব খুলতে খুলতে বলল, 'মডেল ডি। ক্যারি করা সহজ।' মউরোসের দিকে তাকাল। 'তুমি মেকানিক, চেক করে দেখো জিপের ইঞ্জিন। ততক্ষণে অস্ত্রগুলো খুলে পরীক্ষা করছি আমরা। তারপর কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেব।' একবার হাতঘড়ি দেখে নিয়ে মাইলসের দিকে তাকাল রানা। 'সন্ধ্যা সাতটের আগেই খেয়ে নিতে চাই।'

'সমস্যা নেই,' থাই মহিলার দিকে ইশারা করল মাইল্‌স্‌।

'এঁর দায়িত্বে থাকে ব্যাংককের সেফ হাউস। আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, দারুণ রাঁধুনিও ইনি।'

গোল মুখের ছোটখাটো মহিলার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, ভালভাবেই বুঝতে পারছেন ইংরেজি। মিষ্টি করে হেসে বললেন, 'আপনারা কি স্টেক খাবেন, না থাই খাবার?'

দলের সবার ওপর দিয়ে ঘুরে এল রানার চোখ।

শুধু কর্নেলিস চাইল স্টেক।

'শিংওয়ালা কিছু না পেলে ওর চলে না,' মন্তব্য করে আরেকবার হাতঘড়ি দেখল রানা। 'ফল মল বলেছে, চার ঘণ্টা লাগবে ট্র্যাট গ্রামে পৌঁছুতে। কাজেই আমাদের ইটিডি হবে সাড়ে আটটা।' টেবিল থেকে ভিএইচএফ রেডিয়ো তুলে নিল ও। জিনিসটা আকারে মোবাইল ফোনের অর্ধেক। ওটা মাইলসের হাতে দিয়ে বলল রানা, 'আপনি মিনিবাস নিয়ে পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে যোগাযোগ করুন। আশা করি তাতেই বোঝা যাবে, ট্র্যান্সমিশন ঠিক আছে কি না। আপনার কোড নেম "এম"। এই বাড়ি হচ্ছে "বি"। সংক্ষিপ্ত ট্র্যান্সমিশন দেবেন।' টেবিল থেকে সবুজ একটা ইউনিফর্ম তুলে নিল রানা। ওটার সঙ্গে আছে চূড়াওয়ালা হ্যাট। ফল মলের হাতে পোশাক ও হ্যাট ধরিয়ে দিল ও। ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল, 'একরাতের জন্যে আবারও খেমার রুয বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন।'

ইউনিফর্মটা গম্ভীর চেহারায় দেখল ফল মল। আস্তে করে মাথা দোলাল। 'জীবনে শেষবারের মত।'

সাতষট্টি

ডিনার শেষ করে দেরি না করে কালো ইউনিফর্ম পরে নিল ওরা। অবশ্য, ফল মলের পরনে ফ্যাকাসে সবুজ প্যান্ট ও টিউনিক ইউনিফর্ম। মারিয়া ও মাইল্স্ দেখল, একে অপরের ইকুইপমেন্ট পরীক্ষা করে দেখছে রানারা। ফুলজেন্সের কাছে মারিয়া জিজ্ঞেস করল, সে কি ইয়ার ফোন কানে গুঁজে যুদ্ধে যাবে? জবাবে একটু অবাক করে দিয়ে বলল পেঁচা: 'স্বাভাবিকভাবেই।'

এবার পিটার লারসেনের দিকে মনোযোগ দিল মারিয়া। বুঝল না, দল থেকে লারসেনকে আপাতত বাদ দেয়া হয়েছে বলে সে হতাশ কি না। চেহারা অবশ্য অত্যন্ত গম্ভীর লোকটার। চুপচাপ দেখছে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে বন্ধুরা। মাসুদ রানার নেতৃত্বের গভীরতা আরেকবার উপলব্ধি করল মারিয়া। লারসেনের দিকে ফিরে ভিএইচএফ রেডিয়ো দেখাল রানা। 'ওটার দায়িত্ব তোমার ওপর, পিটার। আমাদের ভেতর কো-অর্ডিনেট করবে। বেস পাওয়ার পর প্যাগোডায় হামলা করব রেমারিক আর আমি। নিজেদের ভেতর দ্বিধা তৈরি হতে পারে। গোলাগুলির সময় কখনও কখনও হয়। আমরা ভাল করেই জানি, ঠিক আছে রেডিয়ো। আমার সঙ্গে থাকবে একটা, আরেকটা বেস-এ কর্নেলিসের কাছে। তবে আমাদের প্রতিটা কথা মনিটর করবে। নিজেদের ভেতর তথ্য আদান-প্রদান বন্ধ হলে ধরে নেবে, এই বাড়ি আমাদের অপারেশনাল বেস। আমাদের প্ল্যান ভাল করেই

জানো। একবার বেস ঠিক হলে যোগাযোগ করব আমরা। তখন মিস্টার মাইল্‌স্‌কে বলবে, ব্যাংককের দু'এজেন্ট যেন উঠে পড়ে চার্টার করা বিমানে। ওটা রওনা হলে আমাদেরকে জানিয়ে দেবে। ওটাকে আসতে হবে ওয়ান-টুয়েনটিথ্রি ডিগ্রি বেয়ারিঙে। কিন্তু প্যাগোডার এক মাইলের ভেতর পৌঁছে ঘুরে রওনা হবে ওয়ান-নাইন-ও বেয়ারিঙে। উপসাগরের ওপর দিয়ে ঘুরে একঘণ্টা পর ফিরতি পথ ধরবে ব্যাংককের দিকে।'

কমপিউটারে তথ্য তুলে নিচ্ছে লারসেন। মুখ না তুলেই বলল, 'ঠিক আছে। তুলে নিয়েছি। কোড নেম-এর ব্যাপারে কী হবে?'

'তুমি "বেস"। আমি "সবুজ", রেমারিক "সূর্য", কর্নেলিস "এক নম্বর লাল", মউরোস "দুই নম্বর লাল", পেঁচা "তিন নম্বর লাল" আর ফল মল হচ্ছে: "নীল পরী"।'

কমপিউটারে এসব তথ্য তুলে নিল লারসেন।

মারিয়াকে বলল রানা, 'মার্সেনারিরা কখনও বিদায় বলে না, তা নাকি অশুভ। কাজেই নিয়মমত বলছি, সকালে দেখা হবে।' এসএমজি তুলে নিয়ে দলের সবাইকে নিয়ে পেছনের আঙিনায় বেরিয়ে এল রানা। কাঁধের ওপর দিয়ে বলল, 'পিটার, একবার সীমান্ত পেরিয়ে গেলে রেডিয়ো চেক করব আমরা।'

মারিয়া, লারসেন ও মাইল্‌স্‌ আঙিনায় দাঁড়িয়ে দেখল, সামনের জিপের ড্রাইভিং সিটে উঠল ফল মল। পাশেই রানা। পেছনের সিটে রেমারিক, হাতে রকেট লঞ্চার। দ্বিতীয় জিপ চালাবে কর্নেলিস। পাশে মউরোস। পেছনের সিটে ফুলজেন্স। জিপ চালু করে একবারও পেছনে না চেয়ে আঙিনা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সবাই।

বাড়ির ভেতর পা রেখে বলল মাইল্‌স্‌, 'ভাল হতো ব্যাক-আপ ফোর্স থাকলে। মিস্টার রানার দলের বড় কোনও ভুল হলে

হেলিকপ্টারে করে পাঠিয়ে দেয়া যেত তাদেরকে।'

চেয়ার টেনে সবাই বসার পর লারসেন বলল, 'খুলে বলছি কেন তা করতে দিল না রানা। ওরা আধুনিক অভিযাত্রীদের মত নয়। অনেকটা প্রাচীন নাবিকদের মত, যেন চলেছে সাগর পাড়ি দিয়ে দূর-দেশে। আজকাল যেসব দুধ-ভাত অভিযাত্রীরা আর্কটিক বা অন্য কোথাও গিয়ে বিপদে পড়ে রেডিয়োতে গলা ফাটায়: আমাদের উদ্ধার করুন। এক্ষুণি হেলিকপ্টার বা বিমান পাঠান। তাদের মত নয় ওরা। স্কট বা অ্যামুণ্ডসনের সঙ্গে আছে ওদের মিল। চাইছে না, যে কাজে নেমেছে, সেখানে বাগড়া দিক কেউ। তাতে বিপদের সম্ভাবনাও বাড়বে। ওরা টাকার জন্যে কাজ করছে না। বিপদ হতে পারে, সেজন্যে তৈরি। খারাপ কিছু হলে মেনে নেবে। লড়তে আপত্তি নেই।'

'পেঁচাও এমন?' বলল মারিয়া। 'সে তো মার্সেনারি নয়।'

'অন্যদের মতই একই ধাতু দিয়ে তৈরি ও।'

'কিন্তু আপনি তা নন?' কৌতূহল মিটাতে চাইল মারিয়া।

'ঠিকই ধরেছেন,' কপালে টোকা দিল লারসেন। 'আমার কাজ মগজ খাটিয়ে কমপিউটার থেকে কিছু বের করা। বলব না ওদের বুদ্ধি নেই, বা বোকা। আসলে ওরা প্রত্যেকে হাইলি ইন্টেলিজেন্ট। কিন্তু শিরার ভেতর পছন্দ করে অ্যাড্রেনালিনের স্রোত। আবার এভাবেও বলতে পারি, আমার কাজ কো-অর্ডিনেট করা। ওদের মত সশস্ত্র লড়াইয়ের যোগ্যতা আমার নেই।'

চুপচাপ শুনছিল মাইল্স্, কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আপনি সৎ মানুষ। সেটা কম কথা নয়।' নিজেও সে খুশি যে লড়তে যেতে হয়নি এক দল খুনির বিরুদ্ধে।

'মারিয়া, আপনার বা আমার কাজ ফেলনা নয়,' বলল লারসেন। 'ওদের সঙ্গে যেতে পারলাম না বলে খারাপ লাগছে, কিন্তু এখানেও আমার জন্যে কাজ রেখে গেছে ওরা। দরকার

পড়লে তদন্ত করব আমি, আর সেসব তথ্য পেয়ে কাজে নামবে ওরা। আগেও এই দলের সঙ্গে কাজ করেছি। ওরা খুশি যে এদিকটা সামলে রাখি আমি।' হাতঘড়ি দেখল লারসেন। 'আগামী একঘণ্টার ভেতর সীমান্ত পেরোবে ওরা। গোপনে ওটা পেরিয়ে যাওয়া খুব জরুরি। ওদিকে হালকাভাবে রাখা হয়েছে খেমার রুয বাহিনীর লোক। কিন্তু সরু টামায়োং নদী পেরিয়ে যাওয়ার পর ওদিকে আছে ক্যাম্প করা খেমার রুয বাহিনী। খুব সাবধানে যেতে হবে টাক লুইয়ে পর্যন্ত। এরিয়াল ফোটো থেকে আমরা দেখেছি, বেশিরভাগ খেমার রুয বাহিনী সরিয়ে নেয়া হয়েছে দক্ষিণে। তবে কতজন আছে, জানি না। প্যাগোডার এক মাইলের ভেতর পৌঁছে গেলে রেকি করতে কর্নেলিসকে পাঠাবে রানা। ও নিজে ছাড়া দলের সেরা স্কাউট কর্নেলিস।'

আটষট্টি

'আমরা ক্যামবোডিয়ায় ঢুকে পড়েছি,' বলল ফল মল। ব্রেক কষে থামিয়ে ফেলেছে জিপ।

ম্যাপ থেকে চোখ তুলল রানা। 'আপনি পুরো নিশ্চিত?'

'জী। চারপাঁশ দেখলে বোঝা যায় না, কিন্তু অন্তরের ভেতর বুঝে যাই দেশে ফিরেছি।' বামদিকে দেখাল সে। 'কিছুক্ষণ পর দেখব ক্যাম ট্র্যায় গ্রামের বাতি। ইলেকট্রিসিটি নেই, কিন্তু হারিকেন আছে। তার দশ মিনিট পর পৌঁছব টামায়োং নদীর তীরে। এদিকে এসে হয়েছে সরু ঝর্নার মত। আর এরপর শুরু

হবে সত্যিকারের খেমার রুয এলাকা।

অপ্রশস্ত ধুলোবালির এক রাস্তা ধরে চলেছে ফল মল। রানাকে বলল, এই পথে চলে বলদ টানা গাড়ি।

পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল রেমারিক, 'সামনের পথও কি এমনই?'

'না,' বলল ফল মল। 'নদীর কাছে যেতে যেতে খুব খারাপ হয়ে উঠবে পথ। বিপদের ভয় ওখানেই। নদীর তীরে বেশ কয়েকটা ক্যাম্প করেছে খেমার রুয বাহিনী। একবার জায়গাটা পেরিয়ে গেলে নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারব টাক লুইয়ে পর্যন্ত।'

ফল মলকে বলল রানা, 'নদীর কাছে যাওয়ার আগেই অফ করবেন হেডলাইট। তখন ব্যবহার করব নাইট ভিশন।' ভিএইচএফ রেডিয়ো তুলে নিল ও। সুইচ অন করে বলল, 'সবুজ। বেস, শুনছ?'

তিন সেকেণ্ড পর এল লারসেনের কণ্ঠ: 'বেস থেকে বলছি, সবুজ। পরিষ্কার শুনছি।'

আবারও বলে উঠল রানা: 'সবুজ বলছি, এক নম্বর লাল। শুনতে পাচ্ছ?'

পঞ্চাশ গজ পেছনের জিপ থেকে বলল কর্নেলিস, 'আই কপি।'

'আমরা ক্যামবোডিয়ায়,' বলল রানা। 'দশ মিনিট পর বন্ধ করে দেব হেডলাইট। একই কাজ করবে। ব্যবহার করবে নাইট ভিশন।'

'অ্যাফারমেটিভ।'

ফল মলের উদ্দেশে মাথা দোলাল রানা। আবারও সামনে বাড়ল জিপ।

নদীর দিকে যাওয়ার এক পর্যায়ে সতর্ক হয়ে গেল রানা ও ফল মল। ওদের চোখে ট্রাইলক্স নাইট ভিশন। ওটার কারণেই

দেখল, পথের পাশে দু'জন লোক। হাতে রাইফেল। রেডিয়ো তুলে নিচু স্বরে বলল রানা, 'সামনে দু'জন খেমার রুয সৈনিক। আমরা থামছি। গতি কমিয়ে দাও। গাড়ি থেকে নেমে পেছন থেকে আমাদেরকে কাভার দিক দুই নম্বর লাল আর তিন নম্বর লাল।'

www.boighar.com

ওদিক থেকে এল কর্নেলিসের কণ্ঠ, 'ঠিক আছে।'

সরু পথের পাশে কাঁধে রাইফেল তুলে নিয়েছে দুই সৈনিক। অস্ত্রগুলো একে-৪৭। ফল মল ব্রেক কষে গাড়ি থামাল। একপাশে সরে গেল খেমার রুয এক সৈনিক। অন্যজন জিপের দিকে আসছে, হাতে তৈরি অস্ত্র। পেছনের সিট থেকে ফিসফিস করে বলল রেমারিক, 'ওকে কাভার করেছি।'

নাইট ভিশন খুলে ফল মলকে বলল রানা, 'আপনারটাও চোখ থেকে খুলে ফেলুন। জানেন তো কী বলতে হবে।'

সবই মনে আছে ফল মলের। নাইট ভিশন সরিয়ে রেখে বলল, 'বহুবার বলেছি, তাই মুখস্থ হয়ে গেছে। এরা গ্রামের দিকের লোক। পুরোপুরি সৈনিক বলা চলে না। ওপর থেকে বলে দেয়া হয়েছে টহল দিতে।'

ড্রাইভারের জানালার সামনে থামল খেমার রুয সৈনিক। ফল মলের মাথায় তাক করেছে একে-৪৭-এর নল। রানা ও রেমারিককে দেখে ঝট্ করে পেছনে তাকাল। খুব কাছে চলে এসেছে দ্বিতীয় জিপ। চিৎকার করে সঙ্গীকে কী যেন বলল সে। নিজের রাইফেল তাক করল দ্বিতীয় জিপের দিকে।

তখনই চমকে গেল রানা ফল মলের কথা শুনে। ধমকে উঠেছে সে খেমার রুয সৈনিকের উদ্দেশে। জবাবে নিচু স্বরে কী যেন বলতে চাইল লোকটা। তাতে আরও চেতে গেল ফল মল। পরের ধমক হিমালয় কাত করে ফেলে দেয়ার মত। এক লাফে তিন হাত পিছিয়ে গেল খেমার রুয সৈনিক। এখনও অস্ত্রের নল

ফল মলের দিকে। পরক্ষণে খটাস্ করে এক স্যালিউট মেরে নামিয়ে নিল রাইফেল। রানা বুঝে গেল, অনেক বড় অফিসার ধমক দিয়েছে সামান্য এক সৈনিককে। গলা সামান্য নিচু করল ফল মল। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিল।

রানা জানে, এখন বলা হচ্ছে ফল মল খেমার রুয বাহিনীর পদস্থ অফিসার। এস্কোর্ট করে নিয়ে চলেছে পাঁচ মার্সেনারিকে কমাণ্ডার দায়না বেলগুতাইয়ের কাছে।

'আমাদের গোক্ষুর চান এরা এই এলাকা থেকে সরিয়ে দেবে মাইন। আমরা হেডলাইট অফ করে যাচ্ছি, কারণ শোনা যাচ্ছে, এদিকে রওনা হয়েছে সরকারী বাহিনী। তোমরা এদিকে তাদের কাউকে দেখেছ?'

সম্মানের সঙ্গে ফল মলকে বলল সৈনিক, 'জী-না, স্যর।'

রানার দিকে তাকাল ফল মল। ঠোঁটে মৃদু হাসি। 'এলাকায় সরকারী বাহিনী এসেছে এমন কোনও গুজব শোনেনি। তবে পঞ্চাশ মাইল দূরে আমাদের একটা খেমার রুয ক্যাম্পে বোমা ফেলেছে। ...মিস্টার রানা, আপনার কাছে সিগারেট আছে?'

'না। ছেড়ে দিয়েছি। সিগারেট চাইছে নাকি?'

'সবসময় তাই চায়। বিশেষ করে বিদেশি সিগারেট হলে।'

পেছনের সিট থেকে রেমারিক বলল, 'মউরোস মার্লবোরো টানে।'

জিপের দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামল রানা। হাঁক ছাড়ল, 'মউরোস!'

তিরিশ গজ দূরের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল মউরোস, হাতে সাবমেশিন-গান। ঘুরে ওর দিকে একে-৪৭ তাক করল দ্বিতীয় খেমার রুয সৈনিক। তাতে ধমকে উঠল ফল মল। ওরই বলা কথা নিচু স্বরে সঙ্গীকে বলল প্রথম সৈনিক। দ্বিতীয়জন নামিয়ে নিল অস্ত্র।

‘সঙ্গে সিগারেট আছে, মউরোস?’ জানতে চাইল রানা।

‘খাই, তাই আছে দু’চার প্যাকেট,’ সতর্ক হয়ে উঠল মউরোস। ‘কেন?’

‘দুই প্যাকেট দান করো,’ বলল রানা, ‘আমরা আছি বন্ধুদের ভেতর।’

এসএমজি নামিয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে দুই প্যাকেট মার্লবোরো বের করল মউরোস। একটা প্যাকেট খুলে ভাগ করতে লাগল। ‘দেড় প্যাকেট দেব। দু’জন মিলে ভাগ করে নেবে। নিজের জন্যেও তো রাখতে হবে, নইলে বিপদের সময় হয়তো দেখব শুরু হয়েছে উইথড্রয়াল সিম্পটম।’

দুই খেমার রুয সৈনিককে একটা করে সিগারেট দেয়ায় সৃষ্টি হলো খুশির পরিবেশ। জিপের পাশে একে-৪৭ ঠেস দিয়ে রেখে মার্লবোরো টানতে লাগল তারা। তিক্ত চেহারা করে দেড় প্যাকেট সিগারেট দান করল মউরোস। এরপর আবারও ফল মলের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপ করল লোক দু’জন, রাইফেল তুলে নিয়ে ফিরে গেল রাস্তার ধারে।

ইঞ্জিন চালু করে রানাকে বলল ফল মল, ‘ওরা দেখিয়ে দেবে নদীর ঠিক কোন্ দিক দিয়ে পেরিয়ে গেলে ভাল হবে।’

সামনে বাড়ল জিপ। রানা জিজ্ঞেস করল, ‘ওরা যোগাযোগ করবে না টাক লুইয়েতে?’

‘না, ওদের সঙ্গে রেডিয়ো নেই। এসেছে পেছনের গ্রাম থেকে। ওদের ধারণা, আমি খেমার রুয অফিসার। এসব প্রত্যন্ত এলাকায় শেষপর্যন্ত সবই চাউর হয়ে যায়। তবে আশা করি বিপদ হওয়ার আগেই বেরিয়ে যেতে পারব।’

আধঘণ্টা পর নদীর অগভীর এক অংশ পার হয়ে মাঝরাতের আগেই মূল খেমার রুয এলাকায় ঢুকে পড়ল রানারা। পেছন থেকে হাত নেড়ে ওদেরকে বিদায় জানাল খেমার রুয সৈনিকরা,

মুখ থেকে ভক-ভক করে বেরোচ্ছে মার্লবোরোর নীলচে ধোঁয়া। খুশি মনে দেখল, টাক লুইয়ের দিকে চলেছে দুই জিপ আঁধার রাতে।

'নিয়মিত বাহিনী হলে এত সহজে পার পেতাম না,' বলল ফল মল। 'আমরা এখন ঢুকছি এমন এলাকায়, যেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। ওরা আমাকে চিনতেও পারে।'

'সতর্ক না করে গুলি ছুঁড়বে না,' বলল রানা, 'প্রথমে দেখতে হবে আমরা কে। আর তখন যদি দেখে আপনি কে, গুলি করার আগেই ওদেরকে ফেলে দেব আমরা। সর্বক্ষণ আপনাকে কাভার দেবে রেমারিক।'

এসএমজির নলে চাপড় দিল রেমারিক। 'আপনাকে কাভার করেই রেখেছি। আমাদের যদি থামতে হয়, দ্বিতীয় জিপ দেখার আগেই পেছন থেকে শত্রুদের ওপর হামলা করবে মউরোস আর ফুলজেন্স।'

ঊনসত্তর

'ওঁর সঙ্গে খেমার রুয সৈনিকদের দেখা হলে?' জানতে চাইল ফল মল।

'দেখা হবে না,' বলল রানা। 'বিশ্বের সেরা স্কাউট ও। রাতে চলতে পারে বিড়ালের মত নিঃশব্দে, গোপনে। এ কারণেই কুকুরের সঙ্গে কখনও দেখা হয় না বেড়ালের।'

এক কিলোমিটার দূরে বৈদ্যুতিক আলোর আভা দেখে থেমে

গেছে ওরা এক টিলার ওপর। ওদের চোখের সামনে অন্ধকারে হারিয়ে গেল সিম কর্নেলিস। হাতঘড়ি দেখল রানা। 'ওর আধঘণ্টা লাগবে ফিরতে। রেমারিক, দেবে নাকি কফি?'

জিপ থেকে নেমে পড়ল ওরা। থার্মোস থেকে তিনটে প্লাস্টিক কাপে কফি ঢালল রেমারিক। এবার জ্যাকেটের পকেট থেকে বেরোল মেডিসিনের ছোট্ট বোতল। ওটা থেকে নিল তিনটে বড়ি। একটা দিল রানাকে, আরেকটা ফল মলকে। নিজেরটা গিলে ফেলল। 'ডেক্সেড্রিন,' ব্যাখ্যা দিল, 'জাগিয়ে রাখবে। স্নায়ু হবে সতর্ক। অলিম্পিক অ্যাথলেটিক কমিটি এই জিনিস ব্যান করেছে। কিন্তু কার বাপের সাধ্যি এখন আমাদের রক্ত টেস্ট করে!'

কফির সঙ্গে বড়ি গিলে বলল ফল মল, 'চুপ করে বসে থাকব?'

'আপাতত,' বলল রানা, 'একটু পর ফিরবে কর্নেলিস। কেউ আমাদেরকে চমকে দেবে, তা প্রায় অসম্ভব।' বামদিক দেখাল। 'মউরোস আছে ওদিকে, আর ডানদিকে ফুলজেন্স।' কফিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কত দিন ধরে খেমার রুয বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন?'

পরের বিশ মিনিট ফল মলের কাছ থেকে নানান তথ্য পেল রানা ও রেমারিক। ওরা বই ও পত্রিকায় পড়েছে পল পট নিজে শিক্ষিত লোক ছিল। তার দলের বড় নেতারাও তাই। কিন্তু শিক্ষিত অন্য যে-কাউকে ধরে নেয়া হতো দেশের শত্রু হিসেবে। এবারও খেমার রুয বাহিনী বা পার্টি ওই একই ভুল করছে। সুযোগ পেলেই খুন করছে শিক্ষিতদেরকে। ফল মলের কথা শুনতে শুনতে রানার মনে পড়ল, কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতির সেরা শিক্ষিত মানুষগুলোকে নির্মমভাবে খুন করেছিল একদল নরপশু, পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল গোটা জাতিকে। এ কাজ সম্ভব শুধু গণ্ডমূর্খ, অশিক্ষিত বদ্ধ উন্মাদের পক্ষে।

'বাচ্চারা আর নারীরা সবসময়ে বেশি অত্যাচারের স্বীকার হয়,' মন্তব্য করল রানা।

মাথা দোলাল ক্যামবোডিয়ান। 'সত্যিই তাই। নম পেন দখল করে নেয়ার পর পল পটের বড় এক অফিসার বলেছিল, খেমার জাতির কোনও ইতিহাস নেই। আমাদের সংস্কৃতি, মন্দির সব ধ্বংস করা হবে, খুন হবে পুরোহিতরা। আমরা হব প্রথম খেমার রুয জাতির মানুষ। তার আগের সব মুছে দেয়া হবে ইতিহাস থেকে। এরপর শুরু হয় নৃশংস গণহত্যা। এবারও খেমার বাহিনী বা পার্টি ওই একই কাজ করতে চাইছে। অথচ আমার মত কেউ কেউ ভেবেছিল, শুধরে গেছে ওরা। সত্যিই শিক্ষিত একটি জাতি ও উন্নত এক দেশ গড়ব আমরা। মিথ্যা হয়ে গেছে সব। সবাই জানে, ওরা ঘেয়ো কুকুর। মাংসের জন্যে নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করছে।'

'আগেও বহু জাতির ভেতর ওই একই খুনের উল্লাস দেখা গেছে,' নরম সুরে বলল রেমারিক।

'আর পরেও এমন আবারও হবে,' মন্তব্য করল রানা।

আলাপ থেমে গেল রানার ওয়েবিঙে আটকে রাখা রেডিয়োর কারণে। ওটার পেট থেকে বেরিয়ে এল কর্নেলিসের কণ্ঠ: 'সবুজ, এক নম্বর লাল বলছি।'

'এক নম্বর লাল, বলো,' রেডিয়োতে বলল রানা।

'আমি গ্রামে। বেশ কিছু বাড়ি আর কুঁড়েঘর আছে। খেমার রুযের তেমন কাউকে দেখছি না। একটু বড় একটা বাড়িতে বাতি জ্বলছে। উঁকি দিয়েছি জানালা দিয়ে। আর কী দেখেছি শুনলে অবাক হবে। অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স ভেতরে। মেঝেতে বসে আছে, কোলে ছোট্ট এক ছেলে। তাকে ইংরেজি শেখাচ্ছে ও! টেবিলে বসে আছে দুই খেমার রুয সৈনিক, হাতে বিয়ার। হাতের কাছেই অস্ত্র। চারপাশ ঘুরে এসেছি। আর কেউ নেই।'

সত্যি কিছুক্ষণের জন্যে হতবাক হয়ে গেল রানা।

এহেরেন্স আদর করছে বাচ্চা কোনও ছেলেকে?

বয়স হয়েছে তার কমপক্ষে পঞ্চাশ, এমন কোনও খারাপ কাজ নেই যা করেনি। আজ হঠাৎ কীভাবে মানুষ হয়ে গেল লোকটা?

তাকে বোধহয় আটকে রাখা হয়েছে ইচ্ছের বিরুদ্ধে।

ক' সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'এক নম্বর লাল, পরিস্থিতি খারাপ মনে হচ্ছে না। আমরা আসছি। মাঝ পথে দেখা করো। অন্যরাও আসবে। রওনা হব আমরা দু'মিনিট পর। এক শ' গজ পেছনে আসুক দুই নম্বর লাল আর তিন নম্বর লাল।'

সামান্য কড়কড় শব্দ তুলে শোনা গেল লারসেনের কণ্ঠ: 'কপি করলাম।'

'বেস, আগামী পনেরো মিনিটের ভেতর দখল করব ওই বাড়ি,' বলল রানা, 'তখন আমি বললে মাইল্স্কে জানিয়ে দিয়ো, যেন আকাশে ওঠে বিমান।' রেডিয়োর সুইচ অফ করে ওয়েবিঙে ঝুলিয়ে দিল রানা। হাতে তুলে নিল এসএমজি। 'রওনা হও সবাই!'

সত্তর

আনমনে তিক্ত হাসল অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স। নাহ্, নেই ওর কপালে সংসার। ভেবেছিল বাচ্চা ছেলেটা আর কনি টুরেনকে নিয়ে ফিরবে দেশে। থিতু হবে একটা খামার কিনে। কিন্তু মনের ভেতর বুঝে গেছে, যতই আশ্বস্ত করুক দায়না বেলগুতাই,

আসলে ওকে ছাড়বে না সে, মেরে ফেলবে। জীবনে বহুবার মস্তসব বিপদে পড়েছে, নাকের সামনে দিয়ে গেছে নিশ্চিত মৃত্যু—কিন্তু এবার মনের ভেতর থেকে একটা কথাই আসছে, না রে, অ্যাডেলবার্ট, এবার আর রক্ষা নেই তোর। মরবি দায়না বেলগুতাইয়ের হাতে, নইলে মরবি মাসুদ রানা নামের এক মৃত্যু-দূতের হাতে।

দুই খেমার রুয সৈনিকের দিকে তাকাল এহেরেন্স। কাঠের টেবিলে হাত রেখে গল্প করছে তারা। অবশ্য চোখ রেখেছে ওর ওপর। কিছু করতে গেলে ঝট্ করে রাইফেল তুলেই গুলি করবে। দায়না বলে গেছে, এরা তার দলের সেরা সৈনিক।

নিজের কাজ ঠিকঠাকভাবে শেষ করেছি, ভাবল এহেরেন্স। টাকাও বুঝিয়ে দিয়েছিল। কখনও নিজের কাজে ভুল করিনি। নীতি বলে কথা আছে না! যার কাজ করেছি, তাকে কখনও ঠকাইনি। কিন্তু এত কিছু করে কী লাভ হলো? শেষকালে তো মরতেই হচ্ছে এই পোড়া দেশে এসে!

আবার বাচ্চাটা আর কনি টুরেনের কথা মনে এল। সত্যি, বাঁচলে মেয়েটাকে দিতে পারত সংসার। বাবা পেত ছেলেটা। কিছুই হলো না। কনিকে বলেছিল, ওকে আর টনিকে নিয়ে বহু দূরের এক দেশে যাবে, সংসার পাতবে। তখন মেয়েটার চোখে ছিল ভরসার দৃষ্টি, যে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিল, সেই একই স্বপ্ন বুকে নিয়ে বিদায় নেবে সে। হয়তো ওদের সামনেই গুলি করে ওকে মেরে ফেলবে খেমার রুয সৈনিকরা। তারপর আবারও আসবে হায়নার দল, ভোগ করবে কনিকে। ওর জন্যে, বাচ্চাটার জন্যে কিছুই করতে পারল না ও। বুকের কাছে ঝুলে গেল অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্সের মাথা।

কবজার ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ তুলে খুলে গেল দরজা। মুখ তুলল এহেরেন্স। ঘরে কে এসেছে দেখে মস্ত ঢোক গিলল। মৃত্যু-

দূত মাসুদ রানা! হাতে সাইলেন্সারসহ পিস্তল। তাক করেছে...

লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে হাতে রাইফেল তুলে নিতে চাইল দুই খেমার রুয সৈনিক। ওখানেই মেঝেতে শুয়ে পড়ল বুকে বুলেট নিয়ে। সাইলেন্সারের কারণে আওয়াজ হলো: 'খুক-খুক!'। রানার পাশে ঘরে ঢুকেছে আরেক লোক, হাতে সাবমেশিন-গান।

এক সেকেণ্ড পর এহেরেন্স চিনল ভিটেলা রেমারিককে। রানা ছাড়া আর কেউ তার মত দ্রুত গুলি চালাতে পারে না। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে দেখে নিল মারা গেছে দুই সৈনিক। রানার দিকে চেয়ে মাথা দোলাল।

কয়েক পা সামনে বাড়ল রানা। কণ্ঠ হয়ে উঠল অত্যন্ত গম্ভীর। 'আমি আগেই বলেছি, আবারও তোমার চেহারা দেখলে খুন করব।'

তিক্ত হাসল এহেরেন্স। 'তাতে আর কী যায় আসে? হয় তুমি খুন করবে, নইলে ওই মেয়েলোক। দায়না বেলগুতাই।'

'সে এখন কোথায়?' জানতে চাইল রানা, 'প্যাগোডার ভেতর?'

'হ্যাঁ, অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে,' আবারও হাসল এহেরেন্স। 'ভাবছে প্যারাশ্যুট নিয়ে নামবে ওখানে।'

'সঙ্গে ক'জন আছে?'

'জানা নেই। কে জানে ক'জন।'

জানতে চাইল রেমারিক, 'কত দিন ধরে এখানে আছ?'

'বেশ কয়েক মাস।' চট্ করে পাশে তাকাল এহেরেন্স। কাঁথার ভেতর নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে টনি। জানে না, খুন হয়ে গেছে ঘরে দু'জন লোক।

এহেরেন্সের দৃষ্টি অনুসরণ করে বাচ্চা ছেলেটাকে দেখল রানা ও রেমারিক। চোখে পড়ল, ওদিকের দরজায় এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মিষ্টি চেহারার এক যুবতী, চোখে ভয়।

আশ্বস্ত করার জন্যে তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল রানা। আবার চোখ ফিরল এহেরেন্সের চোখে। 'এর ভেতর কোনও আমেরিকান সৈনিক দেখেছ?'

মাথা দোলাল এহেরেন্স। 'হ্যাঁ, একজন। আগে মাইন সরাত। কিছু দিন হলো হাত-পা বেঁধে রাখা হয়।'

'কোথায় রাখে ওকে?'

'একটা খোঁয়াড়ে।' সাহস করে বহুদিন পর আবারও রানার চোখে তাকাল এহেরেন্স। 'হয়তো আমাকে খুন করবে, কিন্তু তার আগে একটা অনুরোধ করব।'

'কী অনুরোধ?'

'এই মেয়েটা আর ওর বাচ্চাটাকে মেরে ফেলো না।'

'শালা তুমি মাসুদ রানা সম্পর্কে কিছুই জানো না?' বিরক্ত সুরে বলল রেমারিক।

'দয়া করে ওদেরকে মেরে ফেলো না, রানা। এটা আমার অনুরোধ।' ঢোক গিলল এহেরেন্স। 'আমি হলেও ওদেরকে বাঁচতে দিতাম।'

জবাব দিল না রানা, কড়া সুরে জিজ্ঞেস করল, 'প্যাগোডার চারপাশে মাইনফিল্ড তৈরি করেছ?'

'আমার জীবনের সেরা কাজ।'

'যাওয়ার বা বেরোবার কয়টা পথ?'

'মাত্র একটা,' সামান্য গর্বের ছাপ এহেরেন্সের কণ্ঠে: 'ওটা মাত্র এক গজ চওড়া।'

'তোমার কাছে ম্যাপ আছে?'

'না। কারও কাছেই নেই। যাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম কীভাবে মাইন বসাতে হবে, কাজ শেষ করার পর তাদেরকে গুলি করে মেরেছে দায়না বেলগুতাই।'

'তা হলে প্যাগোডায় কী করে গেল সে?'

কাঁধ ঝাঁকাল এহেরেন্স। 'দেখিয়ে দিয়েছি কী চিহ্ন দেখে এগোতে হবে। সব লিখে নিয়েছে সে।'

গলা উঁচু করল রানা, 'পেঁচা, কর্নেলিস, মউরোস, তোমরা পাহারা দেবে এই বাড়ি। ভেতরে এক মহিলা আর তার বাচ্চা আছে। নিরাপত্তা দিতে হবে তাদেরকে।' এহেরেন্সের চোখে কৃতজ্ঞতা দেখল ও। জিজ্ঞেস করল, 'এলাকায় খেমার রুয ডিপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে কতটা জানো?'

'এসব বলার আগে একটা কথা জানতে চাই,' বলল এহেরেন্স, 'তুমি কি আমাকে খুন করবে?'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি,' বলল রানা।

'সেক্ষেত্রে আরেকটা অনুরোধ,' বলল এহেরেন্স। 'আমাকে যদি মরতেই হয়, আপত্তি নেই, কিন্তু মেয়েটা আর ওর বাচ্চাকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ো কোথাও।'

'সেসব পরে দেখব,' বলল রানা, 'আপাতত আধঘণ্টা পর ওই মাইনফিল্ডের ভেতর দিয়ে রেমারিক আর আমাকে নিয়ে যাবে তুমি। ওখানে আমাদের কাজ শেষ হলে ছেড়েও দিতে পারি তোমাকে। এবার বলো, চারপাশে কোথায় কোথায় আছে খেমার রুয বাহিনী।'

চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগল এহেরেন্স। কিছুক্ষণ পর মাথা দোলাল। 'ঠিক আছে। আমার হারাবার কিছুই নেই। শুনেছি তুমি এককথার মানুষ। কাজেই ধরে নিলাম, কনি টুরেন আর টনিকে সরিয়ে নেবে এই নরক থেকে। ...হ্যাঁ, কয়েক মাস আগে এখান থেকে দক্ষিণ-পুবে দলের বেশিরভাগ সৈনিককে সরিয়ে নিয়েছে দায়না বেলগুতাই। রয়ে গেছে মাত্র একটা ডিটাচমেন্ট। তারা আছে টাক লুইয়ে নামের এক ছোট শহরে। বিশজন ওরা।'

'উঠে দাঁড়াও,' বলল রানা, 'চালাকি করলে মরবে।'

'রেমারিক, কর্নেলিস, মউরোস?' তিক্ত হাসল এহেরেন্স।

'পৃথিবীর সেরা সবাইকে নিয়ে এসেছ, চালাকির উপায় কোথায়?'

মেয়েটার কাছে জানতে চাইল রানা, 'তুমি ইংরেজি বলতে পারো?'

মাথা দোলাল কনি টুরেন।

'তা হলে মন দিয়ে শোনো। কোনও ভয় নেই। কিছুক্ষণ পর থাইল্যাণ্ডের দিকে রওনা হব আমরা। তার আগ পর্যন্ত তোমাদের পাহারা দিয়ে রাখবে আমার দলের কয়েকজন।'

এহেরেন্স উঠে দাঁড়াতেই ঘুম ভেঙে গেল ছেলেটার। ওর চোখ পড়ল মেঝেতে দুই রক্তাক্ত মৃতদেহের ওপর। কয়েক সেকেণ্ড শুয়ে থাকল, তারপর দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরল প্রিয় লোকটার ঊরু। অনেক ওপর থেকে ওকে দেখছে সাড়ে ছয় ফুটি এহেরেন্স। ঝুঁকে ছেলেটাকে তুলে নিল কোলে। গালে চুমু দিয়ে বাড়িয়ে দিল কনি টুরেনের দিকে।

www.boighar.com

ছেলেকে কোলে নিয়ে এহেরেন্সের দিকে চেয়ে আছে মহিলা। দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। রানা বুঝে গেল, এরা কী করে যেন হয়ে গেছে আস্ত একটা পরিবার। আর এ কারণেই বুকে এদের জন্যে দায়িত্ববোধ জাগল ওর।

ঘরের কোণে টেনে নিয়ে লাশদুটো ফেলে রাখল রেমারিক। পছন্দ হলো না নিজের কাজ। কাঁথা দিয়ে ঢেকে দিল মৃতদেহ।

'তোমরা চেনো বা নাম শুনেছ জর্জ হার্টিগানের?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' জবাবটা দিল কনি।

'ওকে খোঁয়াড়ে রেখেছে?'

'না, আজ নিয়ে গেছে প্যাগোডার ভেতর। আজ বা কাল রাতে পুড়িয়ে মারবে।'

'দায়না বেলগুতাই যখন গ্রামে আসে, ওঠে কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'ডানপাশের এক বড় বাড়িতে।'

ফুলজেন্সের দিকে ফিরল রানা। 'ওই বাড়ি সার্চ করে এসো। জরুরি ডকুমেন্ট বা ম্যাপ থাকতে পারে। যদি কোনও সিন্দুক থাকে, খুলে দেখবে। কিন্তু এসবের জন্যে পাবে মাত্র দশ মিনিট।' রেমারিকের উদ্দেশে বলল, 'রেডিয়ো করো পিটারের কাছে। পাঁচ মিনিট পর ব্যাংকক থেকে রওনা হোক বিমান।' কনি টুরেনকে বলল, 'চেয়ার টেনে বসো। এখানেই অপেক্ষা করবে। মনে করি না কেউ হামলা করবে, তবুও বাইরে পাহারা দেবে আমার লোক।'

বাচ্চা কোলে নিয়ে চেয়ারে বসল মহিলা। রানা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কুয়েন আন টু নামের কাউকে চেনো?'

কনি টুরেনের চেহারায় তিক্ততা দেখল রানা।

মাথা দোলাল মহিলা। 'হ্যাঁ, চিনি তাকে। ওর মত নরপশু আর হয় না। ধর্ষণ করে মেরে ফেলেছে আমার দু'জন বান্ধবীকে। ওই লোক যে ভিয়েতনামিয, তা ভাবতে গেলে লজ্জা হয় আমার।'

'সে গতকাল ছিল দায়না বেলগুতাইয়ের সঙ্গে,' বলল এহেরেন্স। 'এখনও বোধহয় আছে।'

'গুড,' বলল রানা। 'এবার আর মিস করব না।'

স্যাটালাইট ফোন বেজে উঠতেই কল রিসিভ করল দায়না বেলগুতাই। কয়েক সেকেণ্ড কথা শুনে দুষ্ট হাসল কুয়েন আন টুর দিকে চেয়ে। 'ব্যাংকক থেকে রওনা হয়েছে চার্টার করা বিমান। ফ্লাইট প্ল্যান অনুযায়ী ওটা নামবে নম পেন-এ। তবে সন্দেহ কী, যাওয়ার পথে একটু ঘুরে যাবে।'

দু'চার কথা শেষ করে ফোন রেখে দিল দায়না। একবার দেখে নিল হাতঘড়ি। 'আমাদের লোক বলল, বিমানে উঠেছে

দু'জন প্যাসেঞ্জার। আধঘণ্টা পর আমাদের মাথার ওপর দিয়ে যাবে।' উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে পেট্রোলের ক্যান তুলে নিল সে, গেল মার্বেলের বেদির সামনে। খুব সম্মানের সঙ্গে ক্যান রাখল এক কোণে। বেদির পাশেই নিচের মেঝেতে শুইয়ে রাখা হয়েছে জর্জ হার্টিগানকে। হাত-পা বাঁধা। মুখও। পরনে হলদে রঙের হ্যাযম্যাট স্যুট। মাথার পাশে পড়ে আছে মুখোশ। ড্যাব-ড্যাব করে দায়নার দিকে চেয়ে আছে সে, চোখে আতঙ্ক।

'বিশ মিনিট পর গ্যাস চালু করব,' বলল দায়না, 'তখন ভিজিয়ে নেব পেট্রোল দিয়ে চিতা। তোমার মুখে অক্সিজেনের মুখোশও দেব, হার্টিগান। তবে মরবে রানার পাশে আগুনে পুড়ে।'

একাত্তর

দশ মিনিট পর ফিরে এল ফুলজেন্স, সঙ্গে মউরোস। দু'জন মিলে বহন করছে বড়সড় এক কাঠের বাক্স। পেঁচার কোমরে ঝুলছে চামড়ার মাঝারি এক থলে। টেবিলের ওপর বাক্স নামিয়ে বাইরে পাহারা দিতে গেল মউরোস। রানার দিকে থলি বাড়িয়ে দিয়ে বলল পেঁচা: 'ওই বাড়িতে পুরনো এক ফ্রেঞ্চ মিটেল কোম্পানির সিন্দুক আছে। ওই জিনিস খুলে খুলেই কিশোর বয়সে চালু করেছি হাত। ভেতরে ছিল থলে।'

থলের গলার ফিতা খুলে ভেতরে উঁকি দিল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর বাড়িয়ে দিল রেমারিকের হাতে। 'নাও। আমাদের সব খরচ উঠেও কয়েক লাখ ডলার থাকবে। ভাগাভাগি করব

পরে।’

থলের ভেতরের জিনিস দেখল রেমারিক।

শত শত নীলকান্ত মণি। কম বলেছে রানা। অন্তত দশ থেকে পনেরো মিলিয়ন ডলার হবে ওগুলোর দাম।

টেবিলে রাখা বাক্সের ওপর চোখ রানার। কাঠে ছাপ দিয়ে লেখা ফ্রেঞ্চ ভাষা। ফুলজেন্সের কাছে জিজ্ঞেস করল রানা, ‘এটা পেলে কোথা থেকে?’

‘ওই বাড়ির পেছনে স্টোররুম, ওখানে।’

টেবিলের সামনে থামল রানা ও পেঁচা।

বাক্সে কালো কালিতে লেখা:

'Costumes et masques protecteurs contenant calciumhypochloride contre gas neurotique de type V. Ten unites.'

কথাগুলোর অর্থ সহজেই বুঝেছে রানা-রেমারিক-ফুলজেন্স।

কিন্তু ফ্রেঞ্চ ভাষা জানা নেই অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্সের।

তার জন্যে রূপান্তর করল রানা: ‘প্রোটেকটিভ ক্লোদিং অ্যাণ্ড গ্যাস মাস্ক কণ্টেইনিং ক্যালসিয়ামহাইপোক্লোরাইড এগেনস্ট ভি-টাইপ নার্ভ গ্যাস। ...সব মিলে দশ ইউনিট।’ বিড়বিড় করল রানা, ‘ওই ডাইনী কোথা থেকে পেল নার্ভ গ্যাস?’

চামড়ার থলি তুলে নিয়ে বলল রেমারিক, ‘শুধু এখানে যা আছে, তাতেই কিনে নেয়া যাবে অর্ধেক কেমিকেল ফ্যাক্টরি।’

হ্যাঁচকা টানে কাঠের বাক্সের ডালা খুলল ফুলজেন্স। ‘ভেতরে পাঁচটা স্যুট আর মুখোশ। আগে ছিল সব মিলে দশটা।’ উজ্জ্বল হলদে স্যুট ও মুখোশ বের করে আনল সে।

‘বুঝলাম কী কারণে এত আত্মবিশ্বাসী দায়না,’ মন্তব্য করল অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স। ‘ভাল করেই জানে, রানা আর রেমারিক আসছে। ওর জানা আছে, দু’জনের ইতিহাস ও চরিত্র। আগে

কখনও ওই মেয়ের সমান চতুর কাউকে দেখিনি। ধারে কাছে এলেই রীতিমত আতঙ্কে বুক কাঁপে।'

'আমরা আকাশ থেকে নামলে এতক্ষণে খুন হয়ে যেতাম,' বলল রেমারিক।

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'প্যাগোডার ভেতর বসে আছে। ওর সঙ্গে কুয়েন আন টু। পরনে প্রোটেকটিভ স্যুট। আশা করছে যে কোনও সময়ে আকাশ থেকে নেমে আসব। কিন্তু চমকে যেতে হবে ওদেরকে। পাঁচ মিনিট পর রওনা হচ্ছি আমরা। মাইনফিল্ডের ভেতর দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যাবে এহেরেন্স। তবে যাওয়ার পথে কিছু চিহ্ন রাখা চাই, নইলে প্যাগোডা থেকে বেরিয়ে এসে বিপদে পড়ব।'

ঘর পেরিয়ে কিচেনে ঢুকল রেমারিক, কয়েক সেকেণ্ড পর ফিরে এল ময়দার বড় একটা প্যাকেট নিয়ে।

খুশি মনে মাথা দোলাল রানা। 'তুমি থাকবে পেছনে। সামনে থাকব আমি আরপিজি-৭ নিয়ে। উড়িয়ে দেব গেট। এদিকে দক্ষিণ দিকে চোখ রাখবে কর্নেলিস ও মউরোস। প্যাগোডার ভেতর গোলাগুলি হলে দেরি না করে হাজির হবে খেমার রুয কণ্টিনজেন্ট।' পেঁচার দিকে তাকাল রানা। 'নিয়ে এসো জিপদুটো। রেডিয়োতে আমি বললেই, মাইনফিল্ডের কাছে পৌঁছবে। এহেরেন্স ম্যাপে দেখিয়ে দেবে কোথায় থাকবে তুমি।' অ্যাডেলবার্টের দিকে ফিরল রানা। 'ভেবে দেখো কী করবে, বাঁচতে চাইলে তোমার একমাত্র উপায় আমাদের সঙ্গে ক্যামবোডিয়া ত্যাগ করা।'

'একা যাব না, সঙ্গে নেব কনি আর টনিকে,' বলল আফ্রিকানার। 'তা কি সম্ভব?'

'চেষ্টা করব,' বলল রানা, 'একটু পর মাইনফিল্ডের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় মনে রেখো, চালাকি করতে গেলে

মরবে।'

'আমাকে ভাগ দেবে না নীলকান্ত মণির?' জানতে চাইল এহেরেন্স।

রেমারিকের দিকে তাকাল বিরক্ত রানা।

টিটকারির হাসি হাসল রেমারিক। 'না, মোটেও বদলে যায়নি এহেরেন্স। আগের মতই লোভী। অন্যরা দিতে চাইলে আপত্তি নেই আমার।'

'অত টিটকারি দিতে এসো না,' রেগে গিয়ে বলল এহেরেন্স, 'ওই টাকা পেলে একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া করাতে পারব টনিকে। আমাকে যেটা পারেনি আমার বাবা।'

'তা পারবে,' মাথা দোলাল রেমারিক।

'ঠিক আছে।' টেবিলে ঠেস দিয়ে রাখা দুই একে-৪৭ দেখাল রানা। 'একটা নাও, এহেরেন্স। আপাতত কাঁধে ঝুলিয়ে রাখবে। সোজা হাঁটবে মাইনফিল্ডের দিকে।'

বাহাত্তর

মাইনফিল্ডের প্রান্তে এসে প্রোটেকটিভ স্যুট পরে, মুখে মুখোশ পরে নিল ওরা। আবছা শোনা গেল রানার কণ্ঠ, কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হলো না কারও। 'স্বাভাবিক কারণেই সামনে থাকবে, এহেরেন্স। তোমার পেছনে আরপিজি-৭ সহ আমি। শেষে রেমারিক। ময়দা ফেলতে ফেলতে আসবে। ওর কাছে থাকবে

বাড়তি রকেট। আমি প্রথমটা মিস করলে দরজা উড়িয়ে দিতে লাগবে ওগুলো। এহেরেন্স, পথের শেষমাথায় যাওয়ার পর কতটা দূরে থাকবে প্যাগোডার গেট?'

'পুরো পনেরো গজ,' বলল দক্ষিণ-আফ্রিকান মার্সেনারি।

'ঠিক আছে, মাইনফিল্ড পেরিয়ে গেলে ওখান থেকে রকেট ছুঁড়ব। চলো, রওনা হওয়া যাক।'

সাবধানে নিজের বেছে নেয়া বেয়ারিং খুঁজে নিল এহেরেন্স, তারপর হাঁটতে লাগল খুব ধীরে। মনে হলো পাতলা বরফের ওপর দিয়ে হাঁটছে।

দু'বার থামল সে। খুঁজে নিল নতুন বেয়ারিং। বেছে নিয়েছে গাছ ও ঝোপ। মাটিতে মৃদু আলো ফেলেছে বড়সড় কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। তবুও ট্রাইলক্স নাইট ভিশন ব্যবহার করছে ওরা। ধীর পায়ে হাঁটছে এহেরেন্স। ওর নিজের তৈরি মাইনফিল্ড। ভাল করেই জানে, কোন্ পথে এগোতে হবে। তার দু'গজ পেছনে আসছে রানা। প্রতিবার পা ফেলার সময় খেয়াল করছে কোথায় পা রেখেছে এহেরেন্স। রানার পদক্ষেপ অনুসরণ করে একই দূরত্ব বজায় রেখে আসছে রেমারিক।

আঙিনার ভেতর অপেক্ষা করছে দায়না বেলগুতাই। তার সঙ্গে রয়েছে কালো পোশাক পরা দুই মহিলা দেহরক্ষী। একটু দূরে কুয়েন আন টু। তাদের সবার পরনে প্রোটেকটিভ স্যুট। মুখে মুখোশ। কয়েক মিনিট আগে গ্যাসের ভাল্ভ্ খুলে দিয়েছে দায়না। রানা-রেমারিক ফাঁদে পা দেয়ার পর সবুজ হ্যাণ্ডেল টেনে চালু করবে ক্যালসিয়ামহাইপোক্লোরাইডের স্রোত। দলের সবাই পিছিয়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে আঙিনার দেয়ালে, হাতে অস্ত্র। সবার চোখ আকাশে খুঁজছে বিমান ও প্যারাশ্যুট। তখনই আবছাভাবে দায়না শুনতে পেল বিমানের চাপা গুঞ্জন।

সামনে বাড়ল দায়নার দুই বডিগার্ড। প্যাগোডার দু'পাশে অবস্থান নিল তারা। হাতে একে-৪৭ রাইফেল তৈরি।

www.boighar.com

শেষবারের মত বাঁক নিল অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স। দাঁড়িয়ে পড়ে দেখাল পঁয়তাল্লিশ ফুট দূরে প্যাগোডার বাইরের দিকের উঁচু দেয়াল। মাঝে ভারী, প্রশস্ত, ধাতব দরজা। এবার বামদিকের বড় একটা গাছের কাণ্ড দেখাল সে। এরপর ডানদিকের একটা ঝোপ। হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল, ওদিকের দুই চিহ্ন পর্যন্ত এসেছে মাইনফিল্ড। এক পা সরে গেল। সামনে বেড়ে এহেরেন্সকে পাশ কাটিয়ে গেল রানা, মাটিতে সাবমেশিন-গান রেখে কাঁধের স্লিং ধরে নামিয়ে নিল আরপিজি-৭। পিঠে ঝুলছে রকেট। এগিয়ে এসে রানার পিঠ থেকে রকেট খুলে বাড়িয়ে দিল রেমারিক। বসে পড়ল বন্ধুর একটু পেছনে, ডানদিকে। নিজে রানার বামদিকে উবু হয়ে বসেছে এহেরেন্স। চোখা ছোট সব পাথরে ছাওয়া পুরো পথ, বুট থাকলেও খোঁচা টের পাওয়া যাচ্ছে।

সাবধানে কাঁধে টিউব তুলল রানা। সাইট স্থির করল ধাতব গেটের ঠিক মাঝ বরাবর।

আঙিনায় দাঁড়িয়ে বিচলিত বোধ করছে দায়না বেলগুতাই। দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বিমানের ইঞ্জিনের আওয়াজ। প্যাগোডার ওপর দিয়ে যায়নি এয়ারক্রাফট।

'হয়তো একমাইল দূরেই লাফ দিয়েছে ওরা,' বলল কুয়েন আন টু। 'আজকালকার প্যারাশ্যুট অনেকটা ডানার মত। ঠিক বাতাস পেলে যে-কোনও দিকে যেতে পারে।' নার্ভাস চোখে আকাশ দেখছে সে-ও।

রকেট লঞ্চারের ট্রিগার টিপে দিতেই রানার কাঁধে রাখা টিউবের

পেছন থেকে ভলকে বেরোল লাল আগুন। এক সেকেণ্ড পর ভুস্ করে বেরিয়ে গেল রকেট। প্রথমে মনে হলো গতি খুব ধীর, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর প্রচণ্ড বেগে লাগল গিয়ে ধাতব গেটে। হিসহিস আওয়াজ তুলে বিস্ফোরিত হয়েছে। এরই ভেতর লাফ দিয়ে উঠে দৌড়াতে শুরু করেছে রেমারিক। এক সেকেণ্ড পর ওর পিছু নিল অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স।

লঞ্চারের রকেটের বেকায়দা ধাক্কা খেয়ে পেছনে পড়ে যাচ্ছে রানা। সামলে নিতে চাইল নিজেকে। সামান্য পিছিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল। আর তখনই পায়ের নিচে পিছলে গেল ছোট কয়েকটা পাথর। লঞ্চারের ওজনের কারণে ভারসাম্য হারিয়ে রানা বুঝে গেল, চিত হয়ে পড়ছে মাটিতে। হাত থেকে লঞ্চার ফেলে বামহাতে ঠেকা দিতে চাইল। কিন্তু বাধা হয়ে উঠল ভারী প্রোটেকটিভ পোশাক। কাত হয়ে মাটিতে পড়ল রানা। ওখানেই থামল না পতন। ঢাল বেয়ে সরসর করে গড়িয়ে নেমে গেল কয়েক ফুট। শরীর না নেড়ে সরাসরি চাইল ডানদিকে। ওই গাছের কাণ্ড দেখিয়ে দিয়েছে এহেরেন্স। ওটা এখন মাত্র সাত গজ দূরে। আস্তে করে দম নিল রানা। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে ও পড়ে আছে মাইনফিল্ডের ভেতর!

রানার পতনের আওয়াজ শুনেছে রেমারিক। ট্রেনিঙের কারণে বুঝল, কী করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ করল নিজের মনকে পেছনে না চেয়ে ছুট লাগাল প্যাগোডা লক্ষ্য করে। সামনে বিস্ফোরণের ফলে খসে পড়েছে গেটের কবাট রেমারিকের পাশে ছুটছে এহেরেন্স। ওর উদ্দেশে বলল রেমারিক, 'তুমি বামদিক কাভার করো!'

ওর মগজ বারবার বলছে, যে-কোনও সময়ে শুনবে বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ। বুঝতে পারবে, রানা আর নেই। চোখ ওর

গেটের ওদিকে। আঙিনার মাঝে প্যাগোডা, আর দুই কোণে হলদে পোশাক পরা দু'জন। তীর গতি তুলে ভাঙা গেট দিয়ে ঢুকল রেমারিক, দেয়ালের পাশ দিয়ে চলেছে প্যাগোডার ডানে। এখনও কানে আসেনি কোনও বিস্ফোরণের আওয়াজ।

ভাবতে ভাবতে যুদ্ধ করতে পারে চিরকালের যোদ্ধা রেমারিক। জানে, কখন কী করতে হবে। এসএমজির নল সামান্য ওপরে তুলে হলদে পোশাকধারীর বুক লক্ষ্য করে গুলি করল, ঝাঁকি খেয়ে ডানদিকে সরে গেছে ওর হাত। অবশ্য ঠিকই টার্গেটে লাগল বুলেট। সামনে থেকে গুলির কমলা আগুন দেখে কুঁজো হয়ে বসে পড়ল রেমারিক, শুনল পেছনের দেয়ালে লেগেছে কয়েকটা বুলেট। পাল্টা গুলি করতে উল্টে চিত হয়ে ধড়াস্ করে পড়ল ওর প্রতিপক্ষ। মাত্র একবার তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়েই চুপ হয়ে গেছে। আর উঠছে না।

বামে রওনা হলো রেমারিক। ওদিকে দেয়ালের পাশে উবু হয়ে বসে পড়েছে অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স। ডান হাতে চেপে ধরেছে বাম কাঁধ। মাথার ইশারা করল প্যাগোডার দিকে। ওখানে মাটিতে পড়ে আছে হলদে পোশাক পরা আরেকজন।

'বাইরে অপেক্ষা করো,' চারপাশ দেখল রেমারিক। চোখ বোলাল কম্পাউণ্ডের ভেতর। বুঝতে চাইল কোন্ দিক থেকে আক্রমণ করবে শত্রুপক্ষ। অভিজ্ঞতা বুঝিয়ে দিল, বাইরে হলদে পোশাকে দু'জন ছিল গার্ড। দ্বিতীয় দফায় হামলা করবে দায়না বেলগুতাই আর কুয়েন আন টু।

রানার কথা ভাবল রেমারিক। এখনও বিস্ফোরণের কোনও আওয়াজ নেই। জোর সম্ভাবনা যে, বেঁচে আছে রানা। পথে পড়লে এতক্ষণে পৌঁছে যেত। ও আছে মাইনফিল্ডের ভেতর। যেভাবেই হোক, রক্ষা পেয়েছে মাইন বিস্ফোরণ থেকে। কপাল ভাল হলে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তাতে লাগবে সময়। ইঞ্চি ইঞ্চি

করে সরতে হবে। আর তার মানেই, যথেষ্ট সময় দিতে হবে রানাকে।

ডানদিকের দেয়াল ঘেঁষে রওনা হয়ে গেল রেমারিক। খুঁজে নিল অপেক্ষাকৃত ভাল অ্যাংগেল অভ ফায়ার। অস্ত্র তাক করেছে প্যাগোডার প্রবেশ পথের দিকে।

প্যাগোডার পেছন অংশে আছে দায়না বেলগুতাই ও কুয়েন আন টু। নিজেকে সামলে নিতে চাইছে মেয়েটা, কিন্তু মুখ থেকে অনর্গল বেরোচ্ছে নোংরা সব গালি। ওসব শুনলে আঁৎকে উঠবে সাধারণ পুরুষমানুষ। প্যাগোডার আঙিনার গেট ভেঙে পড়তেই ওর মনে হয়েছে, মাথায় ভেঙে পড়েছে আস্ত আকাশ। আজ ওর জীবনের দ্বিতীয় খারাপ রাত। চার বছর আগে এসেছিল আগেরটা। সেরাতে দেখতে হয়েছিল মৃত বাবার পোড়া দেহ। আজ মস্ত ফাঁকি দিয়েছে ওকে মাসুদ রানা। ও যখন আকাশে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে, ভাবছে এই বুঝি নেমে এল প্যারাশ্যুট, সে-সময়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল আঙিনার গেট। দেখা গেল সাদা আগুনের আভা। বিস্ফোরিত গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল হলদে প্রোটেকটিভ স্যুট পরনে দু'জন।

এরপর কী ঘটেছে পরিষ্কার মনে আছে দায়নার। তার দুই বডিগার্ডকে গুলি করে মেরে ফেলেছে তারা। বিমানের আওয়াজ শুনেছে তার আগে। ডিকয় হিসেবে বিমানটাকে ব্যবহার করেছে রানা। প্রহরীদের খুন করে ভজিয়ে ফেলেছে অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্সকে। তার মাধ্যমে মাইনফিল্ডের ভেতর দিয়ে এসে হাজির হয়েছে এখানে। আগেই পেয়ে গিয়েছিল বাড়তি অ্যান্টি-গ্যাস স্যুট। আজ বহু দিন পর বুকের ভেতর হিমশীতল ভয় টের পেল দায়না। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর ভয়ের বদলে বুক ভরে গেল তীব্র ঘৃণায়। আর কিছুই পাত্তা দেবে না, খুন করবে মাসুদ

রানাকে।

প্যাগোডার কোণে ওর এক বডিগার্ডের মৃতদেহ দেখছে দায়না। মন বলে দিল, অন্যজনও বেঁচে নেই। বহু দূরে দেয়ালের কাছে কে যেন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। অ্যাডেলবার্ট এহেরেন্স আসবে না। বোধহয় রেমারিক। আরেকজন ধীরে ধীরে আসছে দেয়ালের পাশ দিয়ে। পরিস্থিতি বুঝে নেয়ার জন্যে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চাইল দায়না।

কেন যেন বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে ওর। রানার রণ-কৌশল ওর জানা। তার দেরি করার কথা নয় হামলা করতে। দেয়ালের পাশে লুকিয়ে আছে যে-লোক, সে বোধহয় ওই ইতালিয়ান রেমারিক। এদিকে সময় আদায় করতে চাইছে রানা। জানতে চায়, এরপর কী করবে দায়না। সেক্ষেত্রে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না রানাকে।

কুয়েন আন টুর উদ্দেশে ফিসফিস করল দায়না, 'আমার ধারণা, বামের দেয়াল ঘেঁষে আসছে রানা। প্যাগোডার অন্য দিক থেকে সামনে বাড়বে। চাইবে পেছনে যেতে। নির্দেশ দিলেই হামলা করবে, এদিক থেকে হামলা করব আমি।'

পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে গেল কুয়েন আন টু। পিঠে ঠেলা দিল দায়না। সাপের মত হিসহিস করে বলল, 'হয় মরবে রানা, নইলে মেরে ফেলবে আমাদেরকে। যাও!'

প্যাগোডার ডানদিকের শাখা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল কুয়েন আন টু। এতই বেদম ভয় পেয়েছে, অতিরিক্ত শক্ত হাতে ধরেছে এসএমজি। চট্ করে কোনও দিকে গুলি ছুঁড়বে, তা হওয়ার নয়।

এই মাইনফিল্ডে কীভাবে পেতে দেয়া হয়েছে হাজার হাজার মাইন, এহেরেন্সের কাছে শুনেছে রানা। বুঝতে পারছে, ওর

কপাল ভাল, পড়ে যাওয়ার সময় ফাটেনি মাটির নিচের বোমা। এবার বাঁচাতে চাইলে ব্যবহার করতে হবে নিজের সেরা দক্ষতা। ফিরে যেতে হবে সরু ওই পথে। এ কাজে কেউ নেই যে সাহায্য করবে। মাত্র একবার ভুল জায়গায় চাপ দিলেই আকাশে ছিটকে উঠবে ওর দেহের হাজার টুকরো।

চুপ করে পড়ে আছে রানা। শুনছে ওপরে গোলাগুলি হচ্ছে প্যাগোডার আঙিনায়। শুনল এক নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। তারপর থেমে গেল সব আওয়াজ। খুব সাবধানে ডান গোড়ালির খাপ থেকে ছোরা নিল রানা। ওটা সামনে বাড়িয়ে আলতো হাতে গর্ত করতে লাগল মাটিতে। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নিজের কাজে। মনে মনে গালি দিয়ে চলেছে নিজেকে। রকেট ছোঁড়ার আগেই বুঝে নেয়া উচিত ছিল মাটি ফস্কা কি না। মস্তবড় ভুল করেছে। এ কারণে খুন হয়ে যেতে পারে রেমারিক ও এহেরেন্স।

মনে মনে নিজের কান মুচড়ে দেয়ার ফাঁকে কাজ করছে রানা। রেমারিক আর এহেরেন্স এখনও বেঁচে থাকলে ওদের সাহায্য লাগবে। খুব জরুরি মাইনফিল্ড থেকে বেরিয়ে প্যাগোডায় পৌঁছে যাওয়া। গভীরভাবে দম নিল রানা, আবারও সাবধানে ছোরা দাবাল মাটিতে।

রানা বড়জোর চার-পাঁচ ফুট পিছলে পড়েছে মাইনফিল্ডে, ভাবল রেমারিক। তাতে ভরসার কারণ নেই। ওই পথ পাড়ি দিয়ে উঠে আসতে গিয়ে হয়তো লাগবে বহুক্ষণ। চট্ করে দূরে এহেরেন্সকে দেখল রেমারিক। আবার দেখল প্যাগোডার প্রধান প্রবেশপথ। মনে হলো না বোকামি করবে দায়না বেলগুতাই। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। ফাঁদে পড়তে চাইবে না ওই দালানের ভেতর। এ কারণেই প্যাগোডার পেছনের কোনাগুলোর দিকে নজর গেল ওর।

মনোযোগ দিয়েছে বলে পুরস্কার পেল একটু পরেই। দালানের বাম থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল হলদে পোশাক পরা এক মূর্তি। অনেক বেশি তাড়াহুড়ো করছে, টার্গেট স্থির করার আগেই টিপে দিল একে-৪৭-এর ট্রিগার। শত্রুর অন্তত পাঁচ ফুট দূর দিয়ে গেল তার বুলেট সারি। আর তখনই বুকে গুলি নিয়ে পাক খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কুয়েন আন টু। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আরেক পশলা বুলেট তার দেহে গেঁথে দিল রেমারিক।

ম্যাগাযিন পাল্টে নিতে বড়জোর তিন সেকেণ্ড লাগল। আর ওই সময়ে দেখল ছিটকে বেরিয়ে এসেছে দ্বিতীয় হলদে মূর্তি। ঘুরেই ডানে ছুটল সে। তারই ভেতর একঝাঁক গুলি ছুঁড়ল রেমারিককে লক্ষ্য করে। পাল্টা গুলি করে সাদাটে আগুনের ঝলক দেখল ইতালিয়ান মার্সেনারি। পাশের দেয়ালে বুলেট লেগে ছিটকে এল স্প্লিন্টার। তীক্ষ্ণ ব্যথা পেল রেমারিক। একই সময়ে ক্লিক আওয়াজ তুলে থামল হাতের এসএমজি। আর গুলি নেই। উড়ন্ত কবুতরের মত ছুটছে প্রতিপক্ষ। তার একটা বুলেট ডান কাঁধে লাগতেই ঝটকা খেয়ে মাটিতে পড়ল রেমারিক। হাত থেকে ছুটে গেল এসএমজি।

নতুন উদ্যমে গুলি চলছে দেখে কাজে সামান্য বিরতি দিল রানা। বুঝে গেল, কে গুলি করছে। আধ সেকেণ্ডের বুলেট-বৃষ্টি রেমারিকের কাজ। আবার থামল গোলাগুলি। থমথম করছে চারপাশ।

এহেরেন্সের দেখিয়ে দেয়া গাছের কাণ্ড দেখল রানা। হিসাব কষে বুঝল, আর তিন গজ যেতে পারলে উঠে আসতে পারবে সরু পথে। ওর মন চাইল লাফ দিয়ে পেরিয়ে যাবে ওই দূরত্ব। কিন্তু আগেই হিসাব কষে দেখেছে, এই ক্ষেত্রে ট্রেনিঙের বাইরে কিছু করলে সর্বনাশ হবে। আবারও ছোরা দিয়ে মাইন খুঁজতে

লাগল রানা। সামনে বাড়ছে ইঞ্চি ইঞ্চি করে।

চুপ করে কাত হয়ে পড়ে আছে রেমারিক। সামান্য চোখ খুলে দেখছে, খুব সাবধানে ওর দিকে আসছে প্রতিপক্ষ। নড়াচড়ার ভেতর ক্ষুধার্ত বাঘিনীর সাবলীল ভঙ্গি। রেমারিক বুঝে গেল, ওই হলদে স্যুট পরনে মানুষটা দায়না বেলগুতাই ছাড়া আর কেউ নয়।

অথচ কিছুই করার নেই। বাম হাতে চেপে রেখেছে স্যুটের ফুটো। তা যে রক্ত ঠেকাতে, এমন নয়, ত্বকে ওই গ্যাস লাগলে মরতে হবে ওকে। ডানদিকে ওর পিস্তল, চাপা পড়েছে দেহের নিচে।

খুব কাছে পৌঁছে গেছে ডাইনী দায়না। মুখোশের কারণে তার চেহারা দেখল না রেমারিক। শুনল খল-খল শব্দের হাসি। ওর ডানদিকে সরে গেল যুবতী, শত্রুর বুকে তাক করেছে একে-৪৭-এর মাযল। একবার আঙিনার ভাঙা গেট ও দূরে তাকাল। ওদিকের পথে কেউ নেই। আবারও হাসল দায়না। সামনে বেড়ে একে-৪৭-এর নল তাক করেছে শত্রুর মাথায়।

বুঝে গেল রেমারিক, যেভাবে হোক আদায় করতে হবে সময়। মনে মনে বলল, 'রানা! জলদি!'

মুখোশের ভেতর থেকে আসা দায়নার কণ্ঠ শুনল। ওই কণ্ঠে তীব্র ঘৃণা। 'তুমি মাসুদ রানা?'

প্রোটেকটিভ স্যুটের কারণে আমাকে চিনবে না, ভাবল রেমারিক। চাপা স্বরে বলল, 'হ্যাঁ। তুমি দায়না?'

খিল-খিল করে হাসল যুবতী।

'হ্যাঁ, দায়না। জন বেলগুতাইয়ের মেয়ে দায়না। অনেক দিন অপেক্ষা করেছি তোমার জন্যে। নিজের চোখে দেখেছি, হংকং-এর প্যাগোডায় খুন করছ আমার বাবাকে।' মাথার ইশারায়

প্যাগোডা দেখাল। 'ওখানে আছে আমার বাবার পবিত্র ভস্ম। ওখানেই তাঁর সঙ্গে বাস করবে তুমি। ছাই হবে পুড়ে।'

মাটির ভেতর আটকে গেল ছোরার ডগা। কী যেন। শক্ত। খুব সতর্কতার সঙ্গে ছোরা সরিয়ে ফেলল রানা। ওটা পাশে রেখে ডান হাতে ধীরে ধীরে খুঁড়তে লাগল নরম মাটি। মনে হলো পেরিয়ে গেছে একঘণ্টা, তারপর উঠে এল হাতে মাইন। সরিয়ে রাখল একটু দূরের মাটিতে। আবছাভাবে শুনল রেমারিকের গম্ভীর কণ্ঠ। সম্ভবত আহত। ওকে বন্দি করেছে মেয়েলোকটা। চট্ করে মেরে ফেলবে না। ওর যা চরিত্র, খুন করার আগে কষ্ট দেবে যতভাবে পারে।

সাদা ময়দার গুঁড়োর পথ দেখতে পাচ্ছে না রানা। অস্পষ্ট শুনল দায়না বেলগুতাইয়ের কণ্ঠ। খুশি খুশি কণ্ঠ। জয় হয়েছে তার। মগজের একাংশ রানাকে তাড়া দিল: 'এক লাফে উঠে পেরিয়ে যা মাইনফিল্ডের শেষটুকু!' আবার মগজের অপর অংশ বলল: 'সাবধান, রানা! বোমা ফেটে মরলে রেমারিকের কোনও লাভ হবে না!' হাঁটু ও কনুই কাছে রেখে প্রায় ফুটবলের মত গোল হয়ে গেছে ও। খুব ধীরে সামনে বাড়ছে শামুকের মত।

আরও দশ মিনিট পর ময়দা ছিটানো পথে পৌঁছে গেল রানা। উঠে খাপে রেখে দিল ছোরা। সাবমেশিন-গান হাতে রওনা হয়ে গেল ওপরের আঙিনা লক্ষ্য করে।

'উঠে দাঁড়া, কুকুরের বাচ্চা!' ধমকে উঠল দায়না বেলগুতাই, 'নইলে মরবি এখানেই!' দু'গজ পিছিয়ে গেল সে। নিষ্কম্প হাতে রেমারিকের মাথায় তাক করে রেখেছে একে-৪৭-এর মাযল।

বাম হাতে মাটিতে ভর দিয়ে উঠতে গিয়ে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রেমারিক। দেরি না করে অক্ষত হাতে ঢেকে ফেলল প্রোটেকটিভ

স্যুটের ফুটো।

হাসল দায়না বেলগুতাই। 'তুই এমনিতেই মরবি, শুয়োরের বাচ্চা! আমি দেখব কীভাবে পুড়ে মরিস! এভাবেই খুন করেছিলি আমার বাবাকে!'

www.boighar.com

নড়ল না রেমারিক। বাঁচতে চাইলে একে আটকে রাখতে হবে কথার মাধ্যমে। 'তোমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছি,' বলল চাপা স্বরে। 'তোমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান আমি। বোকার মত ভেবে নিয়েছ বুঝবে আমার চিন্তা। আসলেই বোকা তুমি। হাঁ করে চেয়ে ছিলে আকাশে। আসবে প্যারাশ্যুট। কই, এল ওই জিনিস? যা ভেবেছি, তার চেয়ে অনেক ভোঁতা তোমার মগজ।'

রেমারিক দেখল নিচে নামল একে-৪৭-এর নল। মাযল থেকে ছিটকে বেরোল লালচে আগুন। ওর পায়ের মাত্র তিন ইঞ্চি দূরের মাটি ছিটকে গেল নানান দিকে। অস্ত্রের গুলি ফুরিয়ে যেতেই ঝড়ের গতি তুলে কয়েক সেকেণ্ডে ম্যাগাযিন পাল্টে নিল মেয়েটা। বুলেটের চেয়েও বিপজ্জনক সায়ানাইড, তার কণ্ঠ থেকে ঝরল ওই বিষ: 'রানা, আবার মুখ খুললে গুলি করব পেটে। মরতে সময় নেবে।' দেড় ফুট এগিয়ে এল। 'প্যাগোডার ভেতর ঢোকো!'

ধীর পায়ে সামান্য টলতে টলতে চলল রেমারিক।

'তোর বন্ধু রেমারিকের বুকে আরও কয়েকটা গুলি ভরে দিলে ভাল হতো, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে দেখছি একদম নড়ছে না,' পেছন থেকে বলল দায়না। 'কেমন লাগছে তোর? মরে পড়ে আছে তোর প্রাণের বন্ধু!'

'আমার বন্ধুকে মেরেছ, নিজেও তুমি বাঁচবে না।'

'সামনে বাড়, কুকুর! দেরি করলে পিঠে গুলি খেয়ে মরবি!'

ধীর পায়ে চলেছে রেমারিক। চট্ করে দেখে নিল আঙিনার ভাঙা গেট।

'জোরে হাঁট্!' ধমক দিল দায়না।

'আমি আহত,' আপত্তির সুরে বলল রেমারিক।

'আমার বাবাও আহত ছিল,' হিসহিস করল দায়না। 'তুই গুলি করে অকেজো করে দিয়েছিলি ডান হাত। বাম হাতে গুলি করে ঠেকাতে পারেনি বাবা তোকে।'

প্যাগোডার প্রবেশদ্বারে পৌঁছে গেছে রেমারিক। কাঁধের ওপর দিয়ে বলল, 'জগৎ ছেড়ে নরকগুলজার করছে সে। বিপদে আছেন স্রষ্টা। কে জানে, হয়তো ভাবছেন আরও জটিল কোনও নরক তৈরি করবেন কি না! তোমার বাবা যা ছিল! ছিহ্! তুমিও তার মতই হয়েছ! জানোয়ারও লজ্জা পাবে তোমার সঙ্গে ওদেরকে তুলনা দিলে!'

বেদির ওপর সাজিয়ে রাখা কাঠ দেখল রেমারিক। বেদির পাশে নিচের মেঝেতে পড়ে আছে কেউ। বুঝে গেল, ওই লোকই জর্জ হার্টিগান। রানার সঙ্গে ওকেও পুড়িয়ে মারতে নিয়ে এসেছে দায়না। মনে মনে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করল রেমারিক: 'এবার তো, বাপু, পাঠাও রানাকে! ফুরিয়ে এল আমার সব কথা! রানা গেল কোথায়? এখনও বেরোতে পারল না মাইনফিল্ড থেকে?'

খসখসে কণ্ঠে হাসতে লাগল দায়না বেলগুতাই। 'ভাল করে সব দেখে নে, রানা। মরবি এখানেই। প্রথমে নিজ হাতে বেদির ওপর তুলবি তুই জর্জ হার্টিগানকে। তারপর উঠবি নিজেও। তখন তোদের হাঁটু আর কনুইয়ে গুলি করব।' পকেট থেকে কালো যিপ্পো লাইটার বের করে দেখাল সে। 'তারপর তোদের চিতায় আগুন দেব। চুপচাপ দেখব কীভাবে পুড়ে ছাই হচ্ছিস, আর কত জোরে চিৎকার করছিস। এজন্যে অপেক্ষা করেছি পুরো চারটে বছর। প্রতি দিন শপথ করেছি: প্রতিশোধ নেব বাবার মৃত্যুর। আজ প্রতিটি মুহূর্ত মনে হবে, আমি আছি স্বর্গে। রানা, এবার

তোর বিদায়ের সময়!'

তখনই ওর পেছনের অন্ধকার থেকে ভেসে এল এক পুরুষকণ্ঠ: 'ভুল লোককে বেছে নিয়েছ, দায়না! আগুন নিয়ে খেলা তোমার উচিত নয়!'

চরকির মত ঘুরেই কাঁধে একে-৪৭ তুলল দায়না। ওই একইসময়ে মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রেমারিক। খ্যাট-খ্যাট আওয়াজে গুলি উগরে দিল রানার এসএমজি।

বেদম ঝটকা খেল দায়নার শরীর। হাত থেকে পড়ে গেল অ্যাসল্ট রাইফেল। ওটার পাশেই পড়ল মেয়েটা। মুখ থেকে খুলে গেছে মুখোশ। মস্ত হাঁ করল। বুকের ভেতরে ঢুকে গেল নার্ভ গ্যাস। যেন আগুনে পুড়ছে ওর মুখটা। তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ল দায়না। দু'হাতে খামচে ধরল দু' গাল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডেই সম্পূর্ণ বিকৃত হলো সুন্দর চেহারাটা। গলে পড়ল দুই চোখ। মেঝেতে আহত সাপের মত মোচড়াতে শুরু করেছে দেহ।

'নার্ভ গ্যাসের কারণে কয়েক মিনিট লাগবে মরতে,' রানাকে বলল রেমারিক। 'তুমি অমানুষ নও, রানা। মেরে ফেলে বাঁচিয়ে দাও ওকে।'

সামনে বাড়ল রানা। দু' সেকেণ্ড পর বুলেট গেঁথে দিল দায়না বেলগুতাইয়ের মগজে। একবারও ওদিকে না চেয়ে রেমারিকের সামনে থামল। 'কতটা আহত তুমি?'

'গুরুতর কিছু নয়।'

'কয়েক মিনিট অপেক্ষা করো।' অন্ধকারে হারিয়ে গেল রানা। কিছুক্ষণ পর আবারও ফিরল। 'এহেরেন্স বাইরে। আহত। কিন্তু মারাত্মক কিছু নয়। মারা পড়েছে দায়নার তিন সঙ্গী। তাদের একজন কুয়েন আন টু। ওরা আমাদের জন্যে ভালই অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছিল।'

'বেদির পাশে বোধহয় জর্জ হার্টিগান,' জানাল রেমারিক।

বেদির সামনে থেমে ঝুঁকল রানা। খুলতে লাগল মানুষটার হাত-পায়ের দড়ি। কাজটা শেষ হলে বলল, 'দম আটকে রাখবে। মুখোশ তুলে দেখতে চাই তুমি কে।'

মাথা দোলাল যুবক।

তিন সেকেণ্ড পর মুখোশ খুলে রানা দেখল, জর্জ হার্টিগানের মুখে গুঁজে রাখা হয়েছে রুমাল। ওটা বের করে ফেলে দিল ও। বলল, 'মুখোশ পরে নাও। ...হাঁটতে পারবে?'

'জী, স্যর।' ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল যুবক।

'তুমি? রেমারিক?' জানতে চাইল রানা।

'পারব। বুলেট লেগেছে কাঁধে।'

'তো চলো, এহেরেন্সকে নিয়ে বেরিয়ে যাই এই অভিশপ্ত প্যাগোডা থেকে।'

'হাতে সময় নেই,' বলল রেমারিক, 'জর্জ হার্টিগান, কনি টুরেন, তার ছেলে, এহেরেন্স আর আমরা সবাই এঁটে যাব দুই জিপে। দেরি না করে রওনা হয়ে যাওয়া উচিত।'

প্যাগোডা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। পাঁচ মিনিট পেরোবার আগেই এহেরেন্সের দেখানো পথ ধরে নেমে যেতে লাগল নিচের গ্রামের দিকে। সামনে যেতে যেতে বকবক করছে এহেরেন্স।

'রানা, রেমারিক, তোমরা জানো না, একবার নিরাপদে থাইল্যাণ্ডে ঢুকতে পারলে আমার বউ আর ছেলেকে নিয়ে সোজা ফিরব নিজের দেশে। আর কখনও বাড়তি পয়সার লোভে ঝুঁকি নেব না। আমার বউ-বাচ্চা আছে, সেটা মাথায় রাখতে হবে।'

'আর টাকার খিঁচ হওয়ারও কথা নয়,' বলল রানা। 'নীলকান্ত মণি বিক্রি করে তুমি পাবে কমপক্ষে কয়েক মিলিয়ন ডলার।'

'সত্যি দেবে তোমরা?' একটু থমকে গিয়ে বলল এহেরেন্স।

'কেন নয়?' বলল রানা। 'ওগুলো অর্জন করেছ অনেক ঝুঁকি নিয়ে।'

'আর, ঝুঁকি না নিলেও রানা ঠকাত না কাউকে,' বন্ধুর কথা বলতে গিয়ে গর্ব ঝরল রেমারিকের কণ্ঠ থেকে।

পনেরো মিনিট পর মাইনফিল্ড থেকে বেরিয়ে এল ওরা। এরই ভেতর দুই জিপগাড়ি নিয়ে এসেছে ফুলজেন্স। দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছে রানাদের জন্যে। একটু দূরে কোলে টনিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কনি টুরেন।

'এহেরেন্স, বউ-বাচ্চা নিয়ে ওঠো ডানদিকের জিপের পেছনে,' তাড়া দিল রানা, 'গাড়ি আবারও চালাবে ফল মল। পাশের সিটে আমি। পেছন থেকে আমাদেরকে কাভার দেবে ফুলজেন্স।' কর্নেলিসের দিকে তাকাল রানা। 'তোমরা পঞ্চাশ গজ পেছনে আসবে।'

মাথা দোলাল কর্নেলিস, উঠে পড়ল দ্বিতীয় জিপে।

সবাই গাড়িতে ওঠার পর রওনা হয়ে গেল জিপ। ভোরের রোদ পুবাকাশ রঙিন করার আগেই নির্বিঘ্নে পেরিয়ে গেল থাইল্যাণ্ডের সীমান্ত। ওদের দুই জিপগাড়ি ছুটে চলেছে ব্যাংকক শহর লক্ষ্য করে।

তিয়াত্তর

এইমাত্র ভোর হয়েছে। আকাশে সামান্য মেঘ, তাতে নানান রং। কলিং বেল টিপতেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে এসেছেন জর্জ হার্টিগানের মা শার্লি হার্টিগান। এক সেকেণ্ড পর বেরোলেন মহিলার স্বামী। চোখে তাঁদের অনেক আশা।

সামনেই দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা, পাশে জর্জ হার্টিগান, ঠোঁটে খুশির হাসি। রানা ভেবেছিল ছেলেকে জড়িয়ে ধরবেন মহিলা। কিন্তু অবাক হতে হলো, নিজের ছেলের বদলে ওকে আলিঙ্গন করলেন তিনি। চোখ থেকে গালে নেমেছে লোনা পানির স্রোত। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কখনও বোঝাতে পারব না, বাবা, তোমার কাছে কতটা কৃতজ্ঞ! যতদিন বাঁচব, প্রতিদিন গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করব তোমার মঙ্গলের জন্যে।'

জ্যাক হার্টিগান রুগ্ন মানুষ, জড়িয়ে ধরেছেন ছেলেকে, প্রায় নাচতে লেগেছেন শিশুর মত।

'আরেহ্, আরেহ্, বাবা!' নাচতে বাধ্য হয়ে লজ্জা পেয়ে লালচে হলো জর্জের গাল। 'কী করছ!'

পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে মারিয়া।

রানাকে আলিঙ্গন-মুক্ত করে ওর হাত ধরে বললেন শার্লি, 'এসো, রানা। তুমিও এসো, মা। ফোনে জর্জি বলেছে তোমরা কী করেছ আমাদের জন্যে।'

মৃদু হাসিমুখে বলল মারিয়া, 'পরে কখনও আসব, আণ্টি।

আজ আপনাদেরকে বিরক্ত করতে চাই না। তা ছাড়া, রানা আর আমাকে যেতে হবে আরেকটা জরুরি কাজে।'

জরুরি কী কাজ, তা না বুঝেই মাথা দোলাল রানা।

'ঠিক আছে, তা হলে আর আটকাব না,' বললেন শার্লি, 'তবে একমিনিট অপেক্ষা করো।' ঘুরে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন তিনি।

ছেলে বাইন মাছের মত হাতছাড়া হতেই রানার বাহু ধরলেন জ্যাক হার্টিগান। 'বাবা, মঙ্গল হোক তোমার! পয়সা নেই যে ঋণ শোধ করব, কিন্তু আমাদের বুড়ো-বুড়ির দোয়া সবসময় থাকবে তোমার জন্যে।' মারিয়াকে দেখলেন। 'মা, তোমার জন্যেও।'

'আমি কিন্তু আমার সরকারি দায়িত্ব পালন করেছি, তার বাইরে কিছুই নয়,' বলল মারিয়া।

'দায়িত্ব পালন করে আজকাল ক'জন মানুষ?' মাথা নাড়লেন জ্যাক হার্টিগান।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন শার্লি, দু'হাতে কাগজ দিয়ে মোড়া বড় কী যেন। তাড়াহুড়ো করে সরাতে লাগলেন কাগজ।

ছবির ফ্রেম বোধহয়, আঁচ করল রানা।

মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডে উড়ে গেল কাগজ। ভেতরের জিনিস অনেকটা পোর্ট্রেটের মত। তবে আঁকা হয়েছে দু'জনের ছবি।

রানাকে দেখালেন শার্লি।

বামদিকে আঁকা ডি-জেনেইরোর সেই যিশুর প্রকাণ্ড মূর্তি। একই উচ্চতা নিয়ে ডানদিকে সমাসীন আরেকজন।

মুখটা একদম রানার।

রানা-মারিয়া বুঝে গেল, কী কারণে এভাবে এঁকেছেন বৃদ্ধা।

'যেদিন এলে, আর জানলাম আমাদের ছেলেকে খুঁজবে, শুধু তাই নয়, ব্যয় করবে সময় ও অর্থ...' আবারও ভিজে গেল শার্লি

হার্টিগানের চোখ। 'বুঝলাম, আজও আছে খাঁটি মনের মানুষ। সেদিনই এঁকেছি এই মূর্তি আর তোমার ছবি। খুব খুশি হব তুমি এটা নিলে।' ফ্রেমটা রানার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি।

'আমি পাথরের যিশুর মত অতবড় হলে সর্বনাশ হতো,' হেসে মহিলার হাত থেকে ছবি নিল রানা। 'পা ফেললে নিচে চ্যাপটা হয়ে যেত অনেকে!'

জ্যাক হার্টিগান রানাকে বললেন, 'বাবা, যে-কোনও সময়ে যে-কোনও কাজে আমাদেরকে ডাকলে হাজির হব।'

'হ্যাঁ, বাবা, আমাদের দরজা সবসময় খোলা তোমার জন্যে,' বললেন শার্লি। 'সবসময়।'

'যতদিন বাঁচব, মনে করব আমাদের দু'জন ছেলে,' বললেন জ্যাক হার্টিগান, 'তুমি বড় ছেলে, আর ছোট ছেলে জর্জ। দু'জনের ভেতর কখনও কাউকে কম গুরুত্ব দেব না আমরা।'

'সেজন্য ধন্যবাদ,' বলল রানা।

'পরে দেখা হবে,' বলল মারিয়া, 'একবার জর্জকে নিয়ে যেতে হবে ওয়াশিংটনে আমাদের ডিপার্টমেন্টে। তবে আজ নয়। ক'দিন বিশ্রাম করুক।' তাড়া দিল মারিয়া, 'রানা, এবার চলো!'

ওরা গাড়িতে উঠতেই হাত নাড়লেন শার্লি, জ্যাক ও জর্জ। সবার মুখে হাসি, চোখে আনন্দের অশ্রু।

গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে বলল মারিয়া, 'মিসেস হার্টিগানের ওই ছবি কিন্তু আমাকে দিয়ে দিতে হবে।'

'কী কারণে?' ভুরু নাচাল রানা।

'কারণ যিশুকে কখনও না দেখলেও তোমাকে তো দেখেছি? ওই ছবি মনে পড়িয়ে দেবে খুব কাছে ছিল সত্যিকারের একজন মানুষ।'

'সেই সত্যিকারের মানুষটাকে নিয়ে কোথায় চললে?' জানতে

চাইল রানা।

গাড়ির গতি কমিয়ে মিষ্টি হাসল মারিয়া। 'আপাতত আমার হোটেলের সুইটে। গত দু'দিন ব্যস্ত ছিলে, আজ তার চরম প্রতিশোধ নেব।'

'তাই? আমিও এমনই শোধ নেব যে...' মারিয়ার ঠোঁটের ওপর নেমে এল রানার নিষ্ঠুর ঠোঁট।

ভয় পেয়ে ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে ফেলেছে মারিয়া।

পরক্ষণে পরস্পরের ঠোঁট নিয়ে মগ্ন হয়ে গেল ওরা।

রাস্তার কেউ দেখলে কার কী!

(সমাপ্ত)

www.boighar.com

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ alochonabibhag@gmail.com

কিশোর
মিরপুর, ঢাকা।

কাজীদা,

শুভেচ্ছান্তে নিবেদন, মাসুদ রানার 'পার্শিয়ান ট্রেজার' প্রথম খণ্ডের ১৪৭ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ লাইনে আছে: 'গায়ে সানলোশন লাগাচ্ছে, করছে কেউ কেউ।' কিন্তু এখানে হবে: 'গায়ে সানলোশন লাগাচ্ছে কেউ কেউ।'

এখানে 'করছে' হবে না।

✵ ঠিক বলেছেন।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু
হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। মোবা: ০১৭১৭-৯৮২০২৩।

ইদানীং অনেক মিথ্যা কথা বলছি। মিথ্যা বলতে ভালই লাগে। মিথ্যার মাঝে তিলকে তাল বলে উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু কাহাঁতক এই মিথ্যা চালিয়ে যাওয়া যায়! তিতিবিরক্ত হতে চলেছি। তাই ভাবছি এখন একটা সত্য কথা বলব।

কথাটা হলো, আমাদের কাজীদা, কঠিন না হলে খুব সহজে পাঠকের কথা রাখেন না। আমরা যখন গিলটি মিয়াকে চাই বলে বায়না ধরি তখন তিনি আনেন গগলকে। সোহানাকে চাইলে হাজির করেন তিশাকে। কিন্তু এই প্রথম দাদা কথা রাখলেন। সেই কুয়াশাকে আবার ফিরিয়ে আনলেম 'বাউন্টি হান্টার্স'-এ। দাদার কাছে এজন্যে কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।

টান-টান অ্যাকশন, অফুরন্ত অ্যাডভেঞ্চার এবং বার-বার মৃত্যুর হাতছানিতে ভরপুর ভয়াল আনন্দ দানকারী বাউন্টি হান্টার্স ১+২ উপহার দেবার জন্য সেরা

নায়ক কাজী আনোয়ার হোসেনকে সহস্র সালাম ও শুভেচ্ছা। একটি কৌতূহল: গগল, কুয়াশা, রানা, কবীর চৌধুরী, সোহানা এবং হাস্যরসিক গিলটি মিয়াকে কি কখনও একসঙ্গে পাওয়া যাবে?

'মৃত্যুদ্বীপ' পড়ছি। এরপর হাতে নেব 'পার্শিয়ান ট্রেজার'। তারপর পাঠাব শুভেচ্ছা ভর্তি জাহাজ! ভাল হয় খাল কেটে সেবার সামনে একটা ডক তৈরি করলে!! কুমির যে পাঠাব না, সে বিষয়ে ১০০% নিশ্চিত থাকতে পারেন!!!

❊ আপনার কৌতূহলের উত্তর: সুযোগ-সুবিধে হলে সবাইকে একসঙ্গে আনা যেতেও পারে।

শুভ

সন্দীপ কমপ্লেক্স, আবাসিক এলাকা। মোবা: ০১৮১১-৫৪৫৪১৯।

প্রথমে আমার শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আমার ইচ্ছা আমি মাসুদ রানার মত একজন স্পাই হয়ে দেশের সেবা করব। তাই আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য ফরম পূরণ করে পাঠিয়েছি। কিন্তু এর রিপ্লাই আসবে কি না তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন। কাজীদা, আপনার 'হ্যাকার' ও 'ড্রাগ লর্ড' খুবই চমৎকার হয়েছে। আমার রুমে অধিকাংশ বই-ই হচ্ছে আপনার।

কাজীদা, মাসুদ রানার প্রথম দিকের বইগুলো বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি বইগুলো রিপ্রিন্ট করা হয় তা হলে আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব।

মাসুদ রানার ভক্তদের সাথে ফ্রেণ্ডশিপ করতে চাই, কারণ আমরা সবাই প্রায় একই গ্রুপের সদস্য।

পরিশেষে আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি।

❊ ধন্যবাদ। আমার দোয়া রইল – আশাকরি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

মোঃ ফারুক ভুইয়া

পূর্ব রামপুরা, ঢাকা।

কাজীদা,

কেমন আছেন? আজ ষোলো বছর যাবৎ 'সেবা'র সঙ্গেই আছি। চিঠি লিখব-লিখব করেও এতদিন লেখা হয়নি। তাই এবার লিখেই ফেললাম এবং আপনাদের সমালোচনা করেই। বিগত কয়েক বছর যাবৎ 'রানা'র গল্পের মান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, এইজন্য সেবাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাদের দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, কারণ বিগত কয়েক বছর যাবৎ আপনারা অনিয়মিত। এক, দুই বছর মেনে নেয়া যায়, কিন্তু টানা চার বছর যাবৎ যদি তা ঘটতে থাকে তা হলে তো আপনাদের দক্ষতা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাই নয় কি? আপনাকে বা সেবার কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করার জন্য কথাগুলো লিখিনি। কেউ আঘাত পেলে নিজ গুণে ক্ষমা করবেন। রানা ও সেবার সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় রইলাম।

❊ আপনার চিঠিতে সেবা'র প্রতি যে গভীর ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে, সেজন্য ধন্যবাদ। তবে আমাদের দক্ষতা ও দায়িত্ববোধের অভাব সম্পর্কিত আপনার বক্তব্য মেনে নেওয়া গেল না। কোনও প্রকাশনী কখন কতগুলো কী বই ছাপবে, সেটা তাদের ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত – অপরাধ নয়।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২৪/১/১৬ অপদেবী (রোমাঞ্চ-হরর কাহিনি/সেবা **D/D**) **তৌফির হাসান উর রাকিব**

বিষয়: যদি জানতে পারেন, আপনার প্রতিবেশী ভদ্রলোক রাতারাতি একখানা কালজয়ী উপন্যাস রচনা করে ফেলেছেন এবং এসবের পিছনে রয়েছে এক অপদেবীর হাত, কেমন লাগবে আপনার? যদি জানতে পারেন, সেই আদিকাল থেকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের গোটা সাহিত্য জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে আসছে সেই অপদেবীটি? পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে সমৃদ্ধ লাইব্রেরী, একটি প্রাগৈতিহাসিক কলম, এদের কী ভূমিকা এই কাহিনিতে? সুকুমার রায় এবং লালন ফকিরের? জানতে হলে, পড়তে হবে, সময়ের পাঠকপ্রিয় লেখক, তৌফির হাসান উর রাকিব-এর এবারের আয়োজন 'অপদেবী'! তিনটি উপন্যাসিকার অনন্য এক সংকলন নিঃসন্দেহে রোমাঞ্চপ্রিয় পাঠকদের ভাল লাগবে বইটি।

আরও আসছে

২৭/১/১৬ রহস্যপত্রিকা (৩২ বর্ষ ৪ সংখ্যা) ফেব্রুয়ারি, ২০১৬